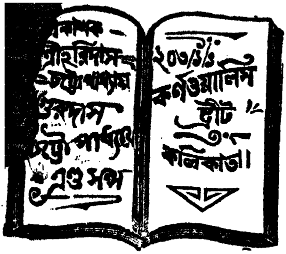
ভ্রাম্যমানের দিন-পঞ্জিকা

শ্রীদিলীপকুমার রায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

দুই টাকা



প্রিণ্টার- শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নিবেদন

"ভ্রাম্যমানের দিন-পঞ্জিকা" ধারাবাহিকভাবে একাধিক মাসিকী ও সাপ্তাহিকীতে প্রকাশিত হ'য়েছিল। যখন এ "পঞ্জিকা" লিখতে আরম্ভ করি, তখন মনে করা গিয়েছিল যে, আমাদের শিক্ষিত সমাজের কাছে ওস্তাদ-বাইজীর গানবাজনার প্রসঙ্গ অবজ্ঞাত হ'বেই হ'বে। কিন্তু আমার সৌভাগ্যবশতঃ তা হয় নি এবং পরে অনেকেই আমাকে ব'লেছিলেন যে "ভ্রাম্যমানের দিন-পঞ্জিকা" পুস্তকাকারে প্রকাশ করলে জনসাধারণের স্থবিধা হয়। তাঁদের এ ধারণা সম্পূর্ণ সত্য হোক্ বা না হোক্, প্রবন্ধগুলি একত্রে প্রকাশিত হ'লে অন্ততঃ জনকয়েক সঙ্গীতানুরাগীও সেগুলি হাতের কাছে পাবেন ও কখনও-কদাচিৎ এ বিষয়ে একটু আধটু ভাব্‌লেও ভাব্‌তে পারেন। "ভ্রাম্যমান"কে আজ মুদ্রাকরের কবলে ফেলে বেঁধে ফেলার এ-প্রয়াসের মূল আমার এই ভরসাটুকু মাত্র।

য়ুরোপ থেকে দেশে ফিরে যখন প্রথম প্রথম দেশবিদেশের গুণীর গান শোনার খেয়াল মাথায় চাপে, তখন আমি নিছক্ মনের আনন্দ-উৎসের খোরাক সংগ্রহ করবার প্রণোদনায়ই এ গান-শোনা-রূপ উচ্চাশাকে কার্য্যে পরিণত করতে ব্রতী হই। এ শোনার অভিজ্ঞতাকে ছাপার কালিতে চিরন্তন করবার দুঃসাহস হয় আমার পরে—যখন আমি ১৯২৩ সালে মহাপ্রাণ পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের সঙ্গে প্রথম সংস্পর্শে আসি: কারণ তিনিও দেশদেশান্তর ঘুরে আমাদের সঙ্গীত সম্বন্ধে জ্ঞান ও তথ্য আহরণ করতে যথেষ্ট অর্থ ও সময় ব্যয় ক'রেছিলেন। তবে আমাদের উচ্চ সঙ্গীতকে তিনি যে ভাবে দেখ্‌তে চেয়েছিলেন, আমি ঠিক সেভাবে দেখ্‌তে চাই নি। তিনি ভ্রমণ ক'রে বেড়িয়েছিলেন—ভিন্ন ভিন্ন দেশের ওস্তাদ ও সমজদারদের মধ্যে আমাদের সঙ্গীতের techniqueএর প্রচলিত

স্বরূপটি নির্দ্ধারণ করতে। আমি বাহির হ'য়েছিলাম—আমাদের বর্ত্তমান সঙ্গীতের মধ্যে যেটুকু খাঁটি আর্ট আজও বিরাজ করছে সেটুকুর খবর নিতে। অর্থাৎ তিনি চেয়েছিলেন—আমাদের সঙ্গীতের বিকাশকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ ক'রে দেখ্‌তে, ও আমি ভ্রাম্যমান হ'য়েছিলাম—আমাদের বর্ত্তমান সঙ্গীত আমাদের মনে কতটা রস সঞ্চার করতে পারে সেইটা সাধ্যমত পরখ ক'রে বুঝতে। সুতরাং আমাদের outlookএর এ প্রকৃতিগত পার্থক্যের দরুণ আমার এ পুস্তকখানির যে raison d'etre কিছু থাক্‌তে পারে এ আশা করা হয়ত অসঙ্গত ব'লে গণ্য হবে না।

এ পুস্তকখানি প্রকাশ করতে সাহসী হ'বার আমার একটা শ্রেষ্ঠতর কারণও আছে; আমাদের হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বিকাশধারার একটা মূলগত পরিবর্ত্তনের সময় এসেছে, যে জন্য আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নির্ভীক আলোচনা ও সশ্রদ্ধ মনোযোগ অতি আবশ্যক। তাই এখন সঙ্গীতানুরাগী মাত্রেরই কর্ত্তব্য আমাদের সঙ্গীতের প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা পাওয়া। কেন না এ কথা আমরা না বুঝলে আমাদের সঙ্গীতের মুক্তি নেই যে, আমাদের ললিতকলাটি আজ যে সম্প্রদায়ের একচেটে হ'য়ে প'ড়েছে তাঁদের দ্বারা আর যে ব্রহ্মেরই উপাসনা সম্ভব হোক্ না কেন, শব্দব্রহ্মের উপাসনা যে সুসাধ্য নয় এটা ধ্রুব। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে এ সাদা সত্য কথাটিও জোর ক'রে বলার দরকার করে। পাশ্চাত্য জগতে এটা স্বতঃসিদ্ধবৎ গণ্য হ'য়ে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের জনসাধারণ ললিতকলায় যুগ প্রবর্ত্তনের সঙ্গে যথার্থ 'কাল্‌চারে'র যোগাযোগের মূল্য সম্বন্ধে এখনও যথেষ্ট সচেতন হন নি। অথচ কাল্‌চারের সঙ্গে প্রতিভার মিলনে যে ললিতকলা মুহূর্ত্তে কতখানি সুললিত ও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌তে পারে, সে সম্বন্ধে অন্ততঃ চিত্রকলায় অবনীন্দ্রনাথ ও অভিনয়কলায় শিশিরকুমারের অভ্যুত্থানের

মহিমময় দৃষ্টান্তের পর আর সন্দেহ করা চলে না। কারণ এ দুটি ভাস্বর দৃষ্টান্ত হ'তে অনেকটা আইডিয়া পাওয়া যায় না কি শিক্ষিত প্রতিভার আমদানীতে সঙ্গীতকলারও কতটা মহনীয় বিকাশ হ'তে পারে? দুঃখের বিষয়, সঙ্গীতের এ ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বিকাশের সম্বন্ধে আজকালকার পেশাদারী ওস্তাদদের কারুর কোনও স্ফুট ধারণাই নেই—প্রেরণার অন্তর্দৃষ্টি ত দূরের কথা। তবে এ কথা আমি প্রবন্ধান্তরে বিশদভাবে বল্‌বার প্রয়াস পেয়েছি। *

আমার সঙ্গীত আলোচনার স্পর্দ্ধার অভিযোগের উত্তরে আত্মরক্ষার্থ আমার আরও একটি বক্তব্য আছে। তবে সে কথাটা অবতারণা করতে হ'লে এ-সম্পর্কে এ অভিযোগটি কি একটু খোলসা ক'রে বলা দরকার।

কথাটা এই যে, প্রবীণের দল সময়ে অসময়ে, স্থানে অস্থানে ও পাত্র অপাত্র নির্ব্বিশেষে তার স্বরে ঘোষণা ক'রে থাকেন, এই সনাতন সত্যটি যে পলিতকেশ, স্খলিত দন্ত, লোল চর্ম্ম ও কুব্জ দেহ না হওয়া পর্য্যন্ত মানুষের কোনও স্বাধীন মতই প্রকাশ করবার অধিকার জন্মাতে পারে না। বিশেষতঃ যখন অজাতশ্মশ্রু আমরা তাঁদের যুগের সে-সব ত্বরিতকর্ম্মা সব্যসাচী গুণীর গান-বাজনা শোন্‌বার সুযোগ পাই নি, যাঁদের গানালাপের সময়ে সাক্ষাৎ তুম্বূরু—হাহা-হুহু প্রমুখ গন্ধর্ব্বকুলতিলকগণ তাঁদের কণ্ঠে গজিয়ে উঠ্‌তেন, তখন আমাদের পক্ষে ব্রহ্মমুখ-নিঃসৃত সে সনাতন হিন্দু-সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে যাওয়া অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা না হ'য়েই পারে না। কেন না (তাঁরা বলেন) আমাদের সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ রূপটি সম্বন্ধে আমরা কি-ই বা জেনেছি !!!

এ অভিযোগটিকে যাঁরা সারগর্ভ মনে ক'রে থাকেন, তাঁরা প্রায়ই

---

* বঙ্গবাণী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩—"হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ" প্রবন্ধে।

সেকালকার মানুষ যাঁদের চোখে শুধু আজকালকার ছেলেরা নয়, আজকালকার সবই অকিঞ্চিৎকর ব'লে গণ্য হ'য়ে থাকে। ইংলণ্ডের বিখ্যাত লেখক হিউম বলেছেন :—To declaim aganist present times and magnify the virtues of remote ancestors, is a propensity almost inherent in human nature. এরূপ মনোভাবের তলস্পর্শ করা খুব কঠিন নয় :—যে মাছটা পালায় সে মাছটাকে বড় ক'রে দেখার মানুষের একটা সহজ দুর্ব্বলতা আছে। অন্ততঃ পুরাতনপন্থীদের নূতন বিরাগের মনস্তত্ত্ব যে অনেক সময়েই এই দুর্ব্বলতার উপর প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে থাকে এটা নিশ্চিত।

সুতরাং আমরা আজকাল যে-সব ওস্তাদের গানবাজনা শুনে থাকি তাঁদের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর গায়ক যে আমাদের ঠিক্ অব্যবহিত আগেকার যুগে ঝাঁকে ঝাঁকে মিলত বিজ্ঞভাষীদের গম্ভীর সাক্ষ্যেও এ কথা বেমালুম বিশ্বাস করা একটু কঠিন। বস্তুতঃ নানা কারণে আমাদের জাতীয় জীবনে তমের প্রভাব এখন খুবই বেশি ও বিস্তৃত হ'য়ে পড়েছে,—যার ফল ললিতকলার উপর না ফ'লেই পারে না। তাই মনে হয় যে আমাদের ঠিক্ আগেকার যুগেও আজকের মতন দু-চারজন মুষ্টিমেয় গুণীই সত্য শিল্পের মন্দিরে প্রদীপটুকু জ্বালিয়ে রাখ্‌তেন। প্রবীণেরা হয়ত এ কথা অপ্রমাণ করবার জন্যে ডজন দুই তিন সাত আট গন্ডা কালোয়াতি নাম আওড়ে আমাদের নিরুত্তর ক'রে দেবার প্রয়াস পাবেন। কিন্তু এ অকাট্য যুক্তির উত্তরে সত্যান্বেষীর মনে যে প্রশ্নটি আসে সেটি এই যে এ গালভরা নামের সাক্ষ্যে মস্ত কিছু একটা প্রমাণ হয় কিনা বা শুধু পরলোকগমনের জোরেই জঙ্গ বাহাদুর বা রাওসাহেব মহিমময় ওস্তাদ হ'য়ে ওঠ্‌বার দাবী করতে পারেন কি না। এ সন্দেহ যে অমূলক নয় তার একটা প্রমাণ পাওয়া যায় যদি আমরা একটু নির্ভীকভাবে সে-যুগের মহাকাঙ্ক্ষার

ভুক্তাবশিষ্ট দু· একজন কালোয়াতের গান শুনতে যাই—যেমন ধরুন সঙ্গীতরত্নাকর বৈরম-কুলতিলক মহাধনুর্দ্ধর আল্লাবন্দে খাঁর খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদের হুহুঙ্কার আলাপ। ইনি অনেকটা আইডিয়া দিতে পারেন, সে-যুগে কাদের ওস্তাদ ব'লে লোকে দূরে থেকে নমস্কার ক'রেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করত। কথায় বলে এই বিড়ালই বনে গেলে বনবিড়াল হয়। আজ যে-সব ওস্তাদদের স্বরূপ আমরা ধ'রে ফেলেছি, ঢাক বাজাতে জানলে পরবর্ত্তী যুগে সেই সব ওস্তাদকেই প্রতিভার অবতার ব'লে সাব্যস্ত করা খুব কঠিন কাজ হবে না এই জন্যে যে, তখন সে প্রমাণ-প্রয়োগের যৌক্তিকতা অপ্রমাণ করা অসম্ভব হ'বে। তাই নবযুগের সঙ্গীতানুরাগী এ কথা নির্ব্বিচারে মেনে নিতে পারেন না যে আমাদের সঙ্গীত ভূতকালে এমন একটা অদ্ভুত কিছু জিনিষ ছিল যার কোনও ধারণাই আমাদের মনে আজ গজিয়ে ওঠা সম্ভবপর নয়।

দ্বিতীয়তঃ যদি তর্কের খাতিরে স্বীকার ক'রেও নেওয়া যায় যে, ভূতকালের ওস্তাদি-সঙ্গীত অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল, তা হ'লেও তা থেকে প্রমাণ হয় না যে আমাদের বর্ত্তমান-যুগের ওস্তাদি-সঙ্গীতের গুণগ্রহণ বা দোষ দর্শন নিরর্থক। যে অতীত নিঃসন্দেহ সম্পূর্ণ ভাবে অতীত, সেটা বিদ্যমান নয় ব'লে বৃথা অশ্রুপাত ক'রে ফল নেই। বস্তুত আমার বক্ষ্যমান আলোচনার মূল উদ্দেশ্য—বর্ত্তমান সঙ্গীতেরই দোষগুণ বিচার ক'রে তা থেকে তার উচ্চতর আদর্শ নিরূপণের যথাসাধ্য চেষ্টা-পাওয়া,—"তে হি নো দিবসা গতাঃ" ব'লে বর্ত্তমান সঙ্গীতের প্রায়োপবেশন ব্যবস্থা করা নয়।

পরিশেষে আর একটি কথা বলতে চাই। সেটা এই যে, আমাকে নিতান্ত দায়ে প'ড়েই অনেক স্থলে আমাদের ওস্তাদ সম্প্রদায়ের সঙ্গীতের বিরুদ্ধ সমালোচনা করতে হ'য়েছে। কেন না তা না ক'রে শুধু তাঁদের গুণের মর্য্যাদা দিয়ে যেতে গেলে তাতে ক'রে দৃশ্যতঃ সুশীল হওয়া হয়ত সহজতর

হ'য়ে উঠ্‌ত, কিন্তু আমাদের সঙ্গীতের ধারার ভবিষ্যতে কি-ভাবে পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত, সে বিষয়ে আমার মূল ধারণাগুলি খুব স্পষ্ট ক'রে তোলা সুসাধ্য হ'ত না। অবশ্য সঙ্গীতকলার মনোহারিত্ব বাড়াতে হ'লে, তার মধুরতা বাড়ানো দরকার, তাকে সুমার্জ্জিত করা দরকার, তার সশ্রদ্ধ চর্চ্চা দরকার,—এ রকম ফাঁকা বুলি আওড়ানো শক্ত নয়। কিন্তু কোথায় এবং কেমন ক'রে আমাদের সঙ্গীতকলার পতন হ'য়েছে, সে সম্বন্ধে গঠন-মূলক কোনও ইঙ্গিত কর্‌তে হ'লে আগাছা গুলির পিছু টানের বিপদের প্রতি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখান ভারি সহায়তা করে। তাই আমার বিনীত নিবেদন এই যে, ওস্তাদি-পন্থিগণ প্রথম থেকেই অসহিষ্ণু হ'য়ে না উঠে যেন একটু সহৃদয় ভাবে এই কথাটি মাত্র বুঝবার চেষ্টা করেন যে ওস্তাদ বর্গকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করায় আমার শুধু যে কিছু লাভ থাক্‌তে পারে না তাই নয়, তাতে আমার সমূহ লোক্‌সানের ভয়ই ষোল আনা। বস্তুতঃ আমি কোনও ওস্তাদকে কখনও ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করি নি, যেহেতু প্রতি ওস্তাদের গান বাজনার সমালোচনাই আমার লক্ষ্যস্থল; এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি এমন অনেক ওস্তাদের ঐকান্তিক সঙ্গীত সাধনার নিষ্ঠার প্রতিই মনেপ্রাণে শ্রদ্ধাবান্, যাঁদের গান আমি নিম্নশ্রেণীর মনে করি। কেবল আমার মনে হয় যে, আমাদের কালোয়াত সম্প্রদায় আজকাল যে নিছক গতানুগতিকের পথে ভারতীয় সঙ্গীতের বিকাশ করবার প্রয়াসী সেটা ভুল পথ।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ স্বনামধন্য লেখক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে আমার এই সামান্য পুস্তকখানিরও একটি সুচিন্তিত ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ ক'রেছেন।

বৈশাখ, ১৩৩৩

শ্রীদিলীপকুমার রায়

পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	গ্রহণের তারিখ	পত্রাঙ্ক

রবীন্দ্রনাথের

কয়েকখানি বই

—নূতন স্বরলিপি—

গীতমালিকা ২য় ভাগ ২৲

—পাঠ্য পুস্তক—

পাঠ পরিচয় ২য় ভাগ	।৵০
পাঠ পরিচয় ৩য় ভাগ	||৴০
পাঠ পরিচয় ৪র্থ ভাগ	||৶০
ইংরেজি সহজ শিক্ষা ১ম ভাগ	।০
ইংরেজি সহজ শিক্ষা ২য় ভাগ	।৴০

—নূতন উপন্যাস—

যোগাযোগ

সুদীর্ঘ উপন্যাস —৪৭৩ পৃষ্ঠা, মূল্য ২।০
সুন্দর কাপড়ের বাঁধাই —২৸০

শেষের কবিতা

বড় অক্ষরে পরিষ্কার ছাপা—২৩২ পৃষ্ঠা,
মূল্য ১||০, কাপড়ের সুদৃশ্য বাঁধাই ২৲, ২।০

মহুয়া

ডাকযোগে সম্মোহনবিদ্যা শিক্ষা

সরল বাঙ্গালা উপদেশমালার সাহায্যে এবং আবশ্যকমত চিঠিপত্রে উপদেশ দিয়া প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ১০ সপ্তাহের মধ্যে হাতে-কলমে (practically) শিখাইয়া কৃতকার্য্য করিয়া দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত মনঃশক্তি বলে বহুপ্রকার শারীরিক ও মানসিক রোগ আরোগ্য এবং চরিত্র ও অভ্যাস দোষ-সকল স্থায়ীরূপে বিদূরিত করা হয়। বহু রোগী আরোগ্য করা হইয়াছে। বিস্তৃত বিবরণের জন্য /০ ডাক টিকিটসহ আজই পত্র লিখুন।

প্রফেসার আর, এন, রুদ্র,

সাধনা কুটীর, পোঃ আলমনগর, রংপুর

দশ হাজার টাকা পুরস্কার

পাচক

১ মাত্রায় চিত্তচাঞ্চল্য, অম্ল ও শূলের অসহ্য কষ্টের উপশম, নিয়মিত সেবনে অম্ল, অজীর্ণ, অনিদ্রা, অগ্নিমান্দ্য, শূল, বায়ুবৃদ্ধি ও যকৃৎ-বিকৃতি আরোগ্য হয়। শিশি ১৲ টাকা। পাচকে উল্লিখিত উপকার না হইলে অথবা আমার ঔষধালয়ের চ্যবনপ্রাশ, মকরধ্বজ প্রভৃতিতে ভেজাল থাকা

গোলাপ গাছ

বসাইবার সময় উপস্থিত। আমাদের নিকট এক্ষণে নানাপ্রকার সুন্দর ও সুগন্ধযুক্ত গোলাপের কলম প্রস্তুত আছে। আমাদের নির্ব্বাচিত প্রতি ডজন ১॥০, ৩৲, ৪৲, ও ৬৲ এবং প্রতি শত ১০৲, ২০৲, ২৫৲ ও ৪০৲ টাকা।

আজকাল বসাইবার সব্জী বীজ ১৫ রকম ১৲, ও ৮ রকম ফুলের বীজ ১॥০,। গাছের অর্দ্ধেক মূল্য, অগ্রিম পাইবামাত্র আমরা যত্ন-সহকারে আদিষ্ট গাছ পাঠাইয়া থাকি। ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাঠান হয়, এবং আমাদের বাগানে আসিলে অতি যত্নসহকারে পরিদর্শন করান হয়।

নূরজাহান নার্শারি—২নং কাঁকুড়গাছি ফার্ষ্ট লেন, কলিকাতা

ডাঃ উমেশচন্দ্র রায় এল, এম, এস, মহাশয়ের

জগদ্বিখ্যাত

পাগলের মহৌষধ

৫০ বৎসর যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়া শত সহস্র দুর্দ্দান্ত পাগল ও সর্ব্বপ্রকার বায়ুগ্রস্ত রোগ আরোগ্য করিয়াছে। মূর্চ্ছা, মৃগী, অনিদ্রা, হিষ্টিরিয়া, অক্ষুধা, স্নায়বিক দুর্ব্বলতা প্রভৃতি রোগে আশুফলপ্রদ ও অব্যর্থ। পত্র লিখিলে ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাঠাই। প্রতি শিশি মূল্য ৫৲টাকা।

প্রবাসীর বিজ্ঞাপনের মাসিক মূল্য

১। পূর্ণ সাধারণ পৃষ্ঠা ৩০৲, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা বা এক কলম ১৬৲, সিকি পৃষ্ঠা অর্দ্ধ কলম ৯৲, সিকি কলম ৫৲ টাকা। ২। সূচীর পার্শ্বে ১ পৃষ্ঠা ৪০৲; সূচীর নীচে অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ২০৲; অন্য বিশেষ পৃষ্ঠা পত্রে জ্ঞাতব্য। ৩। সাধারণ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপনদাতারা তাঁহাদের বিজ্ঞাপন কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে ছাপিবার জন্য দাবি করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবে না। ৪। কোন মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে জানাইতে হয়। না জানাইলে বিজ্ঞাপনদাতার পুরাতন বিজ্ঞাপন বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা নাই বুঝিয়া পুরাতন বিজ্ঞাপন ছাপিব। নূতন বিজ্ঞাপন ১৫ই তারিখের মধ্যে দেয়। অশ্লীল বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না। বর্জ্জাইস অক্ষরে ছাপিতে হইলে সাধারণ হার অপেক্ষা অধিক মূল্য লাগিবে।

চয়নিকা

কয়েকটি নূতন কবিতাসহ পুনর্ম্মুদ্রিত হইল।

মূল্য—২৸০, ৩৷০

"গীতাঞ্জলী", "প্রহসন", "চারিত্র পূজা", "মুকুট", "বসন্ত", "নৌকাডুবি"র নূতন সংস্করণ বাহির হইয়াছে।

পত্র লিখিলেই রবীন্দ্রনাথের সমস্ত বই এবং বিস্তৃত মূল্য-তালিকা পাওয়া যায়।

ভানুসিংহের পত্রাবলী

ছোট একটি মেয়েকে-লেখা কবির অপূর্ব্ব চিঠি। মূল্য ১

সহজ পাঠ

প্রথম ভাগ ।৵০
২য় ভাগ ৶১০

সবে মাত্র যাহাদের হাতে খড়ি হইয়াছে, তাহাদের বর্ণ-পরিচয় ও বানান শিক্ষার জন্য লিখিত। চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর দ্বারা চিত্রিত।

বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়

২১০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ভ্রাম্যমানের দিন-পঞ্জিকা

প্রায় সকলেই ভ্রমণ কর্ত্তে বাহির হয় কোনও একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। আমারও পাঁচ-ছয় মাস ধরে ভারত-ভ্রমণে বাহির হওয়ার দুই একটা উদ্দেশ্য ছিল। তার মধ্যে প্রধান উদ্দেশ্যটা শুনলে কিন্তু সম্ভবতঃ অনেকেরই বিস্ময়ে বাক্‌রোধ হবার সম্ভাবনা। সে উদ্দেশ্যটি হচ্ছে, ভারতের শ্রেষ্ঠ গায়ক-গায়িকাদের গান শোনা—অবশ্য গানের মধ্যে বাজনাও বুঝে নিতে হবে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি ছিল, নানারকম চিত্তাকর্ষক লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করা; ও তৃতীয় উদ্দেশ্য—দেশ দেখা। অবশ্য "দেশ দেখা" বল্‌তে সকলের মুখেই একরকম শোনালেও, প্রত্যেকের দেশ দেখার মধ্যে তার বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ পাবেই। আপিসের কাজে আমাদের প্রায় কারুরই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় না। তার কারণ, সে কাজটার মধ্যে কোনও সহজ স্ফূর্ত্তি বা প্রেরণা নেই, সেটা বাধ্যতামূলক। কিন্তু ভ্রমণটা অন্ততঃ অধিকাংশ লোকেই আনন্দের প্রেরণাতেই করে থাকে—এক আমেরিকান touristরা ছাড়া অবশ্য। তবে তাদের ক্ষেত্রে এরূপ হওয়ার কারণ এই যে, তাদের উদ্দেশ্য ভ্রমণ করা নয়—তাদের উদ্দেশ্য ইংরাজিতে যাকে বলে "Doihg it"। বার্লিনে আমার পরিচিতা এক সুরসিকা সম্ভ্রান্ত জার্ম্মাণ মহিলা এ সম্পর্কে আমাকে বেশ একটি গল্প বলেছিলেন। তাঁর পরিচিত একটি আমেরিকান মেয়ে দেশভ্রমণে বেরিয়ে তাঁকে এসে বলেছিলেন যে, লণ্ডনে দ্রষ্টব্য কি কি স্থান আছে, সেগুলি তাঁর guide-

শ্রেষ্ঠ বাইদের মধ্যে অন্যতম ত নিশ্চয়ই। বিশেষতঃ ভৈরবী এঁর মতন কম বাই-ই গাইতে পারেন।

লক্ষ্ণৌয়ে এক তালুকদারের বাড়ীতে দেওয়ালি উপলক্ষে আর একজন গায়িকার গান শুনেছিলাম, যাঁর নাম উল্লেখযোগ্য। এ গায়িকাটির নাম ইন্দর বাই; লক্ষ্ণৌয়ের কাছে কোথায় থাকেন। প্রথমে এঁর বয়স অপেক্ষাকৃত কম দেখে মনে হয়েছিল যে তিনি কখনই ভাল গাইতে পারবেন না। কারণ আমাদের গান এমন দুরূহ জিনিস যে অল্প বয়সে তাতে বিশেষ পারদর্শী হওয়া বাস্তবিকই অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু, তিনি রাত দশটায় আরম্ভ করলেন ও রাত বারটা থেকে তিনটে অবধি এমন গান গাইলেন যে, শুধু আমি নয়, আমার সঙ্গে দু তিন জন গম্ভীরানন প্রফেসর ছিলেন, তাঁদের গম্ভীর আননও একটু তরল হ'য়ে এল বলে মনে হয়েছিল। ইন্দর বাইএর গলাটি মধুর হলেও খুব অসাধারণ রকমের মধুর নয়। কিন্তু গলায় একটা মস্ত জিনিস, দরদ ছিল। বিশেষতঃ খান কয়েক গজল এত সুন্দর গাইলেন যে গজলের উপর আমার ভক্তি বেড়ে গেল। এঁর খেয়াল খুব ভাল নয়, তবে ঠুংরি ও গজল এঁর অতি সুন্দর। আমাদের এই আসরে এক নবাব ছিলেন—খুব মূর্খের মত জরীর পোষাক পরা, যেমন নবাবদের সচরাচর হয়ে থাকে। লোকটি কিন্তু একজন রসিক লোক, কারণ, সুরের যে সব মোচড়ের যায়গায় তিনি আমাদের পানে অষ্টমীর ছাগশিশুর ন্যায় করুণ নয়নে চাইছিলেন, সে সব যায়গায় সুরের মাধুর্য্য বাস্তবিকই বেশি ছিল। বে-সমজদার লোক কখনও ঠিক যায়গায় মাথা নাড়তে পারে না বা আহা উহু বল্‌তে পারে না, এ কথা সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি [illegible] জানেন। কিন্তু এঁর তারিফ-ব্যঞ্জক অব্যক্ত চাহনি যথা[illegible] প্রয় [illegible] গেছে। তার মধ্যে একটা কেমন যেন হাস্যকর উপাদান ছিল। [illegible] যাঁদের [illegible] ইনি নবাব বলে। কিন্তু সে যাই হোক্, এঁর সেই করুণ "আহা [illegible]

মজ্জা-মাখা চাহনি যে গায়িকার পক্ষে একটা মস্ত প্রেরণা ছিল, তাতে আমাদের কারুরই সন্দেহ ছিল না। বাই সাহেবার সঙ্গে ইনি উর্দ্দু ভাষায় যে সব কথা বল্‌ছিলেন তার মধ্যে লক্ষ্ণৌয়ের চিরপরিচিত কপট অত্যুক্তির রেশ বিলক্ষণ ছিল। কিন্তু কপট উক্তি যে শ্রুতিমধুরতায় খাটো হয় না, তা বুঝতে হলে একবার লক্ষ্ণৌ যাওয়া দরকার।

লক্ষ্ণৌয়ে এ সব বিভিন্ন গায়ক গায়িকার মধুর কণ্ঠে গীত হিন্দুস্থানী-গান উপভোগ করতে করতে আমাদের সঙ্গীতের মাধুর্য্যের চরম বিকাশের পক্ষে কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্যের মূল্য যে কতখানি, তা যেন আমি আবার নতুন করে উপলব্ধি করেছিলাম। এবং এ সূত্রে আমার আবার মনে হয়েছিল যে, গানের গভীর আনন্দ দানের পক্ষে মধুর স্বরের আমরা যথেষ্ট দাম দিতে শিখি নি। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে পরে লেখার ইচ্ছে আছে—তাই এখানে শুধু এই কথাটি মাত্র বলে রাখি যে, কণ্ঠ-সঙ্গীতে রাগালাপের চরম মাধুর্য্য কখনই কর্কশ গলায় তেমন বিকাশ পেতে পারে না। আমি কাশীতে ও গোয়ালিয়রে দু জন বিখ্যাত গায়িকার গান শুনেছিলাম। তাদের নাম মঙ্গু বাই ও হুশ্‌না জান। একজনের বয়স প্রায় ৭০, অপর জনের ৬০।৬৫। গানে এদের দুজনেরই অসাধারণ দখল দেখে অবাক্ হয়েছিলাম সন্দেহ নেই—কিন্তু বয়সের দরুণ তাদের কারুরই কণ্ঠস্বর তেমন মিষ্ট ছিল না বলে তাতে ততটা তৃপ্তি পাইনি, যতটা তাদের গলা মিষ্ট হলে পেতাম। আমাদের উচ্চশ্রেণীর গানে কণ্ঠস্বরের মিষ্টতার দাম কতখানি, আর রাগালাপের ক্ষমতার দাম কতখানি, সে দুরূহ সমস্যাটির সমাধান স্থগিত রেখে, আপাততঃ এটুকু বোধ হয় বলে রাখা যেতে পারে যে, আমাদের ... সঙ্গীতের ...তনের জন্য কণ্ঠের কর্কশতা বড় কম দায়ী নয়।

কণ্ঠস্বর ... অনেকগুলি ভাল গায়ক ও বাদক নবাবের পৃষ্ঠপোষকতায় মধ্যে সে... ...তেল, করে' সুখে কালাতিপাত করেন শুনে সেখানে গোঁ...

সেখানে গিয়ে তুই একজনের সুপারিশে নবাব সাহেবের "মেহমান" (অতিথি) হয়ে মহা মুস্কিলে পড়তে হয়েছিল। নবাব সাহেবের সেক্রেটারী মহাশয় ষ্টেশনে গাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাকে ধুতি পরা দেখেই কি না জানি না, প্রথমটা তারা বিশ্বাসই করে নি যে, এক বাঙালী বাবু নবাব সাহেবের মত হোমরাও চোমরাও লোকের অতিথি হতে পারে। কিন্তু ট্রেণ থেকে অন্য কোনও ভদ্রলোককে সেই পাণ্ডব-বর্জ্জিত স্থানে নাম্‌তে দেখতে না পেয়ে তারা অগত্যা সিদ্ধান্ত করল যে আমিই নিশ্চয় নবাবসাহেবের মেহ্‌মান হব। ইতিমধ্যে রামপুরের টঙ্গাওয়ালারা নষ্টনীড় মৌমাছির মত আমাকে ছেঁকে ধরে প্রায় বিহ্বল করে ফেলেছিল। আমার বিছানা এক টঙ্গায় ও তোরঙ্গ অপর টঙ্গায় দেখে এবং কুলি ও বিভিন্ন টঙ্গাওয়ালাদের মধ্যে বিবাদের দৃশ্য দর্শন করে আমি যখন প্রায় কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়ে পড়েছি, তখন নবাবসাহেবের সারথি আমাকে প্রচুর ব্যাখ্যা সহকারে তাঁদের আমাকে খুঁজে পেতে দেরী হবার অগণ্য সন্তোষজনক কারণ জ্ঞাপন কর্লেন। আমি আগে থেকেই রামপুরে এক বাঙালী ডাক্তার ভদ্রলোকের ওখানে আমার থাকার বন্দোবস্ত করেছিলাম। কিন্তু নবাবের সারথি-পুঙ্গব আমাকে সটাং এক হোটেলে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন। আমি ডাক্তার বাবুর ওখানে যাব বলাতে, সকলেই একবাক্যে আমাকে জানালেন যে, সেটা অসম্ভব ; যেহেতু আমি এবার নবাব সাহেবের মেহমান (অতিথি)। নবাব সাহেবের মেহমান হলেই আমার বন্ধু সত্ত্বেও হোটেলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হওয়া কোন তর্কশাস্ত্রসিদ্ধ জিজ্ঞাসা করাতে, তাঁরা সকলেই আমাকে এক-বাক্যে উপদেশ দিলেন যে, সেইটেই হচ্ছে সেখানকার অতিথি-সৎকারের কেতা। আমি আহারীয় সম্বন্ধে প্রশ্ন [illegible] গেছে তারা অম্লানবদনে বলল, "সে খুব সহজ ব্যবস্থা, সিধে আ[illegible] যাঁদের, তাই পাবেন, ও রেঁধে খেয়ে নেবেন।"

"আহা [illegible]

ক্ষুধাশান্তির এরূপ সহজ উপায় কল্পনা করেই আমার প্রায় বাক্‌রোধ উপস্থিত হওয়াতে, তারা আমার রন্ধননৈপুণ্যের অভাব সিদ্ধান্ত করে ভরসা দিয়ে বল্‌ল, "রাঁধতে না জান্‌লেও ভাবনা নেই। সিধে রেঁধে দেবার লোকও আছে।" সেই রাত্রে আবার নবাব সাহেবের সিধে এনে তার পর তাকে রাঁধিয়ে খেতে হবে, (যখন ডাক্তার সাহেবের ওখানে তাঁর স্ত্রী স্বহস্তে আমার জন্যে রেঁধে অপেক্ষা করে বসে আছেন) এ কথা ভেবে মনে হ'ল, কুক্ষণে নবাব সাহেবের অতিথি হতে সাধ গিয়েছিল। কিন্তু অবশেষে প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের সহিত হঠাৎ পুরুষোচিত উদ্দীপ্ত ক্রোধে তাদের তারস্বরে জ্ঞাপন কর্লাম যে, আমি যে ডাক্তার সাহেবের ওখানে উঠব তা নবাব সাহেব জানেন। এ কথায় তারা একটু থতমত খেয়ে গেল, ও অনেক জল্পনার পর বল্‌ল, "আচ্ছা, আপনি ডাক্তার সাহেবের ওখানেই থাক্‌তে পারেন ; কিন্তু জেনে রাখুন যে 'মেহমান' আপনি নবাব সাহেবের, আর কারো নন।" আমি সানন্দে বল্লাম "তথাস্তু।" মনে মনে বল্‌লাম, "চিত্রগুপ্তের জেনে রাখ্‌তেও আপত্তি ছিল না—যদি বস্তুতঃ বাঙালী রান্না খেতে পাই।" অতি কষ্টে নবাব সাহেবের আতিথ্যের হাত হতে পরিত্রাণ পেয়ে, কোনও মতে ডাক্তার সাহেবের ওখানে গিয়ে আমার নবাবী আতিথ্য-সৎকারের বিড়ম্বনার কাহিনী খুলে বল্‌লাম। আমার গৌরবময় লাঞ্ছনার কাহিনী শুনে তাঁদের কৌতুকহাস্য কতক্ষণ স্থায়ী হয়েছিল, তা বোধ হয় বর্ণনা করার চেয়ে অনুমান কর্‌তে ছেড়ে দেওয়াই ভাল।

সে রাত্রে ত পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে ডাক্তার মহাশয়ের ওখানে কাটানো গেল। তার পরদিন সকাল বেলা ডাক্তার সাহেবের স্ত্রী আমাকে হেসে বল্লেন, "নবাব সাহেব ভারে ভারে আপনার জন্য যে সিধে পাঠিয়েছেন, নিজেই দেখে যান।" গিয়ে দেখ্‌লাম যে সে এলাহী কাণ্ড—চাল্, ডাল, তেল, ঘি, কপি, মাংস, চিনি ইত্যাদি ইত্যাদি মায় কয়লা পর্য্যন্ত। তাতে

অন্ততঃ ৩।৪ জনের তুবেলা খাওয়া হ'তে পারে। অথচ আমার না কি সে-সব এক বেলায় খেয়ে ফুরিয়ে দেবার কথা কারণ ওবেলায়ও নাকি ঐ পরিমাণ ভেট আস্‌বে। তার ওপর নবাব সাহেব এক পরিচারক পাঠিয়েছিলেন। আমি তাকে বল্‌লাম "নবাব সাহেবকে আমার অনেক সেলাম জানিও; কিন্তু তোমার সেবা গ্রহণ করার আমার কোনও দরকার নেই; যেহেতু আমি ডাক্তার সাহেবের অতিথি।" সে কিন্তু নাছোড়বন্দ্। বল্‌ল, "আপনার সেবা আমি করবই। কারণ তা না হলে আমার নিস্তার নেই।" আমি তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, অধম নিস্তারণের ভার আমার নয়, সে ভার কল্কি দেবের; কিন্তু উত্তরে সে আমাকে বিশদ ভাবে বুঝিয়ে দিল যে, যেহেতু আমি **technically** নবাব সাহেবের মেহমান, সেহেতু আমার সেবা করার অধিকার তার মারে কে? বুঝ্‌লাম যে "হাঁ, সনাতন নবাবী অতিথি-সংকার বটে!" এ সম্বন্ধে নবাবের ধারণা অভ্রভেদী। তিনি কোনও উৎসব উপলক্ষে রামপুর ষ্টেশনের প্রতি ট্রেণের যাত্রীদের উৎকৃষ্ট থলি-ভরা মিষ্টান্ন উপহার দিয়েছিলেন, তা আবার এক দিন নয় তিন দিন ধরে। অতএব আমি দেখলাম যে **resignation** রূপ গুণটির চর্চ্চা করাই শ্রেয়! নবাব সাহেবের আতিথ্য পাছে আমাদের দেশের আর কেউ গ্রহণ করেন, সেই আশঙ্কায়ই আমি এত কথা লিখতে বাধ্য হলাম।

সে যাই হোক্, রামপুরের একজন বড় ওস্তাদ মুস্তাক হুসেনের গান, আর বিখ্যাত স্বনামধন্য উজীর খাঁর বীণা শুন্‌লাম। গান বিশেষ ভাল লাগল না কারণ (১) গায়কের গলা ভাল নয় (২) গায়কের গানের মধ্যে কোনও dignityর অস্তিত্ব খুঁজে পেলাম না। শুধুই তান দেওয়া যে বড় আর্ট নয় ও অত্যন্ত শ্রান্তিকর তার যদি কেউ প্রত্যক্ষ প্রমাণ চান তবে যেন তিনি অন্ততঃ একবার রামপুরের মুস্তাক হুসেনের কিম্বা বড়ে

বালগন্ধর্ব্বের গান শোনেন। উজীর খাঁ সাহেবের বীণা কিন্তু ভারি ভাল লাগ্‌ল। সেদিন বেশিক্ষণ শোনা হয়ে উঠ্‌ল না, কিন্তু একটি গৌড় সারঙ্গের আলাপেই খাঁসাহেবের অসাধারণ মিষ্ট হাতের পরিচয় পাওয়া গেল। তার পর বম্বেতে খ্যাতনামা তিলঙের বীণা শুনেছিলাম; কিন্তু খাঁ সাহেবের পর বড়ই সাধারণ লেগেছিল। সঙ্গীতের আর্ট ঠিক্ কোথায়, সে সম্বন্ধে মুসলমানদের মধ্যে বোধ হয় কারুর কারুর একটু অন্তর্দৃষ্টি আছে, যদিও শিক্ষার অভাবে সেটা প্রায়ই তারা ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করে বোঝাতে পারে না।

রামপুরের নবাবের আতিথ্য যেন আমি পুনরায় স্বীকার করি এই সর্ত্ত করে আমি রামপুর পরিত্যাগ কর্লাম।

বেরিলিতে কয়েক ঘণ্টার জন্য ছিলাম; কিন্তু যেদিন আমি সেখানে গিয়াছিলাম, ঠিক্ সেইদিন সেখানকার কয়েকজন প্রবাসী বাঙ্গালী মিলে এক গানবাজনার আসর করে তুলেছিলেন।

বেরিলিতে এই আসরে আমার অনুরোধে ঘুরণ বলে সেখানকার একজন বড় মুসলমান গায়ককে আনা হয়েছিল। এমন চমৎকার টপ্পা ক শোনা যায় না—বিশেষতঃ এমন সুন্দর টপ্পার দানা। আমাদের গিট্‌ক বা মূর্চ্ছনার সৌন্দর্য্য নির্ভর করে তার পরিষ্কার হওয়ার উপর। টি অবশ্য গিট্‌কারী শুন্‌লে এ কথার যাথার্থ্য আরও উপলব্ধি হবে। সুন্দর।

আগ্রার তাজমহল যে কতখানি ভাল লাগ্‌ল তা বলে শেষ করা সাগর কঠিন। তাজমহল দেখতে দেখতে প্রায়ই কবিবরের অমৃতময়ী বর্ণনাও মন্থর— মনে হ'ত। তাতে তাজমহল-উপভোগের রস যেন আরও মধুরান্ত বোধ হয় দিত। এক শিল্পকলার উপভোগ অপর কোন কলার মধ্যমাধুলির একটু সমৃদ্ধতর হয়ে ওঠে, তা "সৌন্দর্য্যের পুঞ্জেপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে" ঐমিক্ কর্ত্তে ছন্দের বর্ণনায় মুহূর্ত্তের মধ্যে উপলব্ধি করা যায়। এই সূত্রে ফাঁকে ফাঁকে

হয়েছিল যে বিভিন্ন শিল্পকলার মধ্যে techniqueএর আকাশ পাতাল প্রভেদ থাক্‌লেও তাদের মধ্যে একটা সত্য মিলনের ক্ষেত্র আছে।

কিন্তু সে কথা থাকুক। তাজমহলের নানান্ সময়ে নানান্ রূপ। আকাশে অনুদিত অরুণচ্ছটার আলোয় তাজমহল এক রকম; উদীয়মান রক্ত-রবির রঙীন আলোয় এক রকম; দ্বিপ্রহরের উজ্জ্বল রূপালি আলোয় এক রকম; আবার সন্ধ্যায় চন্দ্রালোকের ম্লানমৌন গরিমায় অন্য এক রকম। নানান্ আলোয় যে কোনও মানুষী কীর্ত্তির রূপেরও এত রকম প্রকৃতিভেদ হতে পারে, তা আমার জানা ছিল না। পারিসের **Notre-dame**, মিলানোর **Cathedral**, রোমের **Vatican**, পিসার **Leaning tower**—এ সবের কোনও কিছুই তাজমহলের মত বহুরূপী নয়।

সাগর যায়গাটিতে আমার এক বন্ধু তাঁদের বাড়ীতে ধরে নিয়ে গেলেন। এমন সুন্দর ছোট্ট সহর আমি খুব কমই দেখেছি। আমার বন্ধুবরের বাড়ীটি একেবারে একটি বিশাল নীলহ্রদের উপরে। সময়ে সময়ে হ্রদটির বক্ষে এমন চমৎকার নীল রঙ ফল্‌ত, যা দেখে আমার সুইজর্লণ্ডের হ্রদের কথা মনে হ'ত। অবশ্য সুইজর্লণ্ডের হ্রদগুলির মধ্যে অধিকাংশই ২০।২৫ ...লরও বেশি লম্বা, এবং সেখানকার তীরবর্ত্তী ঘরবাড়ীও অনেক বেশি মাই... কিন্তু আমার মনে হ'ত যে সাগরের হ্রদটিও যদি তেমন শিল্পীর সুন্দর ...ত, তবে সে এর রূপ শতগুণে বাড়িয়ে দিতে পারে। সাগরে হাতে ... মাসের শেষেও শীত খুবই কম—বিশেষতঃ লক্ষ্ণৌ আগ্রার তুলনায়। ডিসেম্ব... জলবায়ু তাই একটা মস্ত আকর্ষণ। সেখানে সুন্দর সুন্দর বন সাগরে...ম। শুন্‌লাম সেখানে বাঘও পাওয়া যায়। তবে এ তথ্যটিতে পথও আ...যে খুব গভীর হর্ষের উদয় হয়নি তা বলাই বেশি।

আমার মনে থেকে বেরারে আমার এক বন্ধুর ওখানে নিমন্ত্রণ ছিল। বেরার সেখ... শ শৈলময়। কাজেই দেখতেও মনোহর। কিন্তু বেরারের লোকে দশটি ...

দেখা গেল তুলো ছাড়া অন্য কোনও বিষয়ে কথা কয় না। কারণ জিজ্ঞাসা কর্লে বলে "Nothing like তুলো"। আমার বন্ধুবর এমন তুলোধ্যান-তুলোজ্ঞান দেশে আছেন কেমন করে জিজ্ঞাসা করাতে এমন একটা উত্তর পাওয়া গেল যাকে তিনি ছাড়া অপর কারুরই একটা পরিচারু উত্তর বলে মনে করার সম্ভাবনা নেই। আমরা সকলে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের উপদেশ অনুযায়ী মাড়োয়ারী হ'লে আমাদের কথাবার্ত্তা কি রকম প্রণালীতে প্রবাহিত হবে, তা যদি কেউ জান্তে চান, তবে যেন তিনি একবার বেরারের মান্যগণ্য লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়ে আসেন। একদিন সেখানে দুজন বেশ সুশ্রী ইংরাজকে ষ্টেশনে দেখলাম। দুচারজন বেশ গণ্যমান্য ভারতীয় ব্যবসায়ী তাঁদের ষ্টেশনে তুলে দিতে এসেছিলেন। কিন্তু ইংরাজ ভদ্রলোক দুটি বেশ সুদর্শন ও refined মনে হ'লেও তাঁদের মুখেও অনর্গল কেবল তুলোর মহিমাকীর্ত্তন ছাড়া অন্য কিছুই শোনা গেল না।

বোম্বাই সহরটির প্রাকৃতিক দৃশ্য মন্দ নয়। মালাবার পাহাড়টি অবশ্য বোম্বাইয়ের শ্রেষ্ঠ শোভা। সেখান থেকে সূর্য্যাস্ত দেখতে বড় সুন্দর। বোম্বাইয়ের সমুদ্র বঙ্গসাগরের মত চিত্তাকর্ষক নয়—কারণ, বঙ্গোপসাগর যেমন সজীব ও নৃত্যশীল, আরব মহাসাগর তেম্নি নির্জীব ও মন্থর—অন্ততঃ বোম্বাইয়ের কাছে। কিন্তু প্রশান্ত সাগরবক্ষে সূর্য্যাস্ত বোধ হয় তার প্রশান্তির জন্যই আরও সুন্দর বোধ হয়। তার পর গোধূলির একটু পরেই পাহাড়ের পাদদেশে অগণ্য আলোক-শ্রেণী যখন ঝিক্মিক্ কর্ত্তে থাকে, এবং এখানে সেখানে যখন ধূসরীভূত গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে

সুন্দর সুন্দর সৌধমালা দেখা যায়, তখন মনে হয় যে মানুষের হাত যে সব সময়ে প্রকৃতি দেবীর অঙ্গহানি কর্বেই এমন কোন কথা নেই। পাশাপাশি একদিন বম্বের কোলাবা অঞ্চলে কিন্তু ঠিক্ উল্টো মনে হয়েছিল। সেখানে এক দিকে সমুদ্র অপর দিকে ধনী বোম্বেবাসীর মনোহর হর্ম্ম্যরাজি। সন্ধ্যার ম্লান আলোকে সমুদ্রের শীতলসম্পৃক্ত মলয়ানিল যখন বড় মধুর লাগ্ছিল, তখন প্রতি মুহূর্ত্তেই বেসুরো মোটরের বেখাপ্পা হেডলাইটের অত্যধিক লোহিত চক্ষু একটু বেশি রকম খাপছাড়া ঠেকেছিল, মনে আছে।

বোম্বাইয়ে ভারতের অন্যতম সঙ্গীতরত্ন পণ্ডিত বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডের সঙ্গে পরিচয় হ'ল। উচ্চ সঙ্গীতের এরূপ একনিষ্ঠ সাধক বোধ হয় আজ সমগ্র ভারতবর্ষে আর নেই। আমাদের সঙ্গীতে এঁর দান যে কতখানি সে সম্বন্ধে পরে লিখব ব'লে আপাততঃ এইটুকু ব'লেই ক্ষান্ত হই যে এরূপ সাধক যে কোনও দেশেরই গৌরব।

বোম্বাই সহরে তারাবাইয়ের গান বেশ ভাল লাগ্ল। এমন মধুর কণ্ঠস্বর খুব কমই শোনা যায়; এবং পেশাদার গায়িকাদের মধ্যে তারাবাইয়ের চালচলন, আচার-ব্যবহারের মধ্যে একটা মার্জ্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল, যেটার ফল তার গানের ওপরেও প্রতিফলিত হয়েছিল। গান জিনিষটি যে কতখানি মানুষের ব্যক্তিত্বের ওপর নির্ভর করে, তা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। গায়কের refinement, সুরুচি, শিক্ষা ও সৌষ্টবজ্ঞান তার তানালাপের প্রতি ঝঙ্কারের ওপর প্রভাব বিস্তার না করেই পারে না। আমাদের অনেক পেশাদার গায়কের সুর-তাল-শুদ্ধ গানের মধ্যেই এই মনোজ্ঞ personality র পরশের অভাব থেকে যায় বলেই, আমরা এত বেশির ভাগ সময়েই তাদের উচ্চ সঙ্গীতের রসগ্রহণ কর্ত্তে পারি না। তারাবাইয়ের মধ্যে আমি কথাবার্ত্তায় যে সম্ভ্রমজ্ঞান ও সুরুচির পরিচয় পেয়েছিলাম, সেটা তাঁর গানকে বড় কম রসসম্পদ দান করে নি।

বম্বেতে এক দিন অপেরা হাউসে দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত সঞ্জীব রাওয়ের বাঁশি ও চিন্নস্বামী আয়ারের বেহালা শুন্‌তে গিয়েছিলাম। বেহালার কথা পরে আপোচনা কর্ব্ব—কিন্তু বাঁশের বাঁশি যে কত গুণ জানে, তা সঞ্জীব রাওয়ের বাঁশি যিনি শোনেন নি, তিনি কিছুতেই ঠিক্ বুঝ্‌তে পারবেন না। বাঁশিতে যে এত কাণ্ডকারখানা করা যায়, তা আমার ধারণা ছিল না। য়ুরোপীয়দেরও কখনও এত আশ্চর্য্য দক্ষতার সঙ্গে ফ্লুট বা ক্লারিওনেট বাজাতে শুনি নি। তবে সঞ্জীব রাও বাজালেন কর্ণাটকী অথবা দক্ষিণী সঙ্গীত। সে সঙ্গীতের মধ্যে দক্ষতার অভাব না থাক্‌লেও প্রাণের অভাব খুবই। তা ছাড়া, দক্ষিণী গানবাজনায় মিড়ের প্রয়োগ অত্যন্ত কম। কাজেই বাঁশির সুস্বর ও অসাধারণ দক্ষতা সত্ত্বেও আমাদের খুব বেশিক্ষণ তা ভাল লাগল না। সেদিন আমাদের একটি ভারি করুণ-হাস্য-রসাত্মক অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আমাদের বক্সে একটি মান্দ্রাজী ভদ্রলোক বসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আলাপ বেশ জমিয়ে নেওয়া গেল। দেখা গেল, লোকটি সঙ্গীতরসজ্ঞ—অন্ততঃ দক্ষিণী সঙ্গীতের ত বটেই। তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে আমাদের নানা বিষয় ব্যাখ্যা কর্চ্ছিলেন ও সঞ্জীব রাও যে দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বংশীবাদক, তা বার বার বলে বোঝাচ্ছিলেন। আমরা ঘণ্টা দেড়েক শুনে আর ভাল না লাগাতে, চলে আসবার উপক্রম করাতেই, তিনি আমাদের সবিস্ময়ে প্রশ্নবর্ষণ কর্ত্তে আরম্ভ কল্লেন যে, "এও কি সম্ভব? সব চেয়ে ভাল জিনিষ এখনও আসে নি; আর মাত্র ঘণ্টা দুই বই ত নয়? কেন আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের কি ভাল লাগছে না? ইত্যাদি ইত্যাদি।" লোকটির ব্যথাকুল প্রশ্নে বাস্তবিকই আমাদের শেষ পর্য্যন্ত থাক্‌তে ইচ্ছে হল; কিন্তু যখন তিনি বল্লেন, আর "মোটে" দুঘণ্টা বাজনা চল্‌বে, তখন তাঁকে আমরা বল্‌তে বাধ্য হলাম যে, আমাদের যেতে হবেই, তবে ভাল লাগছে না বলে নয়, কাজ আছে বা

তিনি কিন্তু নাছোড়বন্দ্। বল্লেন "সত্যি এখন গেলে সব মাটি, কারণ, এইবারেই শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত বাজনা আরম্ভ হবে।"

এতক্ষণ ত অশ্রেষ্ঠ সঙ্গীত বাজানো হয়নি বলাতে, তিনি বল্‌লেন যে, হাঁ মন্দ নয় বটে, তবে সবার সেরা সঙ্গীত এখনও আসেনি—এইবার আস্‌বে, আর দুঘণ্টার মধ্যেই। আমরা তাঁকে ব্যথা দিতে অনিচ্ছুক হওয়ার দরুণ সুসভ্য কপটতার আশ্রয় নিতে বাধ্য হলাম—তাঁর আগ্রহের আতিশয্যে। "কি কর্ব্ব? কাজ আছে। দুঃখিত" ইত্যাদি। ভদ্রলোক কিন্তু আমাদের এমন বাঁশি ছেড়ে যাওয়ার উপক্রমে এতই ব্যাকুল হয়ে পড়লেন যে, শেষটা এমন প্রশ্নও করে বস্‌লেন, "কি কাজ?" এরূপ সোজা প্রশ্নের সারল্যে মুগ্ধ হ'লেও তার একটা যুক্তিসঙ্গত উত্তর দেওয়ার দুরূহতা উপলব্ধি ক'রে আমি, আমার বন্ধুবর ও তাঁর স্ত্রী পরস্পরের মুখ চাওয়া চাউয়ি করতে লাগ্‌লাম। শেষে বল্‌লাম, "সে কাজ কহতব্য নয়।" বল্‌লেন, "Please don't go." আমরা একদিকে এরূপ আগ্রহে যেমন একটু বিচলিত হয়ে পড়লাম, তেমনি অপর দিকে যে বিস্মিত কৌতুকে সস্মিত হয়ে উঠেছিলাম, তা বোধ হয় সহজেই অনুমেয়। আমরা বাইরে চলে আসার পর, আমার সঙ্গী বন্ধু আমাকে করুণ মধুর হাসি হেসে বল্‌লেন, "আমরা তাড়াতাড়ি না চলে এসে আর খানিকক্ষণ তাঁকে বোঝাতে গেলে, তিনি নিশ্চয়ই আমাদের পা জড়িয়ে ধর্ত্তেন।"

মান্দ্রাজী বাদকদের বাজনা আরও বেশি মনোজ্ঞ হত, যদি তাদের মাথার প্রথমার্দ্ধ মুণ্ডিত ও পশ্চাতে উন্নত বেণী খাড়া হয়ে না থাক্‌ত, যেমন মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রায়ই থাকে। পরে মহীশূরে এ দৃশ্যে অনেকটা অভ্যস্ত হয়ে গেলেও, সেদিন মনোরম সঙ্গীতের মাঝখানে তাদের চেহারা অনেকটা ভূপালীতে কড়ি মধ্যমের মতনই বেখাপ্পা ঠেক্‌ছিল। আমার

রসিক বন্ধুটি সবিস্ময়ে বলে উঠলেন "এরা এমন ভাবে বিধাতৃদত্ত রূপকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলে কেন বল্‌তে পারেন! বিশেষতঃ যখন এদের এমন কিছু রূপসম্পদ দেখা যাচ্ছে না, যাকে নিয়ে তছনছ করা সত্ত্বেও অনেকখানি অবশেষ থাকে!" তবে আজকাল শিক্ষিত মান্দ্রাজীদের মধ্যে অনেককেই এরূপ কেশপ্রসাধনের পরিপন্থী হয়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে, এইটেই তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মস্ত বড় আশার কথা।

গান বাজনার মধ্যে দৈহিক প্রকাশেরও একটা স্থান আছে, যেটাকে সম্পূর্ণ অবহেলা করা চলে না। কারণ, সৌষ্টবজ্ঞানই এর ভিত্তি। ধরুন, যদি কোন গায়ক বিরাট কালো দাড়ির সঙ্গে মস্ত লাল নথ পরে এসে চমৎকার একটি বীণা বাজাতে সুরু করেন। এরূপ স্থলে তাঁর বীণাবাদন যতই সুন্দর হবে, তাঁর রূপের বেখাপ্পা সঙ্গতি আমাদের রসগ্রহণের ততই পরিপন্থী হয়ে দাঁড়াবে না কি? তবে তিনি যদি বীণায় কোনও **caricature** কর্ত্তে এসে থাকেন, তবে এ বেশ আমাদের সৌষ্টব জ্ঞানকে আঘাত না করার দরুণ, আমাদের হাস্যরসবোধের অনুকূলই হবে বোধ হয়। কিন্তু সঞ্জীব রাও ও আয়ার মহোদয় দুজনেই উচ্চ সঙ্গীত শোনাতেই এসেছিলেন—কৌতুক সঞ্চার কর্ত্তে নয়। কাজেই তাঁদের বেশ ও বিশেষ করে কেশ-প্রসাধন অন্ততঃ আমাদের উত্তর ভারতের শ্রোতার কাছে খুব রুচিসঙ্গত মনে হয় নি। তাছাড়া, বেহালা-বাদক মহাশয়ের মৃদঙ্গ-বাদকের দিকে রোষ-কষায়িত লোচনে তাকিয়ে মেলট্রেনের গতিতে মাথা নাড়াটাও অনেক সময়ে আমাদের সমাহিতভাবে সঙ্গীত রসভোগের বড় কম অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি। য়ুরোপের বিখ্যাত গায়ক Caruso মহাশয় তাঁর একটি বইয়ে লিখেছেন যে, গান গাইতে হয় শুধু গলা দিয়ে নয়, প্রতি অঙ্গ দিয়ে। তিনি যদি আমাদের ওস্তাদদের এ বিষয়ে তাঁর আনুগত্য দেখ্‌তে আজ কবর থেকে উঠে আস্‌তেন, তবে তাঁর বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণে

ও-উপদেশটি যে তুলে দিতেন, এমন কথা মনে করার যথেষ্ট সঙ্গত কারণ আছে ব'লেই মনে হয়।

মহারাষ্ট্রীয় থিয়েটারগুলির অভিনয় প্রায় দুঃসহ। তার ওপর এই বিংশ শতাব্দীতে স্ত্রীলোকের ভূমিকা পুরুষকে অভিনয় কর্ত্তে দেখলে, তা শান্তচিত্তে বরদাস্ত করা এক মহাত্মাজীর পক্ষেই বোধ হয় সম্ভব। তবে এদের থিয়েটারে সঙ্গীতের standard আমাদের দেশের চেয়ে উঁচু। অর্থাৎ এদের থিয়েটারী গানগুলিও একটু রাগ-ঘেঁষা ও তালশুদ্ধ। গুজরাতী থিয়েটার সঙ্গীত প্রায়ই অনেকটা চুটকী-গোছের হ'য়ে থাকে—মহারাষ্ট্রীয়দের মত রাগাত্মক নয়। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় থিয়েটারের গানগুলি রাগাত্মক হলে কি হয়, আ—আ—র উপদ্রব তাতে এত বেশি যে, একটু শুন্‌তে না শুন্‌তেই একঘেয়ে মনে হয়। এঁদের মধ্যে দুজন অভিনেতা আছেন—সিরনায়ক ও বালগন্ধর্ব্ব। এঁরা দুজনেই মহিলার ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন। প্রথমোক্ত অভিনেতা নিজেকে মহারাষ্ট্র-কোকিল নামে অভিহিত করে এক আত্মপ্রসাদই উপভোগ ক'রে থাকেন বল্‌তে হবে, যেহেতু তাঁর গানে খুব কম অভিজ্ঞ শ্রোতারই প্রসন্ন হবার কথা। দ্বিতীয় অভিনেতা কিন্তু সত্যই লোকপ্রিয়। তিনি "স্বয়ম্বর" বলে একটি অভিনয়ে রুক্মিণীর ভূমিকা নিয়ে একটি ভীমপলশ্রী গাইলেন অন্ততঃ একঘণ্টা ধরে। প্রথমটা তাঁর গান মন্দ লাগছিল না; কারণ, তাঁর গলার মধ্যে এক সময়ে যে একটা দরদ ছিল, তা তাঁর আজকালকার ভাঙা গলা হতেও যে খানিকটা বোঝা না যায় এমন নয়; কিন্তু তাঁর নিরন্তর আ—আ তানে শেষে আমাদের প্রথম অঙ্কের শেষেই প্রস্থান কর্ত্তে হ'ল; কারণ, না করে উপায় ছিল না। এঁর আ—আ রূপ মল্লযুদ্ধে কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় শ্রোতৃবর্গের পুলকের যেন পরিসীমা থাকে না, তারা প্রায় ক্ষেপে ওঠে। মহারাষ্ট্রীয়দের এরূপ গানে এতটা উৎসাহ দেখে আমি প্রথমে

ক্ষুব্ধ ভাবে উপলব্ধি কর্লাম যে, চেষ্টা কর্লে সাধারণের রুচির অবনতি সাধন করাও অসম্ভব নয়। বালগন্ধর্ব্বের গান বম্বেতে কিরূপ লোকপ্রিয়, তার একটা দৃষ্টান্ত এই যে, তাঁর গান আমার ভাল লাগেনি শুনে, বম্বের একজন লক্ষপতি এতই ক্লিষ্ট হয়ে পড়লেন যে, তিনি আমাকে, বালগন্ধর্ব্বকে ও পটবর্দ্ধন বলে আর একজন নামজাদা থিয়েটারী গায়ককে তাঁর বাড়ীতে সান্ধ্য-ভোজনের নিমন্ত্রণ করাটা কর্ত্তব্য মনে না করেই থাক্‌তে পার্‌লেন না। কারণ, তিনি বল্‌লেন, বালগন্ধর্ব্বের গান আমার ভাল করে শোনা হয় নি, নইলে ভাল না লেগেই পারত না। কিন্তু এ লক্ষপতিটির বাড়ীতেও এঁদের দুজনের নিরন্তর আ আ শুন্‌তে শুন্‌তে শরীর মন যখন অবসন্ন হয়ে পড়ল, ঠিক তখনই গৃহকর্ত্তা উৎফুল্ল নেত্রে আমাদের জিজ্ঞাসা কর্লেন, "কেমন? বলেছিলাম কি না?" উত্তরে আমার কিছু বলা উচিত ভেবে, আমি ব্যতিব্যস্ত ভাবে বল্লাম, বালগন্ধর্ব্ব মহাশয়ের চেহারার মধ্যে বেশ একটা নম্রতা আছে। সেদিন এই উত্তর দেবার সময় এক ফরাসী মহিলার গল্প মনে হ'য়েছিল। তিনি এসেছিলেন ইংলণ্ডের কোথাও এক ইংরাজ গায়কের গান শুন্‌তে। গান তাঁর মোটেই ভাল লাগেনি, কিন্তু জিজ্ঞাসিত হওয়াতে তিনি সত্যপরায়ণা অথচ সুশীলা হতে গিয়ে বলে ফেলেছিলেন যে, ইংরাজ গায়কটি বড় ভাল লোক, যেহেতু তিনি না কি তাঁর মার সঙ্গে অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করেন। সভ্যতার খাতিরে আমাদের দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে কত সময়েই না সোজা উত্তর দেওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে!

ভদ্র গুজরাতী মেয়েরা প্রায়ই বেশ সুন্দর। আমাকে বম্বেতে এক মুসলমান মহিলা বলেছিলেন যে, তিনি ত জগৎ ঘুরে এলেন, কিন্তু গুজরাতী মেয়েদের মত এমন ethereal, ফুলের নির্য্যাসে তৈরি ও কোমলতার প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপিনীদের তিনি আর কোথাও দেখেন নি। কথাটা খুব

অতিরঞ্জিত নয়। গুজরাতী মেয়েদের মধ্যে পথে ঘাটে এমন অনেককেই চোখে পড়ে, যাদের সম্বন্ধে ও বিশেষণগুলি দেওয়া যায়। পাঞ্জাবী ও কাশ্মীরি মেয়েরাও অবশ্য খুব সুন্দর, কিন্তু তাদের মধ্যে একটা জড়তাও (coarseness) আছে। কিন্তু গুজরাতী মেয়েরা এক দিকে যেমন সুশ্রী ও সুগঠনা, অন্য দিকে তেমনি জড়তালেশহীন। গুজরাতী মেয়েদের মধ্যে মারাঠী মেয়েদের মত আত্মপ্রত্যয় দেখা যায় না, কিন্তু মধুরতা খুবই বেশি। তবে এরা পর্দ্দা না মান্‌লেও সহজে বাইরের লোকের সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে আসে না। খাবার সময়ে পুরুষরা একদিকে বসে ও মেয়েরা অন্যদিকে বসেন। সবতাতেই এরা যেন একটা ব্যবধান রাখ্‌বার পক্ষপাতী। শুধু বিদেশী পুরুষদের নয়, স্বজাতীয় পুরুষদের সঙ্গেও এরা "শতহস্তেন" রূপ শাস্ত্রবাক্যটি মেনে চল্‌তে যেন অনিচ্ছুক নয়।

কিন্তু কি দক্ষিণী, কি মারাঠী, কি গুজরাতী এ সব জাতীয় স্ত্রীলোকই এক বিষয়ে বাঙালী মেয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ; সেটা হচ্ছে আত্মনির্ভরতা। পথে ঘাটে একলা নির্ভীক ভাবে এ সব জাতির শিক্ষিত অশিক্ষিত মেয়েদের বিচরণ আমার বড় ভাল লাগ্‌ত—অবগুণ্ঠনের অত্যাচার নেই, শত পুরুষের দৃষ্টিতেও কুণ্ঠার লেশ নেই সহজ সরল নির্ভীক ভাব। বাংলা দেশের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে যে আবরু ও সঙ্কোচকে বাংলার গোঁড়াগণ ভারতীয় নারীর বৈশিষ্ট্য ব'লে অনেক সময় প্রচার ক'রে থাকেন তার সত্যতা যে কত সীমাবদ্ধ ও কতখানি ভিত্তিহীন তা জান্‌তে হলে, তাঁদের শুধু একবার মাত্র বোম্বাই গুজরাত বা দাক্ষিণাত্যে যাওয়া দরকার।

গুজরাতী মেয়েদের মধ্যে একপ্রকার লোক-সঙ্গীত (folk music) আছে, যাকে এরা বলে "গরবা।" "গরবা" শুধু যে চিত্তাকর্ষক তাই নয়, "গরবা"র মধ্যে সৌন্দর্য্যও বড় কম নেই। চিত্তাকর্ষক এই জন্য যে, শিক্ষিত সমাজেও লোক-সঙ্গীতের উপাদান জীবন্ত থাকা সম্ভব, এই সত্যটি গরবার

সুরে দেখা যায়; ও সুন্দর এইজন্য যে, এ মিলিত গানের মধ্যে অনেক সুন্দর সুন্দর সুর ও তালফের পাওয়া যায়। এ লোক-সঙ্গীতের tradition অনেকদিন থেকে চলে আস্‌ছে। তবে আনন্দের বিষয় এই যে, এর মধ্যে জীবন্ত রস আছে, কারণ বর্ত্তমান সময়েও গরবায় নতুন নতুন গান রচনা হয় ও স্ত্রীলোকদের দ্বারা গীত হয়। এ গানের মধ্যে খানিকটা নৃত্যের গতিও আছে—যে জন্য এ সুন্দর সঙ্গীত আরও ভাল না লেগেই পারে না। দশবারজন স্ত্রীলোক চক্রাকারে তালে তালে করতাল দিয়ে, পরিক্রমণ কর্ত্তে থাকেন। একজন সুরু করেন বাকী সব আমাদের কীর্ত্তনের দোয়ারদের মত তাঁকে অনুসরণ করেন। শ্রোতার ও দর্শকের মনের ওপর এই গতিশীল সঙ্গীতের artistic প্রভাবের কোনও যথার্থ ধারণা লিখে সম্যক্ বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তাই এর ফল কল্পনা কর্ত্তে ছেড়ে দেওয়াই ভাল। তবে একটা জিনিষ দেখে বড় আনন্দ হয় যে, শত লোক-চক্ষুর সাম্‌নেও লজ্জাশীলা গুজরাতী রমণী এইরূপ নৃত্যভঙ্গীতে গান গেয়ে যেতে সঙ্কুচিত হন না। বিধাতা তাদের গলায় যে সুর দিয়েছেন সে সুর সভ্য সমাজে শোনাতে হ'লে তারা আমাদের মেয়ের মত লজ্জায় বিবর্ণ হয়ে যায় না। অবশ্য এখানে বলে রাখা উচিত যে, সঙ্গীতে সহজ স্ফূর্ত্তিরূপ বিধাতার এই মনোজ্ঞ প্রেরণায় সাড়া দিতে লজ্জা পাওয়া যে বৌ-মানুষের অবশ্য কর্ত্তব্য, এ মনোভাবের জন্য দায়ী আমাদের মেয়েরা নন, দায়ী তাঁদের হর্ত্তাকর্ত্তা-বিধাতারা। গুজরাতী হর্ত্তাকর্ত্তা-বিধাতাগণ এতে আপত্তি করেন না, কাজেই তাঁদের বাড়ীর-মধ্যেরাও বাইরে এসে সহজতা ও সরলতাকে পূর্ণ স্ফূর্ত্তি দেওয়াটা বিসদৃশ মনে করেন না।

এক দিন কোনও এক সুন্দর বাগানে গোধূলির ম্লানিমায় এক ফুলের কেয়ারীর চারধারে অনেকগুলি সুন্দরী সুবেশা গুজরাতী মেয়ে আপনা হতেই তাদের সহজ স্ফূর্ত্তিতে অবিশ্রান্ত গরবা গেয়ে চলেছিল। পঞ্চমীর

চাঁদও সেদিন হেসেছিল, মলয় পবনও তার উদাস সৌরভ ছড়াতে আরম্ভ করেছিল। তার ওপর তাদের প্রধানা গায়িকা ওস্তাদ রেখে গান শেখার দরুণ তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল নির্ভীক ও সুর ছিল নির্ভুল। কাজেই সব জড়িয়ে এই গরবায় যে পরম তৃপ্তি সেদিন আমি পেয়েছিলাম, অনেক উচ্চ অঙ্গের গানেও সে আনন্দ পাই নি। গানের আনন্দ দানের ক্ষমতা শুধু কৃতিত্বের ওপরই নির্ভর করে না, করে নানান জিনিষের ওপর, যার মধ্যে সৃষ্টির ক্ষমতা, সহজ উচ্ছ্বাস, প্রকাশের চারুতা প্রভৃতি সবেরই যথাযথ স্থান আছে। মেয়েরা একযোগে গান কর্‌লে তা শুন্‌তে কত সুন্দর লাগে, ভাব্‌তে ভাব্‌তে আমার কেবলই এই কথা মনে হ'চ্ছিল যে, আমাদের সোণার বাংলার মেয়েরা একযোগে শুধু উলুধ্বনি ছাড়া অন্য কোনও রূপ সঙ্গীত বিদ্যায়ই বিশেষ অত্যদ্ভুত পারদর্শিতা দেখাতে পারেন নি—এ সমস্যাটি নিয়ে মনস্তত্ত্ববিৎরা গবেষণা করেন না কেন? এ প্রশ্নে হয় ত বাঙালী পুরুষ ব'লে বস্‌বেন "রক্ষা করুন! আমাদের সনাতন উলু ও শঙ্খ ধ্বনিতেই রক্ষে নেই, আবার গান!" কিন্তু রমণীজাতি যদি তাঁদের স্বভাবকোমল কণ্ঠে একত্রে গান করেন, তবে তা যে কত মনোহর হয়, তা য়ুরোপীয় বা গুজরাতী মেয়েদের একত্র গান শুন্‌লে উপলব্ধি করতে দেরি হয় না।

দক্ষিণে এবার যে বীণা শোনা গিয়েছিল, জানি না, সেরূপ বীণা আর কখনও শোনা ঘটে উঠ্‌বে কি না। ইনি মহীশূরের রাজার সভাবীণকার—নাম শেষণ। দাক্ষিণাত্যে ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীণকার বলে খ্যাত; এবং পরে আরও শোনা গিয়েছিল যে ইনি শুধু যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীণকার তাই নয়, এঁর ভঙ্গীতে না কি অন্য কেউই বাজায় না বা বাজাতে পারে না। কাজেই এঁকে আমি আজ দাক্ষিণাত্যের বীণাবাদকদের মুখপাত্র বা শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হিসেবেও আমাদের বাংলা দেশে পরিচিত কর্ত্তে চাই না,

একজন সহজ গুণী হিসেবেই পরিচিত কর্ত্তে চাই। এত বড় সত্যকার আর্টিষ্ট বাজিয়ে আমি আজ অবধি কখনও শুনি নি। উচ্চশ্রেণীর অথচ মধুর গান বাজনা আমাদের দেশে বড় বেশি শোনা যায় না, তার খুব সোজা কারণ এই যে, আমাদের দেশের খুব কম ওস্তাদই সঙ্গীতের আসল মর্ম্মস্থলের খবর রাখেন। গত পাঁচ ছয় মাস ধরে ভারতবর্ষের নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক স্থানের ছোট বড় ওস্তাদের গান খুঁজে খুঁজে শুনে, এ সত্যটি আমি আরও বেশি করে উপলব্ধি করেছি, এ কথা বোধ হয় আজ বল্‌তে পারি। আমাদের গান বাজনার যিনি ভক্ত, তিনিই জানেন যে, এ জঙ্গলের অফুরন্ত পথের মধ্যে গোলাপের বাগান কত কম মেলে। বিশেষতঃ আজকাল আমাদের ভারতবর্ষে সত্যকার উচ্চশ্রেণীর অথচ প্রাণময় গান বাজনা অত্যন্ত বিরল হয়ে উঠেছে। কত সময় যে এই পরখ কর্ত্তে গিয়ে নষ্ট কর্ত্তেই হয়—তা আবার একেবারে নিছক নষ্ট—তা যাঁর মাথায় সঙ্গীতের অনুরাগ রূপ বেয়াড়া কীট একবার প্রবেশ করেছে তিনিই জানেন। শতকরা প্রায় নব্বইটা সঙ্গীতের আসরেই মন অতৃপ্ত অবস্থাতেই ফিরতে বাধ্য হয়—কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি কোথাও পরশ পাথর মেলে, এই আশায় ক্ষেপাকে কত পাথরই না কোমরের লোহাতে ঠেকাতে হয়! কিন্তু যখন এ পরশ পাথর একবার মেলে, যখন শেষণ একবার উদয় হয়, তখন শত নিরাশা অতৃপ্তির সঞ্চিত কুয়াশাও কেটে যেতে মুহূর্ত্তের বেশি দেরি হয় না। শেষণের একটিমাত্র প্রথম ঝঙ্কারেই বোঝা গিয়েছিল যে, হাঁ এই বটে, একেই বলে সঙ্গীত। দুঃখের বিষয় এই যে, এরূপ সঙ্গীত এত বিরল যে, বেশির ভাগ সঙ্গীতানুরাগীই এতে বঞ্চিত থাকৃতে বাধ্য হন, কারণ তাঁরা শোনার সুযোগ পান না। মনে আছে, আমরা দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা শেষণের বীণাবাদন শুনেছি, কিন্তু মন বলেছে আরও শুনি।

শেষণের বাজানোর মধ্যে এক দিকে যেমন ভাব উপছে পড়তে থাকে, অপর দিকে তেম্‌নি মনে হয় যে, তাঁকে যেন তাঁর অপূর্ব্ব বাজনাতে কোনও চেষ্টা কর্ত্তে হয় না—যেন এ জিনিষটা তাঁর কাছে কতই সহজ! কত বাজিয়ের গানবাজনা শুনেছি···কিন্তু খুব কম গুণীকেই আজ অবধি এত অবলীলাক্রমে গাইতে বা বাজাতে শুনেছি। য়ুরোপে শুনেছিলাম জগদ্বিখ্যাত Kreisler, Mischa Elman ও Vescheyর বেহালা। কিন্তু ভারতে শেষণ techniqueএ, মৌলিকতায় বা রসসম্পদে এদের কারুর চেয়েই কম নয়। শেষণের বীণা শুনে বুঝতে পারা গেল যে, বেহালার চেয়ে মধুর যন্ত্রও তৈরি করা সম্ভব। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির কীর্ত্তির কথা মনে হয়ে মন গর্ব্বে ও উল্লাসে ভরে না উঠেই পারে না। একটা কাঠের ওপর ধাতুর তার যে মানুষের অন্তরের অন্তরতম জিনিষটিকে নিয়ে ইচ্ছামত ভাঙাগড়া খেল্‌তে পারে—সৃষ্টির এ রহস্যের সমাধান কে করবে জানি না, কিন্তু সঙ্গীতপ্রেমিক এটুকু জানে যে, জড় বস্তু মোটেই জড় নয়, তার মন্দিরের প্রতিমায় প্রাণ আছে—যার প্রতিষ্ঠা সম্ভব কেবল এক শেষণের মতন শিল্পী-পুরোহিতে।

শেষণের techniqueএর বিস্তর তারিফ করা যেতে পারে; তার বৈচিত্র্যের সুখ্যাতি করে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ভরিয়ে দিতে পারা যায়। বাজনার সময় এ অন্ধপ্রায় গুণীর চোখ মুখের অপূর্ব্ব ভাবাভিব্যক্তি সম্বন্ধে অগণ্য উপমা দিতে পারা যায়; কিন্তু পারা যায় না কেবল—তাঁর সুরের আলোর আভাষও কথার আড়ম্বরে প্রকাশ করা। তবে এত কথা বলা এই জন্য যে, শেষণ এখনও জীবিত, তাই যদি কেউ মহীশূর অঞ্চলে যান, তবে যেন এঁর বাজনা শুন্‌তে ভুলে না যান।

শেষণ লোকটিও বড় ভাল—সত্যকার গুণীর মতনই নম্র, ও বল্‌লেই বাজান। সবচেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, শেষণ সহজ সরল গান বড় কম

ভালবাসেন না। এক ওস্তাদের পক্ষে যে নিজের ও নিজের গুরু ছাড়া অপর কারুর প্রশংসা করা কতটা অভাবনীয় ব্যাপার, তা এ সম্প্রদায়ের সঙ্গে নিকট সংস্পর্শে আসার দুর্ভাগ্য যাঁরই হয়েছে তিনিই জানেন। কাজেই শেষণের যে-কোনও অপেক্ষাকৃত কম-ওস্তাদী সঙ্গীতেও রসবোধ করা আমার কাছে একদিকে যেমন বিস্ময়কর মনে হয়েছিল, অন্যদিকে তেম্নি তৃপ্তিদায়ক লেগেছিল। এর কারণ এই যে শেষণ লোকটি শুধু যে অসাধারণ আর্টিষ্ট তাই নয়, আমাদের দেশের সাধারণ গাইয়ে বাজিয়ের ক্ষুদ্র ঈর্ষাময় দ্বন্দ্ব কলহে আনন্দ পাবার মত মনও গড়ে তোলেন নি।

শেষণের বীণার মধ্যে অনেক সময় য়ুরোপীয় সুরের বা চালের একটু আমেজ আসে—অবশ্য তাই বলে বেপর্দ্দায় তাঁর হাত পড়ে না। এরূপ মৌলিকতায় শেষণের প্রতি ওস্তাদের সন্তুষ্ট হবার কথা নয়, কাজেই দক্ষিণের একজন গোঁড়া সমালোচক আমাকে বলেছিলেন, "শেষণ আর্টিষ্ট হতে পারেন, কিন্তু ওস্তাদ নন।" আমি মনে মনে মস্ত তৃপ্তির দীর্ঘনিশ্বাস নিয়ে বলেছিলাম "তথাস্তু! আমার কাঠের বিড়াল যদি ইঁদুর ধর্ত্তে পারে, তবে বেঁচে থাক্ আমার কাঠের বিড়াল।" ওস্তাদী না করে যদি সঙ্গীতে শ্রেষ্ঠ আনন্দ পাওয়া যায়, তবে ওস্তাদীর অভাবে কেউই খিন্ন হয়ে পড়বে না। কিন্তু শেষণ ওস্তাদ নন এটাও সত্য কথা নয়। রাগের জ্ঞানও শেষণের যথেষ্ট—আমি পরে একজন নিরপেক্ষ শিক্ষিত সমজদারের কাছে শুন্লাম। তবে রাগকে নিয়ে মল্লযুদ্ধ করায় শেষণ বিশ্বাস করেন না, রাগকে নিয়ে খেলা করা, আদর করা, তাকে অভিনব ভাবে মূর্ত্ত করে তোলা এই সবেই শেষণের সৃষ্টিপ্রিয় মনের প্রায় সব উৎসাহ ব্যয়িত হয়। যিনি সঙ্গীতে Gymnastics চান, তাঁর শেষণের গান ভাল লাগার সম্ভাবনা কম, কিন্তু গানের মধ্যে দরদ যাঁর কাছে মূল্যবান্, মিষ্টত্বে যিনি উদাসীন নন, ও সুরের মোচড়ের দাম যিনি জানেন, শেষণের মূল্য তিনিই

বুঝবেন। তাছাড়া, শেষণ তাঁর বাজনার মাঝে মাঝে য়ুরোপীয় chord বা phraseএর মশলা দিতে কুণ্ঠিত হন না ব'লে তার মধ্যে এক অপূর্ব্ব মধুরত্বের আমদানী হয়। ম্লেচ্ছ সঙ্গীতের সর্ব্বপ্রকার আমেজই আমাদের পবিত্র হিন্দু সঙ্গীতে বর্জ্জনীয়, এ কথা অনেকে মনে করে থাকেন। মনে করার সঙ্গত কারণ যে কিছুই নেই তা-ও নয়। তবু আমার বরাবরই মনে হয়েছে যে, সঙ্গীত সম্বন্ধে এতটা শুচিবাই হয়ত প্রশস্য নয়। প্রকৃত শিল্পী যদি য়ুরোপীয় কোনও সুর "নিজস্ব" ক'রে নিতে পারেন, তবে তাঁর দ্বারা সঙ্গীতের নতুন সৃষ্টির সহায়তাই হবে। এ সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করার ইচ্ছে রইল, তাই এখানে কেবল এইটুকু বলে রাখি যে শেষণের মাঝে মাঝে য়ুরোপীয় সুরের মশ্‌লা ব্যবহার করাটা তাঁর বাজনার মধ্যে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দান করে।

দক্ষিণে এবার বাঙ্গালোর, মহীশূর, মান্দ্রাজ ও পণ্ডিচেরীতে কিছুদিন করে ছিলাম। এ কয়টি সহরই বেশ ভাল লেগেছিল। তবে মহীশূর সহর সব চেয়ে দ্রষ্টব্য, এ বিষয়ে বোধ হয় দু'মত হবার সম্ভাবনা নেই। হিমালয়ে ছাড়া ভারতের সমতলভূমিতে কোনও সহর আমি দেখিনি, যা প্রাকৃতিক দৃশ্যে ও নগর নির্ম্মাণ কৌশলে মহীশূরের সমকক্ষ।

প্রথমতঃ মহীশূর সহরে চামুণ্ডার পাহাড় তাকে এক অপূর্ব্ব শোভা দান ক'রেছে। দ্বিতীয়তঃ সহরটি এমন সুন্দর ভাবে নির্ম্মিত যে নির্ম্মাণ-কর্ত্তার রুচিকৌশলের তারিফ না করেই পারা যায় না। রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সৌধশ্রেণী সুদর্শন, তার উপর রাস্তায় চমৎকার designএর বিজলী বাতি রাত্রে সহরটিকে এক অপূর্ব্ব শোভা দান করে। তাছাড়া মহীশূর সহরের নির্ম্মাণ কৌশলের মধ্যে আধুনিকতার প্রভাব খুবই বেশি হলেও—তার মধ্যেও একটা ভারতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখ্‌বার চেষ্টা চোখে পড়ে। এরূপ চেষ্টা শুধু বৈচিত্র্যের জন্য নয়, তার সুষ্ঠুতার

জন্যও আমাদের মনকে তৃপ্ত না করেই পারে না। আমাদের অনেক বড় সহরই আজকাল অত্যন্ত কুৎসিত, কারণ তাতে বড় বড় আফিসখানা, দফতরখানা ও মালগুদামখানা আমাদের আপত্তি বা সৌন্দর্য্য বোধের অপেক্ষা না রেখেই আধুনিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ও শাসন-কাজের চাপেই গড়ে উঠেছে। কাজেই তাতে টাকা খরচের ত্রুটি না হলেও, জীবনে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির সহায়তা যে বিশেষ হয় নি এ কথা বলাই বেশি, যেহেতু প্রয়োজনের চাপে যা গড়ে ওঠে—সৌন্দর্য্য, রুচি প্রভৃতি বাহুল্যের অপেক্ষা রাখার সময় তার থাক্‌তেই পারে না। মহীশূর সহরটি কিন্তু এরূপ প্রয়োজনের চাপে গড়ে ওঠে নি। এর মধ্যে রাজার আড়ম্বরপ্রিয়তা বা স্ব-নাম প্রচারের স্পৃহা হয়ত কিছু ছিল, কিন্তু এর মধ্যে একটা স্বাভাবিক সুরুচিও যে তার রস দান করেছে, তাতে কারুরই কোনও সন্দেহ হয় না। মনটা এক মুহূর্ত্তে বলে, যাই হোক্ তবু একটা কাজ হয়েছে।

নরওয়ে ও সুইজর্লণ্ড দেখে আমাদের যা মনে হয়েছিল, মহীশূর সহর দেখে সেই কথাই আবার মনে হ'ল যে, আধুনিকতা-মাত্রই কিছু মন্দ নয়। আসল জিনিষটি হচ্ছে সুরুচি। সুরুচি দিয়ে গড়্‌লে আধুনিক নানান্ নূতন ক্ষমতা আমাদের জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সৌন্দর্য্যও দিতে পারে। যেমন বিজলী বাতি বা পরিষ্কার প্রশস্ত রাস্তা-ঘাট। আধুনিকতার এ দুই দান স্বাচ্ছন্দ্য ও সৌন্দর্য্যের যে একটা সুন্দর সামঞ্জস্য সাধন করেছে এ বিষয়ে আশা করি মতভেদ হবে না। যে দুটি দেশের কথা ওপরে উল্লেখ করেছি, সে দুটি দেশে বিজলী বাতির প্রাদুর্ভাব খুবই বেশি ও তাতে রাস্তাঘাট রাত্রে যে কত সুন্দর দেখায় তা যিনিই সেখানে গিয়েছেন তিনিই জানেন। অবশ্য প্রকৃতি দেবীর স্বাভাবিক শোভার কথা কেউ-ই অস্বীকার কর্চ্ছে না, তবু স্বাচ্ছন্দ্যও যখন মন্দ জিনিষ নয়, তখন মানুষের আধুনিক ক্ষমতার সাহায্য নেওয়ায় ক্ষতি কি ?

চামুণ্ডা পাহাড়টিতে মোটরের জন্য সুন্দর রাস্তা ঘুরে ঘুরে উঠেছে। দুধারে শ্রেণীবদ্ধ বিজলী বাতি। যতই উঠা যায়, পায়ের তলায় নানান্ ক্ষেত ও বাগান নানারঙের গালিচার মতই মনে হয়।

চামুণ্ডা পাহাড়ের উপর থেকে মহীশূর সহর বড় সুন্দর দেখায়। বিশেষতঃ সন্ধ্যার সময়ে। কারণ, তখন সমস্ত নগরময় বিজলীবাতী জ্বলে ওঠে; ও চারিধারে গাছের পাতার মধ্যে দিয়ে যখন সে আলো ঝিক্‌মিক্ ঝিক্‌মিক্ কর্ত্তে থাকে, তখন মনে বাস্তবিকই ভারি আনন্দ হয়। সহর থেকেও রাত্রে চামুণ্ডা পাহাড়ের ধারে ধারে দীপালিশ্রেণী ভারি মনোহর দেখায়।

চামুণ্ডা পাহাড় নাম হয়েছে তার উপর চামুণ্ডাদেবীর এক মন্দির আছে বলে। এ মন্দিরের কারুকার্য্য মধ্যযুগের অনেক মন্দিরের কারুকার্য্যের মতনই (যেমন গোয়ালিয়রে সহস্রবাহু মন্দিরের) অত্যন্ত অসুন্দর ও যাকে গ্রাম্য ভাষায় বলে "জবড়জং"। পাথরের গায়ে অজস্র ছোট বড় খোদাইয়ের কাজ অবশ্য খুবই বিস্ময়কর রকমের কঠিন কাজ; কিন্তু যা-ই কঠিন, তাই ত সুন্দর নয়। দক্ষিণের শ্রেষ্ঠ মন্দিরগুলি দেখবার এবার সময় পাইনি, তাই তার শিল্প সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে চাই না, তবে পথে ঘাটে যা চোখে পড়েছে তার প্রকৃতির বিশেষ ভেদ দেখিনি। সেই একই রকমের অসাধারণ ধৈর্য্যের ও যত্নের স্তম্ভ হিসেবে ছাড়া এ সব মন্দিরকে আর কোনও হিসেবে বিশেষ প্রশংসা করা যায় না। তখনকার দিনে বোধ হয় সরলতার মধ্যে যে মস্ত আর্ট থাক্‌তে পারে এ ধারণা লোকের ছিল না, অন্ততঃ অনেকের যে ছিল না এটা বোধ হয় ঠিক্। তাছাড়া, এ সব মন্দিরেরই ভেতরটা এত অন্ধকার যে দিনেও তাতে সূর্য্যদেব বড় আমল পান না।

পক্ষান্তরে দিল্লীর ও আগ্রার জুমা ও মতি মস্‌জিদ, সেকেন্দ্রা,

তাজমহল ও ফতেপুর সিক্রির স্থাপত্যের কথা মনে হ'ল। উপাসনা-স্থলে আলোর সঙ্গে বন্ধুত্ব করা মুসলমানের মৌলিকতা। আমরা উপাসনা কর্ত্তে পারি এক বনে, না হয় গুহায়, না হয় মন্দিরে অর্থাৎ অন্ধকারে। মুসলমানরা করে খোলা হাওয়ার মধ্যে। অন্য শিল্পীর কথা জানি না, কিন্তু স্থাপত্য ও সঙ্গীত-শিল্পে যে মুসলমান জাতি আমাদের অনেকখানি সম্পৎ বাড়িয়ে দিয়েছে, এ কথা বোধ হয় অকাট্য। মুসলমান রেনেসাঁসের (Renaissance) স্থাপত্য-কীর্ত্তি যেমন ভারতের গৌরব, মুসলমান রেনেসাঁসের সঙ্গীতোৎকর্ষও ভারতের তেম্‌নি মস্ত লাভ। এ কয় মাস ভ্রমণে এ সত্য দুটি বড় বেশি করেই আমার চোখে পড়েছিল।

দিল্লীতে এবার কংগ্রেসের পাল্লায় পড়ে প্রাণটা যে কি রকম হাঁপিয়ে উঠেছিল, তা জানেন এক অন্তর্যামী। কংগ্রেসে বক্তৃতাদি দু'চার দিন শুনেই, দেশোদ্ধারটা যে শক্ত কাজ, সে বিষয়ে সংশয় ঘুচে গেছিল। তাছাড়া, মনে হয়েছিল যে, সংসারে অতিমানুষ যদি কেউ থাকেন তবে, তাঁরা হচ্ছেন, যাঁরা কংগ্রেসের পালা শেষ করে আবার Subjects Committeeর (বিষয়নির্ব্বাচনী সমিতি) পালা পুরোদমে চালাতে পারেন। সে যাই হোক্, এ অতিমানুষের সমস্যা ছেড়ে দিলেও, এ কংগ্রেসে আমাদের অনেকেরই শ্রদ্ধেয় চিত্তরঞ্জনের ওপর বড় ভক্তি হয়েছিল।

দিল্লীতে দাশ মহাশয়কে সমস্ত দিন কংগ্রেসের সভার কষ্টভোগের পর কংগ্রেস-প্রতিনিধিদের সঙ্গে সেই মোটা চাল ও ডাল খেতে দেখে

মনে যুগপৎ দুঃখ ও আনন্দ হ'ত। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর আমাদের তাঁর জন্য একটু ভাল আহার্য্যের বন্দোবস্ত করা উচিত ছিল, এই ভেবে কষ্টও হ'ত। কিন্তু সব চেয়ে আনন্দ হ'ত যখন তাঁকে অম্লানবদনে এত কষ্ট স্বীকার কর্ত্তে দেখ্‌তাম। মনে আছে সে দিন চোখের সামনের সেই দৃশ্য দেখে মনটা আমাদের বড়ই বিচলিত হয়ে পড়েছিল। খাঁটি ত্যাগ—অর্থাৎ জোর করে ত্যাগ নয়, আপনা-থেকেই আসে এমন ত্যাগ—যে একটা কত বড় মহিমময় জিনিষ সেটা যেন সেদিন বেশি করেই উপলব্ধি করেছিলাম। বাইরে থেকে দেখতে এসব ঘটনা খুবই ছোট মনে হ'লেও, বস্তুতঃ এ সব ছোটখাট ঘটনার প্রভাব অনেক সময়ে আমাদের ব্যক্তিগত মনের ওপর হঠাৎ খুবই বেশি হয়ে ওঠে, যদিও তার কারণ সব সময়ে খুব সুবোধ্য নয়। নিবেদিতা একবার বড় সত্যি কথাই লিখেছিলেন যে "Some of our deepest convictions spring from data which convince none but ourselves."

দিল্লীতে অত্যধিক গান করে ভগ্নপ্রায় গলা নিয়ে, ও সেই বিপর্য্যয় ভিড়ের মধ্যে দিশেহারা হয়ে, যখন কোথাও কূলকিনারা পাচ্ছিলাম না, তখন দেখি আমাদের শ্রদ্ধেয় ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বেশ একটি নির্জ্জন স্থানে বসে তাম্রকূটসেবন করতঃ কংগ্রেসের প্রতিনিধির যাবতীয় দুরূহ কর্ত্তব্য একাগ্রচিত্তে সাধন কর্চ্ছেন। তাঁর অত শান্তিতে বাস করা সাধারণ কংগ্রেসওয়ালার চেয়ে নিশ্চয়ই অনেক বেশি দরকার ছিল; কারণ তিনি শুধু কংগ্রেস-প্রতিনিধি ছিলেন না, নিখিল-ভারত কংগ্রেস-কমিটির সভ্যও ছিলেন। তবে অত নির্জ্জন স্থলেও অপ্রতিহত-প্রভাবে তাম্রকূট সেবনে ব্যাঘাত হওয়ার দরুণ বোধ হয় তাঁর কংগ্রেসর দুঃসাধ্য কর্ত্তব্য সাধনের কাজ সুচারু-রূপে সম্পন্ন হওয়া মুস্কিল হয়ে পড়েছিল। কেন না, তিনি আমাকে বল্‌লেন যে, বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ

সেবাশ্রমে তত্রস্থ সন্ন্যাসীদের দ্বারা আধ্যাত্মিক ভাবে সেবিত না হ'লে, এ সব গুরুতর কাজ সুসম্পন্ন হবার নয়। আধ্যাত্মিক বিষয়ে হিন্দুর মতভেদ হয় না। সুতরাং তার পর-দিনই আমরা সেই তীর্থ অভিমুখে যাত্রা কর্লাম।

দিল্লীর কুতবমিনারে চ'ড়ে খুব বেশি আত্মপ্রসাদ লাভ না ক'র্লেও, তার দেওয়ানী খাস, দেওয়ানী আম প্রভৃতি মোগলকীর্ত্তি বড় ভাল লেগেছিল। বন্ধুবর সুভাষ আমায় সহর্ষ পুলকে বলে উঠ্লেন যে, হিন্দু-মুসলমানের মিলন সাধন কর্ত্তে হলে, মুসলমান-বিদ্বেষীদের একবার মাত্র দিল্লী-আগ্রাতে এই সব মুসলমান-কীর্ত্তি দেখালেই, তাদের মনে বিদ্বেষকে প্রেমে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। কথাটা হয় ত নিতান্ত ভুল নয়। বাস্তবিক ললিত-কলার সৌন্দর্য্যের বিশ্বজনীন আবেদনের ক্ষেত্রে এ মিলন-সাধন যেমন সহজসাধ্য ও সত্য হয়ে ওঠে, তেমন বোধ হয় আর কিছুতেই হয় না। অন্ততঃ আমি নিজের দিক্ দিয়ে বল্‌তে পারি যে, মুসলমানদের ওপর আমার শ্রদ্ধার অনেকখানির মূলই হিন্দু-সঙ্গীতে অপিচ স্থাপত্য-শিল্পে তাদের দানের জন্য কৃতজ্ঞতা। দিল্লী, আগ্রা, ফতেপুর-সিক্রি প্রভৃতি সহরে গেলে এ শ্রদ্ধা আরও দৃঢ়ভিত্তি হয়।

কিন্তু দিল্লীতে গান-বাজনা এবার শোনা গেল না মোটেই। অনেক খোঁজ-খবর নিয়ে জানা গেল, সেখানে একজন গায়ক আছেন পিয়ারে খাঁ; কিন্তু তিনিও খুব বড় গায়ক নন। আমার এক গুজরাতী বন্ধু আমাকে দিল্লীর শ্রেষ্ঠ গায়ক-গায়িকার গান শোনাবেন বলে নিয়ে গেলেন এক দিন এমন এক অদ্ভুত গাইয়ের কাছে, যাঁর উচ্চসঙ্গীতের একমাত্র কৃতিত্বের প্রমাণ তাঁর বিরাট গোঁফজোড়া। নিরাশ হয়ে সুভাষকে বল্‌লাম, "কই সুভাষ, আমাকে দিল্লীতে যে বড় বড় গাইয়ের গান শোনাবে বলে ভরসা দিয়ে এই সাত সমুদ্র তের নদী পথ টেনে নিয়ে এলে, এখন কোথায়

তোমার সে প্রতিজ্ঞা-পালন ?"—কিন্তু সে কথা আর তখন কে শোনে ? সুভাষ তখন দেশোদ্ধারে এতই ব্যস্ত যে তার নিঃশ্বাস ফেল্‌বারও অবকাশ ছিল না। কাজেই দিল্লী পরিত্যাগ কর্‌তে কোনও কষ্টই হোল না—বিশেষতঃ শরৎবাবুর মত সজ্জনের সঙ্গে। তা ছাড়া, সে ভিড়ের হাত হতে নিষ্কৃতি পেয়ে মধু-বৃন্দাবন দেখব, এ কথা ভেবে মনটা এক বিমল খুসিতে ভ'রে উঠ্‌ল।

দিল্লীতে একজন মাত্র ভাল গায়ক আছেন। নাম মজঃফর খাঁ। গলাটি মন্দ নয়, গানের ঢংটি বেশ। তবে মুগ্ধকরী ক্ষমতা কিছুই নেই। বাইদের মধ্যে একজন আছেন মন্দ নন নাম চন্দ্রাবলী। মালকোষ ইনি বেশ গান।

দিল্লীতে একমাত্র স্বস্তি ছিল—কংগ্রেস-মণ্ডপ থেকে কোনও মতে অব্যাহতি পাওয়ার মধ্যে। যখন সেখান থেকে পালিয়ে বন্ধুবর বি— মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মোটরে করে শরৎবাবুকে নিয়ে দিল্লী সহর চক্র দিতাম, ও একত্রে নানারূপ "গাল-গল্প" করতাম, কেবল তখনই আমাদের আড্ডাপ্রিয় বাঙালী মনটা খানিকটা সুস্থ হ'ত। বিদেশে বাঙ্গালীর সাহচর্য্য আমাদের একটু বেশি ভাল না লেগেই পারে না—বিশেষতঃ যদি কংগ্রেসের নেতাদের অসার বক্তৃতা কিছু দিন ধরে রুদ্ধশ্বাসে শুন্‌তে বাধ্য হ'তে হয়।

বি—ভারী রসিক লোক ছিলেন। তিনি আমেরিকান মহিলাদের কেমন করে হিন্দু-মহিমা সম্বন্ধে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিয়ে স্তম্ভিত করে দিতেন, সে সব কথা বেশ কৌতুকপ্রদ ভাবে বল্‌তেন। সেই প্রবীণ গম্ভীর কংগ্রেস-নেতাদের গভীর যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতার চেয়ে বি—র বক্তৃতা কোনও অংশেই কম কৌতুকপ্রদ ছিল না, এ কথা আমি শপথ করে বল্‌তে পারি।

বৃন্দাবনেও বি—তাঁর মোটরযান নিয়ে হাজির হওয়াতে, আমরা একত্রে

অর্থাৎ আমি, তিনি, শরৎবাবু ও স্বামী বেদানন্দ (বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ)—গিরি গোবর্দ্ধন দেখতে গেলাম।

গিরি গোবর্দ্ধন দেখে বিশ্বাসই হ'ল না যে, সেটা একটা গিরি। একটা পুকুরের মধ্যে খানকতক বড় বড় পাথর। তবে পাণ্ডারা যখন শপথ করে বল্‌ল যে, হাঁ, সেইটেই গিরি গোবর্দ্ধন, তখন বিশ্বাস কর্‌তেই হ'ল। এবং তখন এক মুহূর্ত্তেই বুঝেছিলাম যে, কেমন করে বংশীধারী গোবর্দ্ধন-ধারণরূপ অসাধ্য সাধন করেছিলেন।

বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমে শরৎবাবুর সঙ্গে তিন দিন তিন-রাত্রি অজস্র গল্পালাপের মধ্যে কাটানো গিয়েছিল। তার ওপর সে শান্তরসাস্পদ আশ্রমে প্রশান্ত ভাবে অতিথি-সৎকার গ্রহণ করাটা আমাদের কাছে যে কম উপাদেয় ঠেকে নি, সে কথা বোধ হয় সহজেই অনুমেয়। সুতরাং বৃন্দাবনধাম বড় ভাল লেগেছিল, এটা বলাই বেশি—বিশেষতঃ কাটখোট্টা দিল্লী-কংগ্রেসের অত্যাচারের পরে।

শ্রীবৃন্দাবনধাম শ্রীমন্দিরে-মন্দিরে একাকার। কত যে শ্রীমন্দির, কত যে শ্রীবৈষ্ণবী করতাল নিয়ে গান করেন, আর কত যে শ্রীকচ্ছপ, তার আর কি বল্‌ব ! (বৃন্দাবনে সবই শ্রী কি না !) শ্রীযমুনায় স্নান করার বিপুল ইচ্ছা শ্রীকচ্ছপের লীলা-খেলার দরুণ সংবরণ কর্ত্তে হ'ল।

বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমে স্বামী বেদানন্দই একমাত্র কর্ম্মী বল্‌লেই চলে। ইনি শরৎবাবুর ভ্রাতা এবং একজন সত্যিকার কর্ম্মী। এক রকম একাই সেখানকার নানান্ হিতকর কাজ সম্পন্ন করে থাকেন। কাজেই তাঁর "দাদৃভক্তি"র দরুণ অতিথি-সৎকারের জোরটা আমাদের ওপরও এসে পড়েছিল। আমাদের মানে আমার ও আমাদের এক তরুণ বন্ধুর উপর। তরুণ বন্ধুটি ছিলেন বাংলা-সাহিত্যের অনুরাগী ও বাঙালী-সুলভ আড্ডারসের একান্ত রসিক।

মথুরায়ও একদিন যাওয়া গেল। সেখানে শ্রীমন্দির বিশেষ দর্শন করা ঘটে ওঠে নি—যে শ্রীহনুমানের অত্যাচার। মথুরার বিশ্রাম-ঘাটে আমাদের এক পরিচিত ভদ্রলোকের চশমা নিয়ে জনৈক শ্রীহনুমান সটাং অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। তখন সুপক্ক কদলীর লোভ দেখিয়ে তাঁকে চশমা ফিরিয়ে দিতে রাজী করা গেল। শ্রীহনুমান বোধ হয় ভাবলেন "ক্ষতি কি? Fair exchange is no robbery" মথুরাবাসী পবননন্দন না কি এরূপ Strategyতে খুবই অভ্যস্ত।

মথুরা ও বৃন্দাবনের মধ্যে বৃন্দাবনই আমার বেশি ভাল লেগেছিল, যদিও কেন যে ভাল লেগেছিল, তা খুব সুস্পষ্ট করে বলা কঠিন। কোনও স্থান ভাল-লাগাটা নির্ভর করে অনেকগুলি জিনিসের উপর; যথা—আমাদের তখনকার মনের ওপর, সঙ্গের বা নিঃসঙ্গত্বের ওপর, অনেক সময়ে সে স্থানটির সঙ্গে জড়িত নানান্ ছোটখাট স্মৃতির ওপর,—এমনই আরও কত কি জিনিষের ওপর, যেগুলির অস্তিত্ব বা আবেদন আমাদের কাছে ব্যক্তিগত ভাবে খুবই প্রত্যক্ষ হ'লেও, অপরকে ঠিক্ সে আবেদনটির আভাষ দেওয়াটা অনেক সময়ে সুকঠিন হয়ে ওঠে। আমার সঙ্গী বা বন্ধু-বান্ধবদের অনেকেরই বৃন্দাবন ভাল লাগেনি। তাঁরা আমার ভাল-লাগার কথা শুনে আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, কেমন করে অমন সহর আমার ভাল লাগল! উত্তর আমি ঠিক্ মত দিতে পারি নি, কেন না, এ সব ভাল-লাগা না-লাগা সমস্যার সমাধান বড় সহজ-সাধ্য নয়। মনে আছে, বৃন্দাবনে এক দিন সূর্য্যাস্ত এত ভাল লেগেছিল যে, আমি আমার সঙ্গীদের দ্বারা পুনঃ পুনঃ অনুরুদ্ধ হ'লেও, দ্রুতগতিতে দ্রষ্টব্য স্থান দর্শনের জন্য ছুটতে মনকে রাজী করাতে পারি নি। আমার সেদিন মনে হয়েছিল যে, আমরা sight-seeingটাকে অনেকটা কর্ত্তব্য বলে ধরে নেওয়ার দরুণ, অনেক

সময়েই যে জন্য সেটা বড়, সে আসল জিনিষটাই হারিয়ে বসে থাকি।

যাই হোক্, মোটের ওপর বৃন্দাবনের জল-হাওয়া আমি শান্তিতেই ভোগ করেছিলাম। কাজেই বৃন্দাবনের স্মৃতি আমার মনে উপভোগ্য হিসেবেই বিরাজ করবে।

মথুরায় শেঠজীর একটি বাগান আছে। যমুনার ঠিক্ উপরেই। বড় মনোরম স্থান। সেখানে একদিন সন্ধ্যার ম্লানিমা-ঘেরা একটি বাঁধানো ঘাটে বসেছিলাম। শরীর মন এক অপূর্ব্ব ক্লান্ত-উদাস-মধুর পরশের প্রলেপে স্নিগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।—এমন সময়ে "ব্যাণ্ড"! আওয়াজ ক্রমেই বিবর্দ্ধমান। সর্ব্বনাশ! এমন যমুনার তীর! এমন অস্ফুট চন্দ্রালোকিত ঘাট! এমন বাগান! এমন পৌরাণিক স্মৃতি-বিজড়িত মধুরতা! এখানে সানাই নয়, বাঁশি নয়, বীণা নয়, কীর্ত্তন নয়, বিহগ-কাকলি নয়, বিরহ-সঙ্গীত নয়—ব্যাণ্ড! শুনলাম কে এক রাজা এসেছেন। এক মুহূর্ত্তে বিস্ময় তিরোহিত হ'ল। রাজাতেই এমন রুচি সম্ভব।

দিল্লী, মথুরা, বৃন্দাবন—কোথাও কিন্তু ভাল গান বাজনা শোনা গেল না। আগ্রায় গেলাম; ভাব্লাম, সেখানে অন্ততঃ কিছু ভাল গান শোনা যাবে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। কোথায় দিল্লী-আগ্রা, আর কোথায় সেখানকার বিখ্যাত গায়ক-গায়িকা! আগ্রায় একজন বেশ ভাল গাইয়ে ছিলেন ফৈয়াস খাঁ,—কিন্তু তিনি বরোদার গাইকবাড়ের সভা-গায়ক হওয়ার দরুণ আগ্রায় তাঁর দর্শন পাওয়া যায় নি। পরে বরোদায় তাঁর গান শুন্বার সুযোগ হয়েছিল। সে কথা যথাস্থানে লেখা যাবে। আগ্রায় আর একজন গায়িকা আছেন, তাঁর নাম লড্ডন জান। নামটি ঠিক্ কবিত্বময় না হলেও তিনি শুন্লাম সুগায়িকা। কাজেই গান শোন্বার জন্য খুবই উৎসুক ছিলাম। আগ্রায় আমার host মহোদয়

তাঁর গান শোনাবেনও বল্‌লেন; কিন্তু নানা কারণে সেটা হয়ে উঠ্‌ল না।

মনো-দুঃখে গোয়ালিয়রে চলে গেলাম। গোয়ালিয়র সঙ্গীতের জন্যে এক সময়ে প্রসিদ্ধ ছিল। কলিকাতার কাছে মেটেবুরুজে লক্ষ্ণৌয়ের সিংহাসনচ্যুত নবাব ওয়াজিদ আলি শা'র সভায় ১২১ জন গাইয়ে-বাজিয়ে ছিল। তাদের মধ্যে তাজ খাঁ, আলিবক্স খাঁ প্রভৃতি বিখ্যাত গাইয়েরা গোয়ালিয়রেরই গায়ক ছিলেন। ধ্রুপদে আলিবক্স খাঁর শিষ্য ছিলেন, বিখ্যাত ৺অঘোরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও খেয়ালে তাঁর একমাত্র বাঙালী শিষ্য হচ্ছেন বেয়ালার প্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীবামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। এঁর কাছেই আমি গোয়ালিয়রের অপূর্ব্ব সঙ্গীতের চালের পরিচয় পাই। তাঁর কাছে ধ্রুপদে এত সুন্দর গোয়ালিয়রের চালের গমক ও মিড় এবং খেয়ালে এত সুন্দর মিড় ও হলক্ তান শুনেছি যে, গোয়ালিয়রের দিকে একবার তীর্থ-যাত্রা করার সাধ আমার বহুদিন থেকেই ছিল। কিন্তু গোয়ালিয়রে গিয়ে বড় গাইয়ে একজনও শুন্‌তে পেলাম না। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে, সেখানকার সঙ্গীত-রসিক দু'-একজন সুধী আমাদের প্রশান্তভাবে জ্ঞাপন কর্লেন যে, এটা আমাদের অনর্থক বিলম্ব ক'রে জন্মানোর ফল; কারণ, যাঁরা বড় বড় গাইয়ে ছিলেন, তাঁরা বহুদিন হ'ল গতাসু হয়েছেন। কথাটা বোধ হয় সত্য। কারণ, আমাদের বর্ত্তমান সঙ্গীতকে **decadent** (অধোগামী) বলা যেতে পারে এবং তার প্রধান হেতু এই যে, আজকাল ভাল গায়কেরা আর পৃষ্ঠপোষক পান না ব'লে পেটের দায়ে সঙ্গীত-চর্চ্চা ছেড়ে অন্য কাজে মন দিতে বাধ্য হ'ন। অথচ সুগায়ক হওয়া অনেক দিনের একাগ্র সাধনা বিনা সম্ভব নয়। কাজেই আজকাল ভাল গায়ক খুঁজে পাওয়া বড়ই কঠিন হয়ে উঠেছে। আমি প্রায় সারা ভারত খুঁজে এত কম ভাল গায়কের গান শুনেছি যে, ভাবলে মনটা

বিস্ময় ও আক্ষেপে অভিভূত হয়ে না প'ড়েই পারে না। গোয়ালিয়রের মতন বিখ্যাত সঙ্গীতকেন্দ্রেও একজন ভাল গায়ক খুঁজে পেলাম না, এ দুঃখ রাখবার যায়গা কোথায়? হর্দ্দূ খাঁ, তাজ খাঁ, আলিবক্স খাঁ, প্রমুখ গায়কের উত্তরাধিকারী আজ গোয়ালিয়রে একজনও নেই, এটা সঙ্গীতানুরাগীদের কাছে যে কত দুঃখের বিষয়, তা সঙ্গীতানুরাগীই জানেন। গোয়ালিয়রের শেষ বড় গায়ক ছিলেন না কি শঙ্কর পণ্ডিত ও বালা গুরু। এঁরা দুজনেই কয়েক বৎসর আগে গায়কলীলা সংবরণ করতঃ গোয়ালিয়রকে শূন্য ক'রে গেছেন। শঙ্কর পণ্ডিতের পুত্র এখন গোয়ালিয়রে একমাত্র গায়ক বল্‌লেও হয়। তাঁর নাম কৃষ্ণ রাও। ইনি পিতার সঙ্গীত-বিদ্যালয়টিকে কোন প্রকারে জিইয়ে রেখেছেন। এঁর গান শোনা আমার হয় নি; কারণ, আমি যখন গোয়ালিয়রে গিয়েছিলাম, তখন তিনি সেখানে ছিলেন না।

সে যাই হোক্, কার কার গান শোনা হ'ল না, সে কথা বেশি বাগাড়ম্বর সহকারে না ব'লে কার কার গান শুন্‌লাম, সেই কথাই বলি।

গোয়ালিয়রে সব চেয়ে ভাল গুণী যিনি আছেন, তাঁর নাম হাফেজ আলি খাঁ। ইনি রামপুরের বিখ্যাত বীণকার উজীর খাঁর শিষ্য। উজীর খাঁর দুই শিষ্য বর্ত্তমান সময়ে শ্রেষ্ঠ। আলাউদ্দীন খাঁ ও হাফেজ আলি খাঁ। এঁরা দুজনেই অতি উৎকৃষ্ট বাজান। বৎসর কয়েক আগে কলিকাতায় আলাউদ্দীন খাঁর সেতার ও বেহালা শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। এত সুন্দর সেতার আমি এক ভাওনগরের বিখ্যাত বৃদ্ধ সেতারী রহিম খাঁর ছাড়া আর কারও শুনিনি যাঁর কথা যথাস্থানে লেখা যাবে। হাফেজ আলি খাঁ বোধ হয় সেতার বাজান না। কিন্তু শরদ এত সুন্দর আর আমি শুনি নি।

কি সুন্দর এঁর মিড়ের হাত, আর কি চমৎকার ঝঙ্কারের বাহার! যাঁরা

এঁর বাজনা শোনেন নি তাঁদের শোনা উচিত। ইনি মাঝে মাঝে কলিকাতায় এসে প্রসিদ্ধ গায়ক ৺লালচাঁদ বড়াল মহাশয়ের বাড়ীতে থাকেন। কাজেই এঁর বাজনা শোনা তত কঠিনও নয়।

গোয়ালিয়রে আর একজন মারাঠী বাজিয়ের তাউস বাজানো শুনেছিলাম। তাউস এস্রাজের একটু ভাল সংস্করণ। বেশ লেগেছিল; তবে হাফেজ আলি খাঁও সেদিন বাজিয়েছিলেন। কাজেই তাঁর শরদের পাশে তাউস যেন নিভে গেল। ভাল গুণীর পাশে গান-বাজনা করার এই এক মহা বিপদ আছে।

গোয়ালিয়রে একজন মাত্র ভাল গায়িকার গান শুনেছিলাম। তাঁর নাম মঙ্গু বাই। বয়স ৬০ এর কাছাকাছি। মঙ্গু বাই এখন বাতে পঙ্গু। কিন্তু গান করেন সুন্দর। শুন্‌লাম এমন খেয়াল না কি এ অঞ্চলে খুব কম বাইজীতেই গাইতে পারে। খুব ভাল লেগেছিল, তবে কাশীতে বৃদ্ধা হুশ্‌নার গান যেন আরও ভাল লেগেছিল। হুশ্‌না মিড়ের কাজ বড় সুন্দর করে—যদিও মঙ্গু বাইয়ের গলা ও গলায় তানের কাজ হুশনার চেয়ে এখনও একটু ভাল অবস্থায় আছে। মঙ্গু বাই দুঃখ করে বল্‌লেন যে ১০।১৫ বছর আগে এলে তিনি এমন গান শোনাতে পারতেন যে ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁর জরাজীর্ণ গলার গান শুনে মনে হ'ল কথাটা মিছে দম্ভ নয়।

গোয়ালিয়রের প্রাকৃতিক শোভা অতি মনোরম। পাহাড়ের উপর দুর্গটি চমৎকার স্থানে নির্ম্মিত। সেখান থেকে সহরটি অতি সুন্দর দেখায়। দেখ্‌বার মত মন্দির প্রভৃতিও বড় কম নেই। মান-মন্দির, সহস্রবাহু-মন্দির প্রভৃতি নানান্ স্থাপত্য-কীর্ত্তি আছে। মন্দিরগুলির কাজ কিন্তু বড়ই "জবড়জং"। সরলতার দিকে শিল্পের যে একটা স্বাধীন প্রবণতা আছে, তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার কর্লে, সে শিল্প যে আমাদের

নয়ন-মনকে কতটা ক্লান্ত করে দিতে পারে, সে প্রমাণ এখানকার মন্দির-গুলির অসংখ্য কারুকার্য্য দেখ্‌লে এক মুহূর্ত্তেই পাওয়া যায়।

গোয়ালিয়রে আমার খুব ভাল লেগেছিল ভাতখণ্ডে মহোদয়ের স্কুল। ভাতখণ্ডে মহাশয় একা চেষ্টা করে এই স্কুলের স্থাপনা করেন। এখন তিনি মাঝে মাঝে এ স্কুল পরিদর্শন কর্ত্তে আসেন। স্কুলের অধ্যাপকগণ আমাকে তাঁদের ছাত্রদের গান শোনালেন। পাঁচ বৎসরের পাঠ সাঙ্গ কর্লে স্কুলের শিক্ষা সমাপন হয়। বম্বেতে ভাতখণ্ডে মহাশয় আমাকে বলেছিলেন "আমার স্কুলের উদ্দেশ্য—ছাত্রদের পাঁচ বৎসরে সঙ্গীতবিশারদ করে ছেড়ে দেওয়া নয়। সেটা আজীবনের সাধনার জিনিষ। সঙ্গীত-স্কুলের উদ্দেশ্য—ছাত্রদের মনে উচ্চ সঙ্গীতের রস ঢুকিয়ে দেওয়া মাত্র, যাতে পরে তারা স্বচেষ্টা ও সুবিধে মত আরও শিখ্‌তে পারে।" কথাগুলি খুব ঠিক্। তবে ভাতখণ্ডে মহোদয়ের এ স্কুলের অনেকগুলি ছোট ছেলের মুখে যে সব গান শুন্‌লাম, তা বাস্তবিকই অদ্ভুত। তান লয় বিস্তারে তাদের গান আশ্চর্য্য রকম সমৃদ্ধ। পাঁচ বৎসরের শেষে না কি প্রত্যেক ছাত্রই ধ্রুপদ ছাড়া ৩০০।৪০০ খেয়াল বিশুদ্ধ ভাবে গাইতে পারে। তা ছাড়া তারা গান শোন্‌বামাত্র স্বরলিপি করে নিতে পারে। এ কথা যদি সত্য হয়, তবে ভাতখণ্ডের অক্লান্ত সাধনা সার্থক হয়েছে বল্‌তে হবে। প্রথম-বার্ষিকী যে দুটি ছাত্র আমার কাছে গাইল, তাদের বয়স হবে ৭।৮ বৎসর। দ্বিতীয়-বার্ষিকী ছাত্র সেদিন ছিল না। তৃতীয়-বার্ষিকী ছাত্র দুটির বয়স হবে ১০।১১ বৎসর। চতুর্থ-বার্ষিকীর ১৩।১৪ ও পঞ্চম বার্ষিকীর ১৬।১৭ বৎসর। এর মধ্যে প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম বার্ষিকী ছেলেদের গান আমার খুব ভাল লাগল। কেবল শিক্ষকদের দোষ দেখলাম এই যে, তাঁরা ছাত্রদের বড় বেশি চড়া গলায় গাইতে বাধ্য করে থাকেন। এতে বালক-সুলভ মধুর কণ্ঠের মিষ্টত্বের একটু হানি হয়; ও তা ছাড়া,

এটা তরুণ কণ্ঠপেশীর পক্ষে বিপদ্‌জনকও বটে। এ কথা আমি তাঁদের বলে এসেছিলাম ও Visitor's bookএ লিখেও এসেছিলাম।

গোয়ালিয়রের এ স্কুলটিতে শুন্‌লাম ২০০।৩০০ ছেলে গান শেখে। তা ছাড়া আরও দু তিনটি স্কুল আছে। গোয়ালিয়রের মতন ছোট সহরে বালকদের জন্য এতগুলি স্কুল আর আমাদের বাংলা দেশের রাজধানী কলিকাতায় ছেলেদের জন্য একটিও উল্লেখযোগ্য স্কুল নেই, এ কথা ভাবলে মনে দুঃখ না হয়েই পারে না। কারণ, এটা কি আক্ষেপের কথা নয় যে, উচ্চ সঙ্গীতের অধ্যাপনা-উৎসাহে আমাদের শিক্ষতা-গর্ব্বিত বাংলা দেশ আজ এত পেছিয়ে পড়ে আছে? অবশ্য গোয়ালিয়রের স্কুলগুলি মহারাজা সিন্ধিয়ার অর্থ-সাহায্যেই চলে। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে কি এমন দু'চার জন বড়লোক নেই, যাঁদের চাঁদায় কল্‌কাতায় অন্ততঃ দু তিনটা স্কুলও ভাল চল্‌তে পারে? আসল কথা টাকা নয়, আসল কথা সঙ্গীতে আন্তরিক অনুরাগের অভাব। তবে cultureএর গর্ব্বে গর্ব্বিত বাঙালী জাতির মধ্যে এ অনুরাগ মারাঠাদের চেয়ে যে অনেক কম, এ কথাটা প্রণিধান-যোগ্য।

গোয়ালিয়র থেকে ঝাঁসি যাওয়া গেল। ঝাঁসিতে বীরনারী লক্ষ্মীবাইয়ের দুর্গপ্রাকার দেখলে মনটা কেমন একটা অপূর্ব্ব সম্ভ্রম ও আবেগে ভ'রে ওঠে। "ঝাঁসি কভি নহি দুঙ্গি" এমন কথা সে হীন যুগেও যে একজন নারীর মুখ হ'তে বাহির হয়েছিল, এই চিন্তাটাই একটা গর্ব্বের বিষয়। মনে হয়, যাই হোক্‌, একজন ভারতীয় রমণীও ত এরকম তেজোগর্ভ বাণী উচ্চারণ করেছিলেন ও প্রাণ দিয়ে নিজের কথার মর্য্যাদা রক্ষা করেছিলেন। লক্ষ্মীবাইয়ের প্রাসাদও বাইরে থেকে দেখা গেল। দুঃখ হ'ল এই মনে করে যে, দেশভক্ত স্বাধীন ইংরাজ জাতি স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দেওয়াকে মনে মনে সম্মান কর্ত্তে বাধ্য হ'লেও, স্বার্থ এমনই জিনিষ যে, বাইরে সে

তারিফের কোনও প্রকাশ কর্ত্তে একান্তই অনিচ্ছুক। নইলে কলিকাতার অন্ধকূপ ও কাণপুরের হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি রক্ষা কর্ত্তে তাদের সতর্কতার অন্ত না থাক্‌লেও, লক্ষ্মীবাইয়ের মত মহাপ্রাণের স্মৃতিরক্ষার জন্যে একটি অঙ্গুলী উত্তোলন করাও তারা দরকার মনে করে না।

ঝাঁসিতে এক গানের আসর হ'য়েছিল। সেখানে একজন শ্রমজীবীর ১৭।১৮ বৎসরের একটি ছেলের মুখে খাম্বাজ বেহাগ প্রভৃতি রাগ রাগিণী এত মধুর ভাবে গীত হ'তে শুনেছিলাম, যে, মনে দুঃখ হ'য়েছিল যে, গানে এমন স্বাভাবিক ক্ষমতা কত সময়েই না শুধু শিক্ষা ও সুযোগ অভাবে ফুটে উঠতে পারে না! য়ুরোপে ললিতকলায় এ রকম অনন্যসাধারণ পারদর্শিতা অনেক সময়ে পুরস্কৃত হ'তে দেখা যায়, যাতে তার বিকাশ সম্ভবপর হ'য়ে ওঠে। কিন্তু আমাদের দেশে এজন্য অনুভব করে এমন লোকমত নেই বল্‌লেই হয়।

সেদিন ঝাঁসির গণ্যমান্য ভদ্রলোকেরা একটি ভিখারিণীকে ডাকিয়ে এনে আমাকে তার গান শুনিয়েছিলেন। সে "নাহি পরত চৈন" বলে একটি পিলুবারোয়াঁ এমন মধুর তান সহকারে গাইল যে, আমি প্রথমটায় বিশ্বাসই কর্ত্তে পারি নি যে, একজন ভিখারিণী এমন সুন্দর তানলয়ের সঙ্গে গাইতে পারে। গান ভাল করে শিখতে পেলে সে নিশ্চয়ই একজন সুগায়িকা রূপে পরিণতি লাভ কর্ত্তে পারত। মনে হ'ল, ললিতকলায় এমন কত talentই না আমাদের দেশে উৎসাহ অভাবে অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়! তবে জগতে ট্রাজিডি এত বেশি যে, শিল্পকলার দিক্ দিয়ে এ শক্তি-অপচয়ের জন্য আন্তরিক দুঃখ বোধ করাও বোধ হয় অনেক সময়ে আমাদের পক্ষে একটু কঠিন হ'য়ে ওঠে। কেন না, এ সহানুভূতি প্রকাশ কর্ব্বার আগেই আমাদের ক্ষুব্ধ মন বাধা দিয়ে বলে ওঠে যে, মানুষের অনাহার, দারিদ্র্য, রোগ-শোক প্রভৃতি শত শত গভীরতর দুঃখেরই ত আগে একটা স্থায়ী

সমাধান করা যাক্—তার পর না হয় এ সব আর্টের বিকাশ-রূপ বিলাস-সমস্যার সমাধানে মনোনিবেশ করা যাবে। মানুষের দৈনন্দিন দুঃখ বাস্তবিকই বড় দুঃখ, এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই; সুতরাং, এ দুঃখ-মোচনের চেষ্টাকেও ছোট ক'রে দেখা চলে না সত্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নও মনে উদয় হয় যে, এজন্য জীবন-বিধাতার শিল্পে প্রতিভা রূপ দানকে এভাবে অমর্য্যাদা করাটা কি বাস্তবিকই উচিত, বা এ সব দুঃখ-কষ্ট মোচনের অনুকূল? একটু ভেবে দেখতে গেলেই এ সম্বন্ধে ঘোর সংশয় জন্মায়। কারণ মানুষের ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসের পাতায় আমরা দেখতে পাই যে, দুঃখ-কষ্ট মানুষ সৃষ্টির আদিমকাল থেকে ভোগ করে এসেছে (এবং এখনও বোধ হয় অন্ততঃ বহুদিন ধ'রে করবে।) তাই "এসব দুঃখ-কষ্ট মোচনের দাবীদাওয়াকে গ্রাহ্য করা সম্পূর্ণ শেষ হ'লে তবে ত শিল্পকলার দাবী!" এ রকম কথাটাকে সত্য বলে মনে না করার কারণ আছে। কারণ, এ রকম সঙ্কল্প নিয়ে জীবনযাত্রার পথে অগ্রসর হ'লেও, তার দরুণ বাস্তব জীবনের দুঃখ-কষ্টের বিশেষ লাঘব হবে বলে মনে হয় না; হতে পারে কেবল—যুগযুগব্যাপী সাধনার ফলে মানুষ অনেক অশ্রু ব্যথা দিয়ে যে দুচারটি সৌন্দর্য্যের মন্দির সৃষ্টি করেছে, তার চিহ্নও মুছে দেওয়া। কেন না, সংসারে অদৃষ্টের পরিহাস ও পদে পদে দুঃখ-দৈন্যকে জয় করে শিল্পে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি কর্ত্তে সময় ও সাধনা লাগে—অজস্র; কিন্তু যুগার্জ্জিত ঐশ্বর্য্যের ধ্বংস সাধন কর্ত্তে মুহূর্ত্তের বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় না।

বাঙ্গালোরে শেষণের অপূর্ব্ব বীণা ছাড়া অন্য কোনও উচ্চশ্রেণীর অথচ মনোহর সঙ্গীত শোনা হয় নি। অর্থাৎ, কর্ণাটী বিশেষজ্ঞদের মতে উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীত এবার দক্ষিণে যথেষ্ট শোনা গিয়েছিল; তবে তার মধ্যে মনোহারিত্ব ছিল না, এই যা দুঃখ। তবু দক্ষিণী গান-বাজনার খুব শ্রেষ্ঠ নিদর্শন শুনেছিলাম অনেকটা কর্ত্তব্য-বোধে। কারণ, শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর হিন্দুস্থানী সঙ্গীত যার মনে একবার অনুরণন তুলেছে, কর্ণাটী সঙ্গীত তার কেবল কাণের ভিতর প্রবেশ কর্ত্তে পারে মাত্র, "মরমে পশিতে" পারে না। দক্ষিণীরা তাদের সঙ্গীত খুব **scientific** বলে গর্ব্ব করে থাকে; কিন্তু তারা গানে এমন অদ্ভুত ভাবে স্বরকে নাচায়, যাতে আমাদের মনটা কেমন যেন একটু উদ্‌ভ্রান্ত না হয়েই পারে না। তবে দক্ষিণী সঙ্গীত সম্বন্ধে আমার ধারণা ও **impression**গুলি একসঙ্গে না বলে, নানা সূত্রে বলাই ভাল বলে, আপাততঃ দক্ষিণী গায়ক-বাদকদের কি কি গুণপনা আমার চোখে পড়েছিল, সে সম্বন্ধেই দুচারটি কথা বল্‌ব।

বাঙ্গালোরে বৈদ্যনাথ চম্পায়ে ভাগবতার বলে একজন খ্যাতনামা গায়কের গান শুনেছিলাম। শুন্‌লাম যে, ইনি প্রথিতযশা না হলেও, দক্ষিণে উদীয়মান গায়ক বলে গণ্য হয়ে থাকেন। তবে তিনি উদীয়মান কি অস্তমান সে কথা ছেড়ে দিলে, তাঁর গানের সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, তাতে কম্পমান না হয়ে থাক্‌তে পারে, এমন শ্রোতা এক দক্ষিণেই মেলা সম্ভব। কারণ, তাঁর জীবনের **motto** ছিল বিদ্যুদ্বেগে গান করে নিজেকে ও অন্য পাঁচজনকে গলদ্‌ঘর্ম্ম-কলেবর করে তোলা। তবে তাঁর সে গানের আসরের মধ্যে আমার ভাল লেগেছিল এইটুকু মাত্র যে, সেটা ছিল বিশুদ্ধ গানের আসর। সকলেই সেখানে এসেছিল গান

শুন্‌তে, এবং টিকিট কিন্‌লে সকলেই সে গান শুন্‌তে যেতে পারত। আমাদের দেশে জনসাধারণ উচ্চ সঙ্গীত শোন্‌বার ইচ্ছা থাকৃলেও সুযোগ পায় না—এ অনুযোগ আমি ইতিপূর্ব্বেই করেছি *। তাই সে প্রসঙ্গের পুনরুল্লেখ না করে আপাততঃ এইটুকুমাত্র বল্‌তে চাই যে, আমাদের সঙ্গীতের আদর ও প্রতিপত্তি যদি বাড়াতে হয়, তবে তা যাতে আমাদের জনসাধারণ শুন্‌তে পায়, সে বন্দোবস্ত করতেই হবে। এ পর্য্যন্ত রাজা-উজীর-জমীদাররা ওস্তাদ-বাইজীদের ডাকতেন নিজেদের প্রিয়পাত্র দুচার-জনকে শোনাতে, ও সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক বলে মনে করে গুম্ফদেশে চাড়া দিতে। এখন আর সে রকমটি চল্‌বে না। কারণ, সঙ্গীত হচ্ছে অনুরাগীর আনন্দের জন্য, রসিকের রস যোগাবার জন্য, সাধকের সাধনার জন্য—বড় মানুষের একচেটে হওয়ার জন্য নয়।

দক্ষিণে এই জিনিষটা আমার খুবই ভাল লেগেছিল যে, সেখানকার গাইয়ে-বাজিয়েরা টিকিট করে গান-বাজনার আসর করে থাকেন। কারণ এই দুই উপায়েই গানবাজনার সম্বন্ধে রুচি বা লোকমত গড়ে উঠতে পারে। রাজারাজড়ার ওখানে গানবাজনা হলে, যথার্থ সঙ্গীতানুরাগীর সেখানে প্রবেশাধিকার বড় একটা থাকে না, কাজেই উচ্চসঙ্গীতের আবেদন যেখানে পৌঁছান উচিত, সেখানে পৌঁছায় না।

ভাল গান মাঝে মাঝে শুন্‌তে পায় বলেই কি না জানি না, তবে মান্দ্রাজীরা খুব সঙ্গীতজ্ঞ দেখ্‌লাম। রাস্তায় ঘাটে উৎসবাদি উপলক্ষে তারা ছোটবড় দল ক'রে বাদ্যযন্ত্রাদি নিয়ে গাইতে গাইতে নগর পরিক্রমণ ক'রে থাকে। সহজ সঙ্গীত সচরাচর লোকপ্রিয় হয় ব'লে, এ রকম দৃষ্টান্তকে কোনও জাতির যথার্থ সঙ্গীতানুরাগের প্রমাণ স্বরূপে গণ্য

---

* "আবদুল করিম ও আমাদের উচ্চ সঙ্গীত" প্রবন্ধে।

করা চলে না। তবে মান্দ্রাজীরা যে উচ্চ সঙ্গীতও টিকিট কিনে শুন্‌তে যায় (ও যথেষ্ট লোক গিয়ে থাকে) এ সত্যটিকে তাদের যথার্থ সঙ্গীতানুরাগের প্রমাণ স্বরূপে অনেকটা গণ্য করা যেতে পারে বোধ হয়। বলা বাহুল্য যে, এজন্য আমার মান্দ্রাজীদের ওপর শ্রদ্ধা হ'য়েছিল— তাদের অর্দ্ধমুণ্ডিত অদ্ভুত মস্তকের দৃশ্য সত্ত্বেও। মনে আছে যে তখন আমি প্রথমে এই সত্যটি আবিষ্কার করেছিলাম যে তাহ'লে হয়ত মস্তক মুণ্ডনের সঙ্গে সঙ্গীত-কলানুরাগের খুব নিগূঢ় সম্বন্ধ না-ও থাক্‌তে পারে; যদিও এ অভাবনীয় আবিষ্কারে যে মনটা একটুও বিচলিত হয়ে পড়ে নি, এমন কথা শপথ করে বলা কঠিন। কারণ আশৈশব কোনও জাতিকে বেরসিকতার অবতার স্বরূপে মনে করে এসে, যদি হঠাৎ একদিন তাদের মধ্যে রসগ্রাহিতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহ'লে বোধ হয় মনটা একটু উদ্‌ভ্রান্ত হ'তে বাধ্য।

সে যাই হোক্, ভাগবতার মহাশয়ের গানের মধ্যে ছিল বিদ্যুদ্বেগ গতি। আর ছিল সেই অদ্ভুত দক্ষিণী স্বরকম্পন। আর ছিল অসাধারণ তালে দক্ষতা। ছিল না কেবল সুন্দর মিড়ের প্রাদুর্ভাব। ছিল না মনোজ্ঞ স্বাভাবিক তানালাপ। ও ছিল না গানে প্রাণের কোনও বালাই। তবে এক শেষণের বীণায় ছাড়া এ সব গুণগুলির **উপদ্রব্** দক্ষিণী সঙ্গীতে একেবারেই দেখা যায় না। কাজেই এজন্য ভাগবতার মহাশয়কে দোষী করা আমার অভিপ্রায় নয়। কারণ কোনও দেশের সঙ্গীতের উৎকর্ষ নির্ভর করে প্রধানতঃ তার traditionএর ওপর। দক্ষিণী বা কর্ণাটী সঙ্গীতের tradition ও আদর্শ হচ্ছে তালে দক্ষতা, রাগের বিশুদ্ধতা ও গতানুগতিকতার আনুগত্য। কাজেই তাতে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের দরদ, মিড়, গমক, প্রশান্ত আলাপ—এসব আশা করা ত ঠিক সঙ্গত নয়।

দক্ষিণী সঙ্গীত না কি অত্যন্ত **scientific** এবং দক্ষিণী গায়কেরা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে বড়ই অবজ্ঞার চোখে দেখে থাকেন। তবে এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, Where ignorance is bliss it is folly to be wise। বিখ্যাত প্রফেসর আবদুল করিম খাঁ যে কর্ণাটী সঙ্গীত হুবহু আয়ত্ত করেছেন, এ কথা আমাকে একজন মস্ত দক্ষিণী সমালোচক বলেছিলেন। কিন্তু দক্ষিণী কোনও গায়ককে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত আয়ত্ত করতে শুনি নি—যদিও মহীশূরের বিখ্যাত গায়ক বিড়ার কৃষ্ণপ্পা মহোদয়কে সে অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করতে যে দেখি নি এমন নয়।

দক্ষিণী গায়কেরা একটা জিনিষের বড়ই ভক্ত। তারা এক এক সময়ে এত দ্রুত "সার্গম" আলাপে মত্ত হয়ে ওঠে যে, বাস্তবিকই শুধু তার বিদ্যুদ্বেগ গতির জন্যই শ্রোতৃবৃন্দের রোমহর্ষণ হ'তে থাকে। মাঝে মাঝে যখন এ "সার্গম" আলাপ প্রায় মেল ট্রেণের বেগে পৌছয়, তখন দক্ষিণী শ্রোতৃবৃন্দের করতালিতে ঘর মুখর হয়ে ওঠে, ও তাতে উপলব্ধি করা যায় যে, হাওয়ার মধ্যে উৎসাহ জিনিষটির তাপ কতখানি।

তবে এখানে একটি কথা বলবার আছে। সেটা হচ্ছে এই যে, সঙ্গীতের নিছক দ্রুতগতি অনেক সময়ে আমাদের মন্ত্রমুগ্ধবৎ করে ফেল্‌লেও, এ মোহ সঙ্গীতের যথার্থ উপভোগজনিত আনন্দের ফল নয়। কথাটা একটু পরিষ্কার করে বলি। গানে জলদ গাওয়া বা বাজানোর দ্বারা পাঁচজনের চমক লাগানো যে যায় না তা নয়—বিশেষতঃ যদি অনভিজ্ঞকে নিয়ে কারবার হয়। তবে এ চমক লাগানোর মূল্য খুব বেশি বলে মনে হয় না। কারণ সঙ্গীতে এ শ্রেণীর আনন্দ রসগ্রহণের আনন্দ নয়, তার কঠিনতার দরুণ বিস্ময়ের আনন্দ মাত্র। অর্থাৎ দুরূহ কিছু দেখ্‌লে বা শুন্‌লে আমাদের মনে একটা স্বাভাবিক বিস্ময় আসে। তার ওপর ভাল সমালোচনার প্রাদুর্ভাব না থাক্‌লে এরূপ মল্লযুদ্ধের প্রশংসা

শুন্‌তে শুন্‌তে মনটা অনেকটা মন্ত্রমুগ্ধের মতন হ'য়ে পড়ে ও মনে করে বসে যে এরূপ মল্লযুদ্ধ বুঝি খুবই বড় আর্ট। যেখানে যথার্থ সমালোচনার অভাব, সেখানে ছোট জিনিষকে বড় করে দেখানোর মতন সহজ জিনিষ সংসারে অল্পই আছে। দক্ষিণীদের মধ্যে এই অসম্ভব জলদ গাওয়ার উৎসাহ দেখে, এ সত্যটি যেন আমি আরও বেশি করে উপলব্ধি করেছিলাম। দক্ষিণীরা এরূপ বিদ্যুদ্বেগে গাওয়ার দরুণ উত্তেজনাকে বিশুদ্ধ সঙ্গীতানন্দ বলে মনে করে থাকে। অথচ তাদের "সার্গম" আলাপের গতি সময়ে সময়ে এতই বেগবতী হয়ে ওঠে যে, তখন তার মধ্যে সুরের বালাই একেবারেই থাকে না। তবে যেখানে মানুষ **perspective** হারিয়ে বসে থাকে, সেখানে যথার্থ আর্ট যে কি তা তাকে বোঝানর চেষ্টা করার মতন বিড়ম্বনা সংসারে অল্পই আছে। তাই দক্ষিণীরা মুসলমানী চালের গানের দাম দিতে একান্ত অক্ষম।

বাস্তবিক কর্ণাটী সঙ্গীতে তালের উপদ্রব (অর্থাৎ জলদ গাওয়া) এত বেশি যে, সেটা বর্ণনা ক'রে বোঝান সম্ভব নয়। এবং এ দ্রুত গাওয়ায় দক্ষিণীরা উন্নতির চরম সীমায় উঠেছে—"সার্গম" সাধনের বেলায়। একে কিন্তু বাস্তবিকই একটা অষ্টম বিস্ময় বল্‌লেও চলে। মানুষে যে কত দ্রুত সা রে গা মা পা ধা নি সা উল্‌টে পাল্‌টে বল্‌তে পারে, সেটাও যে একটা শোন্‌বার জিনিষ, তা যিনিই দক্ষিণী "সার্গম" আলাপ শুনেছেন, তিনিই জানেন। আমাদের হিন্দুস্থানী ওস্তাদদের এ বিষয়ে কৃতিত্ব দক্ষিণী ওস্তাদদের অনেক নীচে। আমরা বোধ হয় এ বিষয়ে দক্ষিণীদের সমকক্ষ হ'তে পারব না। কথাটা কি রকম জানেন? তিন সেকেণ্ডের মধ্যে যদি কাউকে অষ্টাদশ পুরাণ, ষড়দর্শন, ঊনবিংশতি সংহিতা ও চতুর্ব্বেদের নাম করে যেতে বলা হয়, তাহলে তাকে কিরূপ বিদ্যুদ্বেগে এ সব নাম জপ কর্‌তে হয়, একবার ভেবে দেখুন। তবে যদি কেউ বলেন যে এটা অসম্ভব,

তাহলে আমি তাঁকে একবার মাত্র মহীশূরের গায়ক বিড়ার কৃষ্ণপ্পা মহোদয়ের গান শুনে সকল সন্দেহ ভঞ্জন করে আস্‌তে বল্‌ব।

বিড়ার কৃষ্ণপ্পা মহাশয়ের গান আমি শুনেছিলাম মহীশূরে অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের ওখানে। এখানে কথা উঠ্‌তে পারে যে, বিড়ার কৃষ্ণপ্পার মতন বেখাপ্পা নামধারী লোক বড় গায়ক হতে পারেন কি না। কারণ এ সঙ্গত তর্ক উঠ্‌তে পারে যে, এও যদি সম্ভব হয়, তবে জগদম্বাও সুন্দরী হ'তে বা হিড়িম্বচন্দ্রও কবি ব'লে গণ্য হ'তে পারেন কি না। এ গুরুতর গবেষণার ভার দার্শনিকদের হাতে ছেড়ে দিলে বলা যেতে পারে যে, "তথাপি" কৃষ্ণপ্পা মহোদয় মহীশূরে একজন বড় গায়ক বলে গণ্য। যাঁর সন্দেহ হয়, তিনি যেন একবার মাত্র তাঁর সার্গম আলাপ শুনে আসেন।

কর্ণাটী সঙ্গীত অনেকটা মুসলমান প্রভাব হ'তে মুক্ত। হিন্দুস্থানী সঙ্গীত তা নয় হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে মুসলমানের দান খুবই বেশি। ফলে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ঢঙের মধ্যে এমন একটা সমৃদ্ধ রস মেলে, যেটা কর্ণাটী সঙ্গীতের ক্ষেত্রে একেবারেই মেলে না। যাঁরা সঙ্গীতে পুরাতনপন্থী—এ সত্যটি তাঁদের অনুধাবনীয়। সঙ্গীতের—শুধু সঙ্গীতের কেন, সব ললিতকলারই প্রাণ হচ্ছে বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্র্যের অনেকটাই নির্ভর করে মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতার উপর। কোনও বিদেশী সভ্যতার অভিঘাত মানুষের একটা বড় অভিজ্ঞতা। তাই যদি এই অভিজ্ঞতাটা একটা মহনীয় অভিজ্ঞতা হয় তবে তার ফল ললিতকলার উপরে না হয়েই পারে না। যেমন ইতিহাসে দেখি, ভারতীয় দর্শন গ্রীক দর্শনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল; গ্রীক স্থাপত্য রোমান স্থাপত্যকে গড়ে তুলেছিল; ইতালীর Renaissanceএর শিল্পকলা সমগ্র য়ুরোপের শিল্পকলার উপর তার ছায়া ফেলেছিল; ফরাসীবিপ্লবের সাম্যনীতি তখনকার প্রায় সমস্ত জগতের

চিন্তাধারাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল ; ইত্যাদি ইত্যাদি। এক সভ্যতার অপর সভ্যতার উপর প্রভাব বিস্তার করাটা শুধু যে অস্বাভাবিক নয় তাই নয়—বাঞ্ছনীয়। তবে এ সব ক্ষেত্রে বিপদ বিদেশী সভ্যতার মধ্যে ভাল জিনিষটার আমদানীর মধ্যে নয়, বিপদ হচ্ছে অন্ধ অনুকরণে। আসল কথাটা হচ্ছে এই যে, বিদেশীর দান হ'তে সত্য সত্য লাভ করতে হলে, সেটাকে অনেকটা আমাদের স্বীয় সভ্যতার ও বিকাশধারার উপযোগী ক'রে নিতে হবে, যাতে সে দানটা একটা বাইরের দান মাত্রে পর্য্যবসিত না হয় ; অর্থাৎ যাতে সে দানকে আমরা নিজস্ব করে নিতে পারি। মুসলমানেরা আমাদের মধ্যে ছিল। সুতরাং আমাদের সঙ্গীতে তাদের দানের মধ্যে নূতনত্ব থাক্‌লেও সে নূতনত্ব কৃত্রিম নয়। সে একটা স্বাভাবিকতা ও স্বতঃস্ফূর্ত্তির গরিমায় গরীয়ান। এ কথার প্রমাণ মেলে—তানসেনের সৃষ্ট দরবারী কানাড়া, আড়ানা, মিঞামল্লার প্রভৃতি নূতন রাগ সংমিশ্রণে। এ কথার প্রমাণ মেলে—আমীর খসরু, সদারং প্রমুখ স্রষ্টাদের খেয়ালে ; এ কথার প্রমাণ মেলে—শোরী হম্‌দম প্রমুখ গুণীদের টপ্পা ঠুংরী সৃজনে ; ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনেক কর্ণাটী সঙ্গীতাভিমানীকেই তাঁদের রাগের বা "মেলকর্ত্তা"র বিশুদ্ধতা নিয়েই মত্ত থাক্‌তে দেখা যায়। সংসারে সব জিনিষকেই একটা fetish করা যায়, যেমন দক্ষিণী রাগরাগিণীর ঠাটের বা "মেলকর্ত্তার" বিশুদ্ধতা কর্ণাটী সঙ্গীতরসিকদের কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন হয়েছে যে, মহীশূরের একজন বুদ্ধিমান সঙ্গীতজ্ঞও * অম্লান বদনে লিখে গেছেন যে, কোনও রাগে দুই মধ্যম (যেমন বেহাগ বা পুরবীতে) বা দুই গান্ধার (যেমন সিন্ধু বা জয়জয়ন্তীতে) বা দুই নিখাদ (যেমন দেশ বা খাম্বাজে)

---

* Krishna Rao.........Psychology of music.

ব্যবহার করা নীতিবিগর্হিত, কর্ণাটী সঙ্গীতে এরূপ প্রয়োগ বিষবৎ পরিত্যজ্য ও সেইটেই আদর্শ হওয়া উচিত ; ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু বেহাগ, খাম্বাজ, পুরবী, সিন্ধু, জয়জয়ন্তী প্রভৃতি রাগিণীর সঙ্গে যাঁর সামান্য পরিচয়ও আছে তিনিই জানেন, এ কথা কত অশ্রদ্ধেয়। যেহেতু দুই গান্ধার মধ্যম বা নিখাদ ব্যবহার ক'রে এ রাগিণীগুলির সৌন্দর্য্য যে কতখানি বেড়ে গেছে, সে কথা সঙ্গীতজ্ঞের কাছে অগোচর থাক্‌তেই পারে না। ইংরাজীতে একটা প্রবচন আছে ঃ···"The proof of the pudding lies in the eating." এখন যদি কেউ বলেন যে, যেহেতু এ তরকারীটিতে আদার রস বা গোলমরিচ দেওয়া হয়েছে, সেহেতু এটী খেতে যত চমৎকারই হোক না কেন, আসলে অশাস্ত্রীয় তরকারী তৈরি হয়েছে, তাহলে কথাটা কেমন শোনায়? এরূপ যুক্তিপ্রয়োগের একমাত্র উত্তর হচ্ছে যে, যদি আমার কাঠের বেড়াল ইঁদুর ধরতে পারে, তবে জন্ম জন্ম বেঁচে থাকুক আমার কাঠের বেড়াল।

বাঙ্গালোরে আয়প্পা বলে এক ভদ্রলোকের বেহালা শুনেছিলাম, ও মহীশূরে দেবেন্দ্রপ্পা বলে এক ভদ্রলোকের জলতরঙ্গ শোনা গিয়েছিল। মান্দ্রাজীদের "প্পা"ন্তনামধারী গুণীদের বাজনার মধ্যে নৈপুণ্য যেন একটু বেশি রকমের। বিশেষতঃ বেহালায় এত দক্ষ বাদক বোধ হয় ভারতে আর নেই। তবে আমার দুঃখ হ'ত যে, এত শ্রমস্বীকার করে বেহালা না শিখে, এঁরা যদি কোনও উৎকৃষ্ট ভারতীয় যন্ত্র শিখ্‌তেন! কারণ বেহালায় আমরা যতই কেন না ভাল বাজাই, য়ুরোপীয় বাদকের সমকক্ষ হ'তে কখন পারব না। তারা বেহালা থেকে যে জলদ-গম্ভীর উদাত্ত স্বর বাহির কর্ত্তে পারে, সে রকম আর্ত্ত স্বর আমি কোনও ভারতীয়ের বেহালায় কখনও শুনেছি বলে মনে হয় না। য়ুরোপে Kreisler, Hubermann, Mischa Elman, Veschey, প্রভৃতির মনোমুগ্ধকারী বাজনা যিনি

শোনেন নি, তিনি বুঝবেন না আমি কেন ভারতীয়ের বেহালা বাজনার বিপক্ষে। এক যদি আমরা আশৈশব "য়ুরোপীয় পদ্ধতি অনুসারে" বেহালা শিখি তাহ'লে হয়। কিন্তু তাহ'লে আবার উল্‌টো বিপদ এই হ'য়ে পড়ে যে, আমরা সঙ্গীতে আমাদের বৈশিষ্ট্যটি হারিয়ে ফেল্‌ব, যেমন জাপানের ক্ষেত্রে হয়েছে। জাপানে **public concert** হয় য়ুরোপীয় সঙ্গীতের উপরে। জাপানীরা বাজায় য়ুরোপীয় যন্ত্র ও আলোচনা করে য়ুরোপীয় সঙ্গীত। * য়ুরোপীয় সঙ্গীতের রসগ্রাহী হওয়ার আমি বিরোধী নই, কিন্তু আগে "আমাদের" সঙ্গীতের রসজ্ঞ হ'তে হবে। নৈলে আমার মনে হয় সবই বৃথা। কারণ বিদেশী সঙ্গীতে আমরা স্থায়ী সৃষ্টি কর্ত্তে পারব, এ ভরসা খুবই কম। লাভের মধ্যে হবে এই যে, আমাদের বৈশিষ্ট্যটি আমরা হারিয়ে দেউলে হয়ে বসে থাক্‌ব।

মান্দ্রাজ সহরটি বেশ লেগেছিল। অথচ সমুদ্রই মান্দ্রাজের প্রধান শোভা। মান্দ্রাজের সমুদ্র সৌন্দর্য্যে পুরীর সমুদ্রের চেয়ে হীন নয়, এবং বোম্বায়ের সমুদ্রের চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ। সমুদ্র যদি পুষ্করিণীর মতন শান্ত হয়, তবে তার একটা আলাদা শোভা থাক্‌লেও, সমুদ্রের অশ্রান্ত কল্লোলই যদি না রইল, তবে আর তাকে বোধ হয় সমুদ্র নামে অভিহিত না করাই ভাল।

মান্দ্রাজে **Theosophical Society**র হর্ম্ম্যাবলী ও সংলগ্ন প্রকাণ্ড বাগান একেবারে সমুদ্রের ধারে। এক দিন সেখানে চাঁদিনী রাতে নিমন্ত্রিত হয়ে যাওয়া গিয়েছিল। নানা জাতীয় য়ুরোপীয় নরনারী সমুদ্রতটে **bonfire** কর্চ্ছিল ও কেক আদি ভক্ষণ করতঃ পার্থিব ও অপার্থিব আনন্দের এক মনোজ্ঞ সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টায় নিরত ছিল। আমরা সে দলে মিশে

* Cousin সাহেবের জাপানের সম্বন্ধে পুস্তকখানি দ্রষ্টব্য।

গেলাম। বিবিধ য়ুরোপীয় জাতির জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হ'ল। ভারতীয় সঙ্গীতও হ'ল। সব জড়িয়ে সেদিনকার রাতের স্মৃতিটি বড় মধুর হয়ে উঠেছিল। এক দিকে প্রকৃতির উদার শোভা, চাঁদনী রাত, সমুদ্রের উর্ম্মিরাশির অশ্রান্ত কল্লোল ও খেলাধূলা, অপর দিকে নানা জাতীয় নর-নারীর জাতি-অভিমান ত্যাগ করে একত্র মেলামেশা। বড় সুন্দর লেগেছিল।

মান্দ্রাজে এক দিন এক বড় সঙ্গীত-সমালোচক আমাকে এক সঙ্গীতের আসরে নিয়ে গেলেন। সেখানে সেই চির-একঘেয়ে কর্ণাটী সঙ্গীতের আস্ফালন সেই চিরপরিচিত বিচিত্রভাবে মনকে চির-অবসাদময় ক্লান্তিরসে অভিভূত ক'রে ফেলেছিল মনে আছে। অথচ সে আসরে সকলেই কর্ণাটী সঙ্গীতের সেই তাল নিয়ে মারামারি করার লোমহর্ষক-দৃশ্যে রোমাঞ্চিত হ'য়ে মাথা নাড়ছিল। লক্ষ্যভ্রষ্ট ক'রে মানুষকে কি ভাবে অন্ধ করা সম্ভব সেটা যদি কেউ দেখ্‌তে চান তবে মান্দ্রাজী সমজদারের সঙ্গীত-উপভোগের রীতিটি একটু ভাল ক'রে যেন অনুধাবন করেন।

মনের সেই অবসন্ন অবস্থায় যখন গুণিসম্রাট আবদুল করিম খাঁর গান প্রথম শুন্‌লাম তখন মনে হ'য়েছিল যে চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ কথাটি সত্য বটে।

বর্ত্তমান সময়ে খেয়ালে বোধ হয় আবদুল করিমের ঢং-ই সব চেয়ে প্রাণবন্ত। তাঁর ঢঙের একটা বিশেষ কৃতিত্ব এই যে তিনি কর্ণাটী সঙ্গীতকে বড় মনোহরভাবে আত্মসাৎ ক'রে তাঁর হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে এক অপূর্ব্ব সমন্বয়ে মহিমময় ক'রে তুলেছেন, যেটা ভারতেব অন্য কোনও গুণীর সম্বন্ধেই বলা চলে না। তাঁর গানের শেষভাগে তিনি কখনো কখনো একটু বেশি তানবাহুল্যদোষ কর্‌লেও সেটা করেন শুধু অন্যান্য ওস্তাদদের কাছে খাতির পাবার জন্যে। কসরতের জন্যে কসরত করাই

যে তাঁর গানের মজ্জাগত প্রবণতা নয়, নিজের সৌন্দর্য্যানুভূতির বিকাশের প্রেরণা দ্বারাই যে তা উদ্বুদ্ধ এইটেই তাঁর সঙ্গীতের সব-চেয়ে বড় চরিত্র-লক্ষণ। তিনি খেয়ালীদের বিধিনিবদ্ধ অনড় আইনকানুনের শৃঙ্খলকে তাঁর প্রতিভার পরশ পাথরে নূপুরে পরিণত ক'রেছেন। এক কথায় তাঁর গান তাঁর আত্মপ্রকাশের প্রয়োজন হ'তেই উদ্বুদ্ধ ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা হ'তেই উৎসারিত। তাঁর অনুপম কণ্ঠস্বর তিনি নানা উপায়ে একটু খারাপ করতে কৃতকার্য্য হ'লেও তাঁর স্বরব্যঞ্জনার বিশুদ্ধতার মিষ্টতা অপূর্ব্ব।

আবদুল করিম খাঁর গানের কোথাওই "কিন্তু" ভাব নেই। তিনি যতক্ষণ গান করেন, অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে তন্ময়চিত্তেই গা'ন, শ্রোতার দিকেও তাকান না, তবল্‌চিকেও থেকে থেকে অট্টবাহবা দেন না, অথবা মাঝে মাঝেই খুঁটিনাটি কারণে থেমে গিয়ে রসভঙ্গ করেন না (যে কথা ফেয়াসখাঁ বা চন্দন চৌবের সম্পর্কেও বলা যায় না)।

আবদুল করিম গান করেন সাধকের মতন—কেবল শেষের দিক্‌টায় ছাড়া যখন ব'লেছিই ত' তাঁর কাছে কেন তাঁর কৃতিত্ব দেখানোটাই বড় হ'য়ে ওঠে। সঙ্গীতবিশেষজ্ঞ ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর গান সম্বন্ধে যথার্থ ই লিখেছিলেন যে, তার মধ্যে যে **high tone of seriousness** মেলে তা অন্য কোনও গায়কের গানেই মেলে না। এমন কি শ্রদ্ধেয় অনুপম গুণী রায় সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাহাদুরও (যিনি উচ্চ সঙ্গীতে **creative artist** হিসেবে বোধ হয় এক আবদুল করিম খাঁ ছাড়া আর কারুর চেয়েই কম নন) গান করতে করতে মাঝ পথে থেমে গিয়ে প্রায়ই গানের রসবিকাশের আদর্শ পরিণতির বাধা দেন—অন্যে পরে কা কথা।

আবদুল করিম খাঁর রাগবিস্তারের পদ্ধতিও অপূর্ব্ব ও অনুপম। তিনি অতি ধীরে একটি, দুটি, তিনটি, পরে চারটি এই রকম ক'রে

পরপর স্বর নিয়ে অতি সূক্ষ্ম তানের মালা গেঁথে চলেন। ফলে তাঁর রাগবিস্তারের মধ্যে যে পরিপূর্ণ তৃপ্তিটি উজ্জ্বল হ'য়ে ধরা দেয়, সে-রকম গভীর তৃপ্তি অন্য কারুর গানেই মেলে না। সময়ে সময়ে তিনি তাঁর গানে যে এক আকুল উদাত্ত স্বরদ্যোতনা ফুটিয়ে তোলেন তারও তুলনা নেই। তাছাড়াও তানবৈচিত্র্যও তাঁর অনুপম ও প্রাণোন্মাদী। কখনও বা হলফ তান, কখনও সগমক তান, কখনও মিড়, কখনও স্বরের প্রশান্তি, কখনও মনোহর স্বর-দোলানো—কত রকমই না তিনি করেন! এক কথায় তিনি একঘেয়ে নন; তিনি সঙ্গীতের আর্টে বৈপরীত্য বা contrastএর বর্ণসম্পাতের মূল্য সম্বন্ধে পূর্ণভাবে সচেতন। তাই বোধ হয় তিনি তাঁর খেয়ালে ঠুংরির তানও দেন টপ্পার গিট্‌কারীও আমদানী করতে ছাড়েন না। এজন্য গোঁড়া খেয়ালীরা অবশ্য তাঁকে নিন্দা করতে ছাড়েন না (আমাদের দেশে এক ওস্তাদ কবে অন্য ওস্তাদকে সুখ্যাতি করেন?) কিন্তু এরূপ স্বাধীনতার ফলে যে তাঁর সঙ্গীত কত সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে তা সুরের অনুরাগীদের কাছে এক মুহূর্ত্তেই স্পষ্ট হ'য়ে না উঠেই পারে না। এক কথায় তাঁর সঙ্গীতের মধ্যে জীবনের স্পন্দন আছে, তা গতানুগতিকতা-সর্ব্বস্ব নয়। তাই ভবিষ্যৎ সঙ্গীতকারদের মধ্যে তাঁর সৃষ্টিপ্রতিভা ও নতুন ঢঙের দৃষ্টান্ত যে একটা জীবনের স্রোত আন্‌বেই আন্‌বে একথা মনে করার খুবই কারণ আছে।

বাঙ্গালোর থেকে পুনায় আসা গেল। পুনায় আসার দুটো উদ্দেশ্য ছিল; একটা বিখ্যাত আবতুল করিমের কন্যার গান শোনা ও আর একটা মহাত্মাজীর সঙ্গে পুনা হাঁসপাতালে দেখা করা। ১৯২৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী পুনায় পৌঁছাই। মহাত্মাজী তখনও শয্যাশায়ী। শুন্‌লাম্, তাঁর সঙ্গে হাঁসপাতালে লোকজনকে দেখা কর্ত্তে দিচ্ছে। এ সুবিধা ছাড়া নয়।

পুনায় শুন্‌লাম আবতুল করিম খাঁর কন্যা রীতিমত গানের চর্চ্চা ক'রে থাকেন। গেলাম ও ঘণ্টা দেড়েক গান শোনা গেল।

করিম কন্যার গান বাস্তবিকই শোন্‌বার মতন। কিন্তু তা সত্ত্বেও গিয়ে যখন দেখ্‌লাম যে, তাঁর বয়স নিতান্ত কম (১৯[redacted] হবে), তখন মনে হয়েছিল যে, পয়সা দিয়ে এঁর গান শুন্‌তে না এলেই হ'ত। কারণ, গানবাজনা সম্বন্ধে আশৈশব চর্চ্চা করে এটা এখন বেশ বোঝা গেছে যে, ছেলেমানুষের গানে চিত্তাকর্ষক উপাদান যথেষ্ট থাক্‌তে পারে, কিন্তু উচ্চতম সঙ্গীতের আসল রসটি তার মধ্যে পূর্ণভাবে মূর্ত্ত হয়ে উঠতেই পারে না। কারণ, গানে দরদ জিনিসটি যে কি, সেটা বুঝতে হলে বয়সের পরিণতি হওয়ার প্রয়োজন। ছেলেমানুষ কিন্তু সঙ্গীতে রসবিকাশের সঙ্গে বয়সের পরিণতির যথার্থ সম্বন্ধ বুঝতে পারে না। আবতুল করিমের কন্যাও দেখ্‌লাম এ জিনিষটা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম কর্ত্তে পারেন নি। তবে তা সত্ত্বেও তাঁর গান যে শোন্‌বার মতন মনে হ'ল, তার কারণ, প্রথমতঃ করিম-কন্যার গানের চাল অবিকল তাঁর পিতার চালের অনুরূপ, ও দ্বিতীয়তঃ, তাঁর গলায় তানের কাজ বাস্তবিকই আশ্চর্য্য। আশা হ'ল যে, যদি পরে তাঁর কখনও চোখ ফোটে যে, নিছক অনুকরণে শ্রোতাকে আশ্চর্য্য করা

যেতে পারে ও নিজের গ্রহণ করার ক্ষমতার প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু সঙ্গীতে প্রকৃত রসসৃষ্টি করা যায় না,—তখন হয় ত তিনি তাঁর পিতার মতন না হোক, একজন অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর শিল্পী হ'য়েও গড়ে উঠতে পারবেন।

২রা ফেব্রুয়ারী সকালে মহাত্মাজীর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে গেলাম। আমি যে সঙ্গীতের একজন উৎসাহী ছাত্র, এ কথা মহাত্মাজীর কাছে প্রকাশ করে ফেলেছিলেন—শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর এক কন্যা। তিনি মহাত্মাজীর বিছানার পাশে বসে তাঁর সঙ্গে গল্প করছিলেন। আমি সঙ্গীতের ছাত্র শুনে, মহাত্মাজী সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করলেন। মীরাবাইয়ের সুন্দর গানগুলির সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে কি না জিজ্ঞাসা করাতে, মহাত্মাজী বল্‌লেন, "খুব আছে। আমি মীরার অনেক গানই শুনেছি ও তাঁর অনেক গানেরই আমি ভক্ত। গানগুলি এত সুন্দর কেন, না, সেগুলি লোককে খুসি করার উদ্দেশ্যে রচিত হয় নি—হৃদয়ের নিহিত আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত্ত করে তোল্‌বার প্রেরণায় রচিত।"

মহাত্মাজী কুণ্ঠিত ভাবে বল্‌লেন, "তোমাকে তোমার গান শিক্ষা সম্বন্ধে প্রশ্নবাদ করছি, আমার তাতে একটু স্বার্থ আছে ব'লে। আমি সঙ্গীত বড় ভালবাসী, যদিও সঙ্গীতের সমজদার নই। দক্ষিণ আফ্রিকায় একবার আমি আহত হয়ে হাঁসপাতালে ছিলাম। সেখানে আমার এক বন্ধুর কন্যা আমার অনুরোধে প্রায়ই **Lead kindly light** গানটি গাইতেন। তাতে আমার যেন অর্দ্ধেক যন্ত্রণা কমে যেত। তাই আমার অনুরোধ, তুমি যদি আমাকে দয়া করে সন্ধ্যাবেলা একটু গান শুনিয়ে যাও।"

উত্তরে অবশ্য আমি মহাত্মাজীকে বলেছিলাম যে, তাঁর মতন

লোককে যদি গান গেয়ে আমি সামান্য আনন্দও দিতে পারি, তবে সেটা আমি নিজের সৌভাগ্য বলে মনে করব। তাতে মহাত্মাজী যেন পুনরায় কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। যাই হোক্, তিনি আমাকে সেই দিন সন্ধ্যায় একটু নিরিবিলি সময়ে আস্‌তে বল্‌লেন। তবে বলেই তিনি ঘরের য়ুরোপীয় পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা কর্লেন যে, সন্ধ্যায় গান কর্লে হাঁসপাতালের অন্যান্য রোগীদের কোনও অসুবিধা হবে কি না। এ প্রশ্ন করাটাও মহাত্মাজীর চরিত্রের অপরের সুবিধা অসুবিধা ভাবা-রূপ মনোহর দিক্‌টার পরিচয় দিয়েছিল। এ সব ছোটখাট ঘটনার মধ্য দিয়ে আসল মানুষটির যে পরিচয়টি পাওয়া যায়, বড় বড় ঘটনার মধ্য দিয়ে অনেক সময়ে সে পরিচয়টি পাওয়া দুর্ঘট হয়ে ওঠে। কারণ, জীবনে বড় বড় ঘটনার সময়ে লোক-চক্ষুর সাম্‌নে আসার কল্পনায় আমরা প্রায়ই সতর্ক হয়ে চ'লে থাকি। কিন্তু ছোটখাট ঘটনায়ই আমরা নিজ মূর্ত্তি ধরি, যেহেতু না ধরেই পারি না। তাই আমার মনে হয় যে, কোনও মহৎ লোককে বুঝতে হলে, তাঁর জীবনের দৈনিক খুঁটিনাটি আচরণ লক্ষ্য করার মূল্য আমরা সচরাচর যথেষ্ট পরিমাণে দিই না।

সন্ধ্যাবেলা মহাত্মাজীর ঘরে একটি তানপুরা নিয়ে প্রবেশ করলাম। ঘরে শ্রীমতী কস্তুরীবাই গান্ধি, রাজগোপালাচারিয়া ও মহাদেও দেশাই ছিলেন। আমি মীরাবাইয়ের "চাকর রাখোজী" বলে একটি ভজন ও বৃন্দাবন সম্বন্ধীয় "দীন দয়াল গোপাল হরি" বলে একটি পূরবী গাইলাম।"

গান শুন্‌তে শুন্‌তে মহাত্মাজীর প্রশান্ত উজ্জ্বল চোখ দুটি যেন অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল কারণ সেই স্তিমিত আলোকেও তাঁর চোখ দুটি চক্ চক কর্ত্তে লাগল। মনে আছে, সেদিন গান করে মহাত্মাজীকে

এতটা আনন্দ দিতে পেরেছিলাম বলে, মনটা আনন্দে ভরে উঠেছিল। যাঁর আজীবনের সাধনা—পরের উপকার, যাঁর জীবনই—পরের জন্য, তাঁর ঋণ যে আমাদের অপরিশোধ্য। তাই বুঝি তাঁকে আমাদের সাধ্যমত যৎসামান্য কিছু অর্ঘ্য দিতে পারলেও মন হর্ষে বলে ওঠে যে, একটা কাজের মতন কাজ হ'ল।

খানিকক্ষণ সকলেই চুপ করে রইলেন। মহাত্মাজী আমাকে একটি ছোট্ট নমস্কার কর্‌লেন, কোনও কথা বল্‌লেন না। বুঝলাম, তৃপ্তিরসটি তাঁর কাছে সত্য হয়েই ধরা দিয়েছে; তাই কথায় তাকে প্রকাশ করে তাকে ছোট করতে চাইলেন না। তখন মনে হ'ল যে, বিশুদ্ধ সঙ্গীত হোক্ বা না হোক্, ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীত (যেটাও একটা মহৎ সঙ্গীত) বোধ হয় মহাত্মাজীকে সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি স্পর্শ করে।

খানিক পরে আমি বল্‌লাম: "আমাদের স্কুল কলেজে আমাদের অপূর্ব্ব ভারতীয় সঙ্গীতের যে কোনও স্থানই আজ অবধি করা হয় নি, এটা বড় আক্ষেপের বিষয় বলে আমার মনে হয়।" মহাত্মাজী বল্লেন, "নিশ্চয়ই এবং আমি বরাবরই এ কথা বলে এসেছি।" মহাদেও দেশাই সায় দিলেন যে, মহাত্মার মত এই রকমই বটে।

আমি বল্‌লাম: "আমি এ কথা শুনে বড় খুসি হ'লাম। কারণ, আমার বরাবরই একটা ধারণা ছিল যে, আপনি সঙ্গীত বা অন্যান্য সুকুমার কলার বিরোধী।"

মহাত্মাজী সবিস্ময়ে বলে উঠ্‌লেন: "আমি সঙ্গীতের বিরোধী! আমি!" বলেই খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। তার পর প্রশান্ত ভাবে একটু হেসে বল্‌লেন, "বুঝেছি, বুঝেছি। আমার সম্বন্ধে নানা লোকের মনে এত রকম ভুল ধারণা আছে যে, এখন সে সব ধারণার

মূলোৎপাটন করা কঠিন হয়ে পড়েছে। ফলে হয়েছে এই যে, আমার বন্ধুরা হাসেন, যখন আমি বলি যে, আমি নিজেকে একজন আর্টিষ্ট মনে করি।"

আমি বল্‌লাম, "এ কথা শুনে আমি ভারি আশ্বস্ত হ'লাম। কারণ আমার মনে হ'ত যে আপনি জীবনকে গড়ে তুল্‌তে চান শুধু ত্যাগের মন্ত্র দিয়ে—**asceticism**এর প্রভাব দিয়ে, যার মধ্যে সঙ্গীতের ন্যায় আর্টের কোনও স্থান নেই।"

মহাত্মাজী সজোরে বলে উঠ্‌লেন: "কিন্তু আমি বল্‌তে চাই যে **asceticism** হচ্ছে জীবনের একটি সর্ব্বপ্রধান আর্ট।"

মহাত্মাজীর এ কথার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হওয়া আমাদের পক্ষে একটু কঠিন না হয়েই পারে না। কারণ, asceticism সম্বন্ধে অরবিন্দ যা বলেছেন, সেইটাই আমার কাছে চরম কথা বলে মনে হয় (**the Life Divine**)। তিনি দেখিয়েছেন যে, মানব-সমাজের ক্রমবিকাশে এক সময় ছিল, যখন দৈনিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দাবী-দাওয়া কাটিয়ে ওঠবার জন্য একদল লোকের সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে সমাজের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে যোগী হয়ে বসে থাকার দরকার ছিল। কিন্তু আজ মানুষের বোঝার সময় এসেছে যে, সমাজের দাবী অবহেলা করে শুধু নিজের মুক্তির জন্য ব্যস্ত হলে, তাতে জীবনে কোনও মহনীয় সম্পূর্ণতাই অর্জ্জন করা যায় না। তা যদি যেত, তবে সৃষ্টির এই অজস্র বাহুল্যের কি দরকার ছিল? তাহলে স্বতঃই স্বীকার করে নিতে হয় যে, মানুষের জীবনে নিত্য নূতন সৃষ্টি করার যা-কিছু প্রচেষ্টা সবই শুধু মরীচিকার পিছনে ছোটা। **Asceticism** মানে—এ জগৎটা কিছুই না। এই কথাই যদি মানুষের অভিজ্ঞতার চরম বাণী হয়, তাহ'লে স্বতঃই মনে প্রশ্ন ওঠে যে এ

জগৎ সৃষ্ট হবার দরকারটা কি ছিল? তাই মনে হয় যে asceticismএর যে মহৎ দিক্‌টা আছে, সেটা হচ্ছে এই যে, মানুষকে তার দেহের দাসত্ব হতে মুক্তি লাভ কর্ত্তে হবে। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, মানুষ আজ অবধি মনোজগতে যা কিছু বিরাট্‌ ও রমণীয় সৃষ্টি করেছে, সে সবই মায়া মাত্র। অরবিন্দ সত্যই বলেছেন যে, আমাদের এরূপ philosophyর ফল হয়েছে "A great bankruptcy of Life." (The Life Divine) তাঁর এ কথাটি আমার খুবই গভীর সত্য বলে মনে হয় যে, "We must accept the manysidedness of the manifestation even while we assert the unity of the Manifested." (ঐ)

যাই হোক্‌, আমি মহাত্মাজীর তখনকার দুর্ব্বল শরীরের অবস্থা দেখে, এ বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে তর্ক করাটা উচিত মনে কর্লাম না। কারণ, আমার উদ্দেশ্য ছিল, আর্ট বল্‌তে আমরা সচরাচর যা বুঝি, সে সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানা। তাই আমি বল্‌লাম "তা হতে পারে, কিন্তু আমি এখন আর্ট বল্‌তে বুঝেছিলাম, সঙ্গীত বা চিত্রকলা বা অনুরূপ কোনও ললিত কলা। এবং আমি বল্‌তে চেয়েছিলাম যে, এরূপ সৃষ্টির আপনি বিরোধী বলেই আমার ধারণা ছিল।"

মহাত্মাজী আবার বলে উঠলেন: "আমি সঙ্গীতের মতন সুকুমার কলার বিরোধী! আমি ত সঙ্গীতকে বাদ দিয়ে ভারতের আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশের কথা কল্পনাই কর্‌তে পারি না। আমি যে সঙ্গীতাদি ললিতকলার ভক্ত, এ কথা আমি খুব জোর করেই বল্‌তে চাই। কেবল এ সম্বন্ধে এ সব ললিতকলার কিরূপ বিকাশ কাম্য, সে বিষয়ে আমি প্রচলিত মতের সমর্থন করি না, এই মাত্র। যেমন, আমি তাকে আর্ট বলি না, যা উপভোগ কর্‌তে

হ'লে, তার গঠনপ্রকৃতির (technique) সঙ্গে বিশেষ পরিচয় লাভ করা অপরিহার্য্য। তুমি যদি সত্যগ্রহ আশ্রমে যাও, তবে দেখতে পাবে যে তার দেওয়ালগুলি খালি। আমার বন্ধুরা আপত্তি করেন আমি ছবি রাখি না ব'লে। কিন্তু আমি রাখি না, কারণ, আমি মনে করি, দেওয়াল তৈরী হয়েছে আমাদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য। কিন্তু তা থেকে প্রমাণ হয় না যে, আমি আর্টের বিরোধী। আমি কত সময়ে নক্ষত্রখচিত নীলাকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে থাকি! এবং আমি জিজ্ঞাসা করি যে, এ গরিমাময় দৃশ্যের পাশে কি মানুষের সৃষ্ট কোনও ছবি দাঁড়াতে পারে?—এ বিরাট্ আকাশের মহিমময় দৃশ্য আমাকে তার রহস্যে অভিভূত করে দেয়, ও আমার মনে পুলক-শিহরণ জাগিয়ে তোলে। ঈশ্বরের এ অপূর্ব্ব শিল্পের পাশে কি মানুষের সৃষ্ট শিল্প তুচ্ছ ও নগণ্য বলে মনে হয় না?"

এ কথার উত্তরে আমার বল্‌বার ছিল যে, যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, প্রকৃতি মানুষের চেয়ে বড় শিল্পী—তাহলেও মানুষ যে প্রকৃতির সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নিজের সৃষ্টিও কেন উপভোগ কর্‌তে পারবে না, তার ত কোনও সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। একটাকে ভালবাস্‌তে হলে অপরকে যে বর্জ্জন করতেই হবে, এটা মেনে নেওয়া কি একটু কঠিন হয়ে পড়ে না—যেমন মহাত্মাজীর আশ্রমের দেওয়াল খালি রাখার ক্ষেত্রে? পরমহংস দেবের এ কথাটি কি খুব গভীর নয় যে, "একঘেয়ে কেন হব?" নক্ষত্র ও ছবি দুই-ই কেন না উপভোগ করব? তবে মহাত্মাজী যে টল্‌ষ্টয়ের একজন বিশেষ ভক্ত ও এগুলি যে টল্‌ষ্টয়ের মতামত তা আমি বিলক্ষণ জান্‌তাম বলে, আমি মহাত্মাজীর সঙ্গে আমাদের মতের মিলের দিকটার উপরই জোর দিয়ে যাওয়া শ্রেয়ঃ মনে কর্‌লাম। কারণ, অন্যথা তর্কের বহর অত্যন্ত বড় হয়ে দাঁড়াবার সম্ভাবনা ছিল। তাই আমি বল্‌লাম:—

"প্রকৃতি যে একজন অতি উচ্চদরের শিল্পী, সে সম্বন্ধে আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। আপনি যে আর্টের অপচার ও ব্যভিচারের উল্লেখ করেছেন, সেটার অনৌচিত্য সম্বন্ধেও আপনার সঙ্গে আমার মতভেদ নেই। তাছাড়াও আমার নিজের মনে হয় যে, আজকাল যে একদল তথাকথিত আর্টিষ্টের সৃষ্টি হয়েছে যাঁরা বলেন যে আর্ট জীবনের চেয়ে বড়, তাঁরাও ভ্রান্ত।"

মহাত্মাজী সোৎসাহে বলে উঠলেন: "ঠিক কথা। জীবন নিশ্চয়ই সব আর্টের চেয়েই বড় এবং চিরকাল বড়ই থাক্‌বে। এ বিষয়ে আমি আরও বেশি দূর যাই ও বলি যে, সে-ই সব চেয়ে বড় আর্টিষ্ট যে সব চেয়ে মহৎ ভাবে জীবন কাটায়। কারণ, যে আর্ট মহৎ জীবনের ফল নয়, সে আর্টের মূল্য কতটুকু? আমি কেবল সেই আর্টকেই বড় বলি যে আর্ট মানব-জীবনকে মহত্তর করে। তাই যখন কেউ কেউ বলেন যে, আর্টই সব ও জীবন কেবল তার বিকাশের যন্ত্র মাত্র, তখন আমার সমস্ত অন্তরাত্মা ব'লে ওঠে যে, এ হ'তেই পারে না। তখন আমি বল্‌তে বাধ্য হই যে, আমার আর্টের ধারণা সম্পূর্ণ আলাদা রকমের। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, তখন লোকে তা থেকে এই সিদ্ধান্ত কর্‌তে দ্বিধা বোধ করে না যে, আমি সর্ব্বপ্রকার আর্টেরই বিরোধী!"

এ সব মতামতের সম্বন্ধে মনে হয় যে, মহাত্মাজী শিল্পী ও মহৎ লোকের একই সংজ্ঞা দিয়ে একটি গোলমালের সৃষ্টি ক'রেছেন। অর্থাৎ যেখানে তিনি বল্‌ছেন যে শিল্পী সে-ই যে সব চেয়ে মহৎ জীবন উদ্‌যাপন করে, সেখানে তিনি এই কথা বল্‌লে আর কারও কিছু বল্‌বার থাক্‌ত না যে, মানুষের শ্রদ্ধার রাজ্যে মহাপ্রাণ লোকের স্থান নিছক্‌ শিল্পীর চেয়ে ঊর্দ্ধে। যেমন, এ কথা বলা যেতে পারে যে, বুদ্ধ ছিলেন একজন মহাত্মা ও তানসেন বা ভবভূতি ছিলেন শিল্পী; তবে বুদ্ধ আমাদের কাছে অধিক সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র।

মহাত্মাজীর আর্ট সম্পর্কে মতামতগুলি প্রায় সবই টলষ্টয়ের মতামতের প্রতিধ্বনি, এ কথার পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। এ শ্রেণীর মতামতের সঙ্গে আমাদের মতামত সম্পূর্ণ মেলে না। তবে সে আলোচনা ইতিপূর্ব্বে নানা প্রসঙ্গে করেছি বলে, আজ এ সম্পর্কে শুধু এই কথা বলেই ক্ষান্ত হব যে, মহাত্মাজী আমাদের আগেকার যুগের সেই সম্প্রদায়ের লোক, যাঁরা জীবনকে নিতান্তই সহজ সরল করে ফেলাই জীবন-সমস্যার যথার্থ সমাধান বলে মনে কর্ত্তেন। তবে মনে হয় যে, জীবনকে এভাবে দেখার চেষ্টা করাটা মোটের উপর অসত্য ও অগভীর। কালের অতিপাতে নিত্য নূতন স্রোতের আমদানী হচ্ছে। সৃষ্টির একটা নিহিত প্রেরণা হ'তেই বৈচিত্র-বাহুল্যের উদ্ভব। সব কেটে-ছেঁটে আমরা আমাদের জীবনকে বা আমাদের চিন্তাধারাকে কখনই আবার আগের মতন সহজ ও সরল করে আন্‌তে পারব না, এবং সেটা বাঞ্ছনীয় বলেও মনে হয় না। সৃষ্টি হচ্ছে—প্রকৃতির বিকাশ। সৃষ্টি হচ্ছে প্রকৃতির মধ্যে যা কিছু অপ্রকাশ আছে তাকে প্রকাশ কর্ব্বার, যা কিছু অব্যক্ত আছে তাকে ব্যক্ত করবার, যা কিছু অমূর্ত্ত আছে তাকে মূর্ত্তিমতী করে তোল্‌বার একটা অফুরন্ত প্রচেষ্টা। এ প্রচেষ্টা কেন, তা আমরা আজ অবধি জান্‌তে পারি নি—হয়ত একদিন জান্‌তে পারব—কিন্তু প্রকৃতির এ প্রয়াস যে নিত্যই নব নব দিকে উন্মেষলাভ করছে, তা বোধ হয় অস্বীকার করা চলে না। এ কথা যদি সত্য হয় তাহ'লে এ সব নূতন নূতন স্রোতকে কাটিয়ে যাওয়াকে কেমন ক'রে বড় করে দেখা যেতে পারে? এই কাটিয়ে যাওয়াটাই কি এ নূতনের যথার্থ আবাহন? বরং এই কথাই ত বেশি যৌক্তিক মনে হয় যে, আমাদের বর্ত্তমান বিকাশ এই জটিলতার দরুণই সম্ভবপর হয়েছে। বর্ত্তমানের নূতন স্রোতের ফলেই ভবিষ্যতের বিকাশ। জটিলতায় কি যায় আসে? আসল কথা harmonyর প্রকার-ভেদ নিয়ে। প্রত্যেক

জীবনই ত এই harmonyর খোঁজে ছুটেছে। জীবনে জটিলতা যত বেশি হয়, তার ফলে যে harmonyর সৃষ্টি হয়, তার তৃপ্তিরসও তত গভীর হয়ে ওঠে। তাই জীবনকে জোর করে সহজ ও সরল করা কাম্য বা প্রকৃতির অভিপ্রেত বলে মনে হয় না। মহাত্মাজীর নিজের জীবনের পরিণতিই কি তুকারাম বা তুলসীদাসের চেয়ে বেশি জটিল নয়? এবং আশা করি, অল্প লোকেই বল্‌বে যে, পুরাকালের এরূপ গ্রাম্য সরল ভক্ত ব্রাহ্মণের জীবনের পরিণতি ভক্ত মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর জীবনের পরিণতির চেয়ে বেশি বাঞ্ছনীয় ও বেশি গভীর ছিল। "What is, is the realisation of an anterior potentiality; present potentiality is a clue to future realisation." (The Life Divine—অরবিন্দ)

আমেদাবাদ সঙ্গীত-সম্মেলন

১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ৯ই, ১০ই ও ১১ই তারিখে আমেদাবাদে একটি সঙ্গীত-সম্মেলন হয়েছিল। ভাতখণ্ডে মহোদয়কে এ সম্মেলনের কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বল্‌লেন যে এরূপ সম্মেলনে তাঁর নিমন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও তিনি যেতে পারেন না, যেহেতু এটি হচ্ছে একটি সাম্প্রদায়িক সঙ্গীত-সম্মেলন, নিখিল ভারতীয় সম্মেলন নয়। বস্তুতঃ এ সম্মেলনটি বম্বের খ্যাতনামা বিষ্ণুদিগম্বর মহাশয়ের দ্বারাই আহূত হয়েছিল। ভাতখণ্ডে মহোদয় বল্‌লেন যে, এ সম্মেলনে কাজে কাজেই বিষ্ণুদিগম্বরের

একাধিপত্য না মেনে নিলে হবে না, তাঁর স্বরলিপি-পদ্ধতির অনুমোদন না করলে চল্‌বে না, মুখ্য বিষয়গুলিতে তাঁর মতে সায় না দিলে আলোচনাদিতে যোগদান করা যাবে না। তাছাড়া এ সম্মেলনে বড় বড় গায়ক বড় একটা কেউই আস্‌বে না। বিভিন্ন প্রদেশস্থ গায়ক বাদক যারা আস্‌বে তারা অধিকাংশ স্থলেই বিষ্ণুদিগম্বর মহাশয়ের ছাত্র। কাজেই এ সম্মেলনের উদ্দেশ্য ধর্‌তে গেলে তাঁরই পদ্ধতি ও শিক্ষাপ্রণালীর নমুনা জাহির করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কথাগুলি শুনে তখন বড় দমে গিয়েছিলাম। কিন্তু পরে গিয়ে দেখলাম যে ভাতখণ্ডে মহোদয়ের কথা সম্পূর্ণ সত্য নয়, যদিও খানিকটা সত্য বটে। কারণ ভারতবর্ষের দুই একজন বড় গাইয়ে বাজিয়ে যে আসেন নি এমন নয়। আমি বর্ত্তমানে তাঁদের মধ্যে শুধু একজনেরই গানের আলোচনা করব। তাঁর নাম বিখ্যাত সঙ্গীতরত্নাকর আল্লাবন্দে খাঁ।

তাঁর গান হচ্ছে ধ্রুপদ এবং এ ধ্রুপদ আলাপের প্রধান বৈশিষ্ট্য—এতে গমকের প্রাচুর্য্য।

এরূপ হৃৎস্তম্ভনকারী গমক আমি কখন শুনি নি। এর মধ্যে একটা গাম্ভীর্য্য আছে বটে কিন্তু বড় একঘেয়ে ও সুরের কোনও বালাই আছে বলে মনে হ'লনা। মিষ্টত্ব ও আর্ট হিসেবে বাংলাদেশের ধ্রুপদের বাইরে নাম আছে।

আমারও মনে হ'ল যে খাঁ সাহেবের অভ্রভেদী নাম সত্ত্বেও তাঁর ধ্রুপদে বাংলাদেশের ধ্রুপদের মত আর্ট তত নেই, আছে নৈপুণ্য। তাছাড়া তাঁর কণ্ঠস্বর মিষ্ট ছিল না ও মুদ্রাদোষ এতই বেশি ছিল যে তাতে নিরপেক্ষ রসগ্রাহীর রসগ্রহণের সহায়তা মোটেই হয় নি। এ সভার কোনও বাজিয়ের অতি হাস্যকর মুদ্রাদোষ দেখে যখন সে সময়ে সভার মধ্যে হাসির হররা পড়েছিল তখন আমার পার্শ্বোপবিষ্ট একটি ছোট ছেলে

অত্যন্ত সরল বিস্ময়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে তাঁর উদ্দেশ্য কি লোককে হাসানো ? আমাদের সঙ্গীতে বিসদৃশ ও হাস্যকর মুদ্রাদোষ-বাহুল্যের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে, এ প্রশ্নটির সারল্যে তাঁর চোখ ফোটা উচিত। অভ্যাসবশে আমরা ক্রমে ক্রমে অসুন্দর অঙ্গভঙ্গীতে অভ্যস্ত হয়ে যাই বটে কিন্তু তাতে যে কলাকারুর হানি না হয়েই পারেনা বালকের সরল প্রশ্নটি সে সম্বন্ধে আমাদের চোখ ফুটিয়ে দিতে পারে।

খাঁসাহেবের গান পরে আরও একদিন এক কোটিপতির বাড়ীতে শোনবার সুযোগ হয়েছিল, কিন্তু তাতে আমি মুগ্ধ হতে পারিনি। এবং সঙ্গে সঙ্গে এ চালের গান লোপ পেতে বসেছে ভেবে তাতে দুঃখবোধ কর্ত্তেও পারিনি। খুব কম লোকই বোধহয় এ গানের নমুনা শুনে এর বিরলতায় দুঃখবোধ করবেন। সঙ্গীত যে মল্লযুদ্ধ নয়, তা যে মানুষের সৌন্দর্য্যানুভূতির অভিব্যক্তি এ সত্যটি উপলব্ধি করার সময় এসেছে। অবশ্য অনভিজ্ঞের কাছে মনোজ্ঞ তান-বিস্তারও হয়ত অনেক সময়ে অ-সুন্দর মনে হতে পারে ; তাই সৌন্দর্য্যানুভূতির বিকাশ মাত্রই যে সকলের মনে সাড়া দেবেই দেবে এমন কথা জোর করে বলা যায় না। গানের মধ্যে নিহিত সৌন্দর্য্য উপভোগ কর্ত্তে হলে ভাল গান বাজনা শোনা একটু অভ্যাস কর্ত্তে হয়। ভাল শিল্পীর সৃষ্টির সঙ্গে পুনঃপুনঃ পরিচয়ই তার রসবোধের একমাত্র শিক্ষা। তাই আমি একথা বল্‌তে চাইনা যে উচ্চ সঙ্গীত সকলেরই ভাল লাগতে বাধ্য। তবে একথা বোধ হয় বলা যায় যে মানুষ শিল্পে অলঙ্কারকে এমন বাড়িয়ে ফেলতে পারে যাতে তার গাম্ভীর্য্য ও গরিমা নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাবন্দে খাঁর মল্লযুদ্ধ দেখে আমি কথাটি আরও ভাল করে উপলব্ধি করেছিলাম। তাঁর নাদপ্রধান গমকের প্রাচুর্য্য ছিল এতই বেশি যে তা বেসুরো বলে মনে না হ'য়েই উপায় ছিল না। পরে একজন খুব বড় ওস্তাদের কাছে শুনেছিলাম যে খাঁ

সাহেবের সুরের জ্ঞান বাস্তবিকই কম। কিন্তু এক ওস্তাদ সচরাচর অপর ওস্তাদকে প্রশংসা করেন না বলে শেষোক্ত ওস্তাদের এ কটাক্ষে কোন আস্থা স্থাপন না করাই বোধহয় ভাল। তাই আমার মনে হয় যে খাঁ সাহেবের গান আমার কাছে বেসুরো শুনিয়েছিল এ সরল সত্যটি বলাই শ্রেয়ঃ।

মোটের উপর আমেদাবাদ সঙ্গীত-সম্মেলনে শিক্ষনীয় যথেষ্ট ছিল, যদিও উপভোগ্য সঙ্গীত বড়ই কম ছিল। শিক্ষনীয় বিষয়ের মধ্যে একটি তথ্য ছিল এই যে আমাদের দেশে গায়কের মধ্যে ওস্তাদ যেমন কম, ওস্তাদের মধ্যে শিল্পী তার চেয়েও কম। আবদুল করিম, শেষণ, হাফেজ আলি খাঁ প্রমুখ দুচার জন মাত্র সত্যকার স্রষ্টা আজ বিদ্যমান। বাকী সব ওস্তাদদের মধ্যে আছে বেশির ভাগ মুদ্রাদোষের অতিচার, তানালাপের ব্যভিচার ও সঙ্গীতে গাম্ভীর্য্যের অপচার। কথাটা হয়ত একটু বেশি কঠোর শোনাতে পারে কিন্তু তাহলেও কথাটি সত্য। সমগ্র ভারত ঘুরে আমার এ বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে যে আমাদের সঙ্গীতের অবস্থা আজ মুমূর্ষু—অর্থাৎ সঙ্গীতের মধ্যে সত্যকার শিল্পের অবস্থা। অশিক্ষিত পেশাদারের হাতে সঙ্গীতের সহস্রদল যে প্রস্ফুটিত হতে পারেনা এ সত্যটি সম্বন্ধে সচেতন না হলে আমাদের সঙ্গীতের মুক্তি নেই। তবে এ সম্বন্ধে পরে বিস্তৃতভাবে লিখব।

আমেদাবাদে ছিলাম একজন ধনী ব্যবসায়ীর বাটীতে অতিথি হ'য়ে। বড়মানুষরা সংসারে এক জাতই আলাদা—সাধারণের এ ধারণাটা বোধ হয় সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। তবে আমার গুজরাতী host ভদ্রলোককে এ সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হিসেবেই গণ্য কর্ত্তে হয়েছিল। তাঁর মধ্যে সত্যকার অমায়িকতা, ধনের আড়ম্বর জাহির করার অনিচ্ছা, অনুগত সকলের প্রতিই সদয় ব্যবহার, ও সর্ব্বোপরি cultural জিনিষের উপর শ্রদ্ধা—আমাকে বাস্তবিকই বড় তৃপ্তি দিয়েছিল। ভারতবর্ষে এঁর মতন অগাধ অর্থ বোধ হয় খুব অল্প লোকেরই আছে, কিন্তু তবু আশ্চর্য্য এই যে, (১) ইনি পড়াশুনো করে থাকেন, (২) নিজের ধনাগমের উদ্ভাবনী শক্তির কথা অভাগ্য অভ্যাগতের উপর বর্ষণ করেন না ও (৩) ধন লাভের চিত্তাকর্ষক উপায়গুলি ছাড়াও অন্য অনেক নিষ্প্রয়োজন জগতের খবর রাখেন। তাঁর মনোরম অট্টালিকার মধ্যে আমার সব চেয়ে ভাল লেগেছিল তিনটি জিনিষ : প্রথম, তাঁর সুরম্য বাগান, দ্বিতীয়, তাঁর সন্তরণ-হর্ম্ম্য (**swimming bath**) ও তৃতীয়, তাঁর পুস্তকাগার।

তাঁর সাঁতার দেবার ঘরটি প্রস্তর-নির্ম্মিত ও ২।১ দিন অন্তর পরিষ্কার জলে পূর্ণ করা হ'ত। তাতে তিনি তাঁর ছোট ছোট পুত্র কন্যা নিয়ে যখন একত্রে নেমে সাঁতার দিতেন, তখন তাঁদের সঙ্গে যোগদান করাটা ভারি উপভোগ্য ছিল। তাঁর প্রকাণ্ড বাগানটিও ছিল অতি মনোরম। তাঁর সুরুচির এখানে একটা মস্ত সার্থকতা মিলেছিল। অর্থব্যয় যদি সুরুচির দিকে দৃষ্টি রেখে করা যায়, তবে তার মধ্যে বোধ হয় সে ব্যয়ের অনেকটা সার্থকতা মেলে। অন্ততঃ দানের পরেই সত্য সত্য culture এর

দিকে অর্থব্যয়টা বোধ হয় সব চেয়ে বেশি প্রশস্ত। এঁর কুঞ্জবন-ফলফুল-শোভিত বাগানে রোজ প্রত্যূষে গান কর্ত্তে কর্ত্তে বেড়াবার সময় পারিসের একজন কোটীপতির বাগানের কথা মনে পড়ত। অবশ্য সে রকম সুন্দর private বাগান আমি জীবনে কখনও দেখিনি। তবু আমার গুজরাতী hostএর বাগানটিও ছোটখাট জিনিষের মধ্যে একটা উপভোগ্য বিচরণ-স্থান ছিল। বাগান সম্বন্ধে সব চেয়ে নিপুণ শিল্পী ও নির্ম্মাতা বোধ হয় ফরাসী জাতি। তাই সমগ্র য়ুরোপ ফরাসী জাতির বাগান নির্ম্মাণ-কৌশলকে অনুকরণ কর্ত্তে বাধ্য হয়েছে। তবে ভারতবর্ষের মধ্যে দুটি বাগান আমার খুব ভাল লেগেছিল। এক এই গুজরাতী কোটীপতির বাগান ও অপরটি মহীশূরের লালবাগ।

নির্জ্জন অগম্য স্থানে প্রকৃতিদেবী অনেক সময়ে যে বন্য সুষমা দুহাতে বিলিয়ে দিয়ে থাকেন, সে শোভা বোধ হয় সব চেয়ে গরীয়সী ও মহিমময়ী; কিন্তু তাই ব'লে মানুষের শিল্পী-হস্ত-নির্ম্মিত সৌন্দর্য্য সৃষ্টিকে মহাত্মা গান্ধির মতন অবজ্ঞা করায় বিশেষ লাভ আছে বলে মনে হয় না। মানুষের স্বহস্ত-রোপিত সযত্নসেবিত উদ্যানও আমাদের নিবিড় আনন্দ দিতে পারে, এ কথা আমি পারিসের Bois de Boulogne, Jardin de Luxembourg বা সে কোটীপতির বাগানে যেন বিশেষ ক'রেই উপলব্ধি করেছিলাম। শেষোক্ত ভদ্রলোকটির বাগানের মধ্যে কোথাও বা ছিল জাপানী ছোট্ট ছোট্ট গাছ ও লতাপাতা, কোথাও বা গোলাপের কেয়ারী, কোথাও চীনের ছোট্ট পর্ণকুটীর, কোথাও ছোট ছোট প্রস্তর স্তূপ, কোথাও ছোট্ট নির্ঝরিণী,—ইত্যাদি নানা ভাবে তিনি তাঁর উদ্ভাবনী শক্তিকে নিয়ত বিকশিত করে তুল্তেন। আমার এ গুজরাতী বন্ধুর বাগানের জন্য সেরূপ অনন্যসাধারণ খরচও হয় নি বা সেজন্য সেরূপ অধ্যবসায়ও ছিল না বটে; কিন্তু তবু তাঁর এদিকে যতটা দৃষ্টি ছিল, আমাদের দেশের ধনীদের যদি তার সিকি

অংশ দৃষ্টিও থাক্‌ত, তাহ'লে বোধ হয় অর্দ্ধসভ্য ধনীর অর্থের আড়ম্বররূপ উদ্যত ফণা সভ্য মানুষকে এতটা আঘাত কর্ত্তে পার্‌ত না।

কোথায় পড়েছিলাম যে, আমেরিকান কোটীপতিরা যদি এমন ভাবেও জীবন যাপন কর্‌তে জান্তেন যে, তাতে তাঁদের অন্ততঃ সভ্য ভাবে ভোগ করারও একটা নিদর্শন পাওয়া যেতে পার্‌ত, তাহলেও বা বরং তাঁদের অগাধ ও অর্থহীন ধনের খানিকটা সমর্থন করা সম্ভব হ'ত। কিন্তু অধিকাংশ ধনীই ধনার্জ্জনের অদম্য পরিশ্রমে যে জন্য ধনার্জ্জন করেন সেই আসল জিনিষটার কথাই ভুলে যান। অর্থাৎ ভোগের জন্য তাঁরা ভোগ বিসর্জ্জন করেন ও দেহসুখের জন্য সুখভোগের সময়ে দেহপাত ক'রে শেষটা ভুলেই যান কেন দেহপাত করলেন। ফলে হয় এই যে, বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার অর্থোপার্জ্জনের আদর্শে লক্ষপতিগণ যখন অজস্র ধনসঞ্চয় করেন, তখন একদিন হঠাৎ আবিষ্কার ক'রে বসেন যে তাঁরা আজীবন যে ধনসম্পদের স্তূপ উত্তরোত্তর স্ফীত ক'রে এসেছেন তার চিহ্নও আসলে দেখতে পান না, এবং শুধু এমন নানাবিধ বাসনা চরিতার্থ করবার পথ সুগম ক'রে তুলেছেন সে সব বাসনা তাঁদের মনে কখনো উদয়ও হয় নি (amassant des richesses dont ils ne voyaient pas meme les signes acquerant la vaine possibilite d'assouvir des desirs qu'ils n'eprouvaient jamais—L'ile Des PINGOUINS —ANATOLE FRANCE.)। হেতু—স্বাস্থ্যভঙ্গ।

আমার গুজরাতী বন্ধুটি কিন্তু যেমন সুশ্রী ও সুশীল, তেমনি স্বাস্থ্যবান। বস্তুতঃ সব দিক্‌ জড়িয়ে তিনি একজন মানুষ, যেটা বড়মানুষদের মধ্যে মেলা এত বিরল।

গুজরাতী ধনীদের সঙ্গে মাড়োয়ারি ধনীর তুলনা ক'রে কষ্ট বোধ হ'ত। কটকে এক দিন পূজনীয় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। আমি

তাঁকে বলেছিলাম, "আপনার অন্নসমস্যা সমাধানের চেষ্টায় সব সহৃদয় লোকই সহানুভূতি প্রকাশ কর্ত্তে বাধ্য, তবে যখন আপনি বলেন যে, এ সমাধান মিল্‌তে পারে এক মাড়োয়ারি হওয়ার মধ্যে, তখনই মুস্কিল হয়ে পড়ে।"

উত্তরে আচার্য্যদেব যা বলেছিলেন, সে কথাটি যে সত্য, তা গুজরাতী ধনীদের দৃষ্টান্তে প্রমাণ হয়। তিনি বলেছিলেন "তোমরা আমাকে ভুল বোঝ কেন? আমি জিজ্ঞাসা করি অর্থের সঙ্গে কি cultureএর সতীন সম্পর্ক? তোমরা গুজরাতী ও ভাটিয়া ব্যবসায়ীদের দৃষ্টান্ত না নিয়ে মাড়োয়ারিদের দৃষ্টান্তই বা নেও কেন?"

আমার গুজরাতী অনেক ধনী বন্ধুর পরিচ্ছন্নতা, শিক্ষা, সুশীলতা ও বিনয়ের দৃষ্টান্তে আচার্য্যদেবের এ কথার যাথার্থ্যের প্রমাণ সত্যই পেয়েছিলাম।

আমেদাবাদে মহাত্মাজীর জাতীয় বিদ্যালয় দেখতে যাওয়া গেল। সেখানে অনেক ছাত্র ছাত্রীর মুখেই একটা আন্তরিকতা ও দৃঢ়তা আমার বড়ই ভাল লেগেছিল। তবে গুজরাতী শিক্ষকদের মধ্যে অনেকে ইচ্ছে করে অত্যন্ত কুশ্রী বেশ পরিধান কর্ত্তেন। সেটা আমার ভাল লাগত না। বেশভূষার মধ্যে সরলতার সঙ্গে সুশ্রী ও মার্জ্জিত রুচির নিদর্শন মেলা অসম্ভব কেন বুঝতে পারি না। যা সুন্দর তার মধ্যে একটা সত্য আছেই আছে। হতে পারে বর্ত্তমানের দুঃখ-দারিদ্র্যে অধিকাংশ মানুষ সুন্দরের সংস্পর্শে আস্‌তে পায় না। কিন্তু তা থেকে প্রমাণ হয় না যে, আমাদের বেশ-বাস প্রভৃতির মধ্যে সৌন্দর্য্যের আমদানীর যে সহজ প্রবণতাটি আছে, তাকে উৎপাটিত না করলে কোনও মহৎ আদর্শের উপলব্ধি অসম্ভব। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন স্রোতের আমদানী হবেই। কেন না এ হচ্ছে জীবনের ধর্ম্ম। তাই এ স্রোতকে

অস্বীকার ক'রে কুশ্রী দারিদ্র্য ও অবিমিশ্র অপরিচ্ছন্নতাকেই বড় ক'রে দেখবার মধ্যেই জীবনের মস্ত কোনও সার্থকতা মিল্‌তে পারে। অরবিন্দ একটা মস্ত সত্য কথা বলেছেন, যখন তিনি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, "It is a great error to suppose that spirituality flourishes best in an impoverished soil." (The Renaissance in India.)

আমেদাবাদ থেকে কাথিওয়াড়ের রাজধানী ভাওনগরে যাওয়া গেল। সেখানে এক গুজরাতী বন্ধুর আতিথ্যে নগর দর্শন প্রভৃতি করা গেল। তবে সেখানে আমার সব চেয়ে বড় লাভ হ'ল (১) গোবিন্দ রাও পাণ্ডের গান (২) বৃদ্ধ রহিম খাঁর সেতার ও (৩) কাথিওয়াড়ের বিখ্যাত বাই চন্দ্রপ্রভার তানালাপ শ্রবণ।

গোবিন্দরাও পাণ্ডে একজন গুণী লোক। তবে সংসারে এক শ্রেণীর গুণী আছেন, যাঁরা ভাল গাইলেও কেমন যেন কোথাওই কল্‌কে পান না। পাণ্ডেজী সেই সম্প্রদায়ভুক্ত। বেশ গান করেন—জানেন শোনেন, তাললয় শুদ্ধ, কণ্ঠস্বরও অমিষ্ট নয়; অথচ এঁকে বিধাতা কোথায় যেন মেরে রেখেছেন—সেটা প্রথমটা সহজে বুঝতেই পারা যায় না। পাণ্ডেজীর সঙ্গীতে অকৃতকার্য্যতার একটা প্রধান কারণ মনে হ'ল তাঁর personalityর অভাব। গানের মতন শিল্পে বোধ হয় personalityর প্রভাবটা অন্য অনেক শিল্পের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে। কারণ, গানের মধ্য দিয়ে শিল্পীর personality একটু বেশি প্রত্যক্ষভাবে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। অভিনয় শিল্পেও এ কথা খাটে। ভালই অভিনয় হচ্ছে—অথচ personalityর অভাবে তা শ্রোতাকে স্পর্শ কর্ত্তে পারছে না—এরূপ দৃষ্টান্ত অভিনয়-জগতে বিরল নয়। যাই হোক্, পাণ্ডেজীর গান-বাজনায় অনুরাগ অদ্ভুত। ওস্তাদদের কত গাঁজা সেজে দিয়ে, কত পদসেবা করে—কত

অসাধ্য সাধন করে যে ইনি গান শিখেছেন, সে সব কাহিনী শুন্‌লে মনটা আর্দ্র না হ'য়েই পারে না। এঁর গান কেউ শুন্‌তে চাইলে ইনি যেন হাতে স্বর্গ পান। অথচ এঁর গান বড় একটা কেউই শুন্‌তে চায় না। আমি নিজে শিক্ষার্থী বলে এঁর অনেক রাগের আলাপ শুন্‌তে ভালবাস্‌তাম। তাতে এঁর কৃতজ্ঞতার যেন সীমা ছিল না। লোকটিকে আমার ভাল লেগেছিল, অথচ ইনি লোকপ্রিয় নন—যেহেতু এঁর মধ্যে নাকি গায়ক-সুলভ উষ্ণ মেজাজটির একটু বেশি প্রাদুর্ভাব ছিল।

রহিম খাঁর মতন উৎকৃষ্ট সেতার আমি বড় কমই শুনেছি। ইনি ভাওনগরের রাজার সভাবাদক। বয়স আশীর কাছাকাছি। সত্য শিল্পী। তবে গল্প কর্ত্তে ইনি বড় বেশি ভালবাস্‌তেন। গায়করা অনেক সময়ে ভাবেন যে, তাঁদের নীরস শিক্ষা-কাহিনী সাধারণের কাছে বড়ই চিত্তাকর্ষক। রহিমখাঁ সময়ে সময়ে তাঁর নিজের শিক্ষা-পদ্ধতির খুঁটিনাটির প্রশংসায়, ও অপরের শিক্ষা-পদ্ধতির নিন্দাবাদে, এমন পঞ্চমুখ ও কণ্ঠভরা বিষ হয়ে উঠ্‌তেন যে, তখন তাঁকে ভুলিয়ে ভালিয়ে সেতারের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ছাড়া আর গতি থাক্‌ত না। তাঁকে এ কথাটা সহজে বোঝান যেত না যে, ভাল বাজিয়ে হলেই সরস আলাপী হওয়া যায় না।

খাঁসাহেবের গায়ক-সুলভ অন্যান্য অনেক গুণেরও অভাব ছিল না,—যথা, নিজে ছাড়া অপর সকলেই তৃতীয় শ্রেণীর গুণী, রাগাদি ও ঠাট সম্বন্ধে তাঁর ছাড়া অন্য সকলের মতই ভ্রমের চরম গর্ভে নিমজ্জিত, বাজানোর ভঙ্গী সম্বন্ধে এক তাঁর ছাড়া বিশ্বে আর কারুরই কিছু জানা নেই—ইত্যাদি ধারণা। তার উপর তাঁর মেজাজটি ছিল নবাবসম্ভব—কেবল তিনি যেন কোন্ এক দুর্ব্বোধ্য কারণে নবাবী-যোগভ্রষ্ট হয়ে হঠাৎ ওস্তাদদের ঘরে জন্মগ্রহণ ক'রে ফেলেছিলেন। যেন তাঁকে মরজগতে

পাঠাবার সময় কেবল একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ার দরুণই বিধাতা নবাবের অন্য সকল প্রকৃতি-বৈশিষ্ট্য তাঁতে আরোপ করে হঠাৎ বংশ-বৈশিষ্ট্যটি আরোপ ক'র্তে ভুলে গিয়েছিলেন। তবে বিধাতার এ ভুলটি সংশোধন করার চেষ্টার যে খাঁ সাহেবের ত্রুটি ছিল না, এ কথা তাঁর শত্রুতেও স্বীকার কর্ত্তে বাধ্য। তাই খাঁ সাহেব সঙ্গীত-জগতে নিজের সমকক্ষ কাউকে খুঁজে পেতেন না; তাই তিনি সঙ্গীত সম্বন্ধে অপরের সঙ্গে অণুমাত্রও মতভেদ হলে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠতে দ্বিধামাত্র কর্তেন না; তাই তিনি অপর কোনও গায়ক বাদকের গানবাজনা শুন্তে কখনও বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ কর্ত্তেন না;—ও তাই তিনি এক দিন গভীর প্রেরণার বশে সঙ্গীত-রাজ্যে তাঁর একাধিপত্য অকাট্য যুক্তিবলে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। সেদিন শরতের শান্ত সন্ধ্যায় আর একজন সেতারী আলাপ কর্তে কর্তে ভৈরবীতে বুঝি কড়িমধ্যম না রামকেলীতে কোমল নিখাদ বা এম্‌নিই কি একটা লোমহর্ষক পর্দ্দা লাগিয়েছিলেন। এ গর্হিত কাজটি তিনি করেছিলেন না কি বেশি মিষ্ট করার জন্য। কিন্তু খাঁ সাহেবের কাণে সে বেদ-নিষিদ্ধ পর্দ্দা গরম সীসা ঢেলে দিয়েছিল। যন্ত্রণায় অধীর হয়ে তিনি নিজের সেতারখানি তুলে সে বাজিয়ের মস্তকের উপর এমন আঘাত ক'রেছিলেন যে, তাঁর মস্তকটি না কি সেতার বিদ্ধ করে তাকে কণ্ঠমালাতে পরিণত করেছিল্ (ঘটনাটি বেশি অতিরঞ্জিত নয়)।

অস্মদ্দেশীয় গায়ক বাদকের মধ্যে আর যাই গুণ থাকুক, একটি জিনিষের বোধ হয় কোনও বালাই-ই নেই—যার নাম সহিষ্ণুতা বা toleration। তাই তাঁরা রাগরাগিণীর ঠাটের চুলচেরা বিচারে নিজেদের সঙ্গে অপর কোনও গুণীর মতভেদ হলে, এত সহজে ও প্রচণ্ড ভাবে উত্তপ্ত হয়ে ওঠেন। আমি একবার কোনও এক সঙ্গীতাভিজ্ঞ পণ্ডিতের ও হিন্দুস্থানী ওস্তাদের বিরাট তর্ক শুনেছিলাম। বসন্তে পঞ্চম লাগে কি না

এই গুরুতর বিষয়ের মীমাংসাই যেন ছিল তাঁদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। অন্ততঃ তাঁদের সার্দ্ধ তিন ঘণ্টা ব্যাপী বাগাড়ম্বর, কটূক্তি ও অট্টরব শুনে এই রকমই আমার মনে হয়েছিল। এ তর্কের ফল কি হ'ল জান্‌তে এক অনভিজ্ঞেরই একটু কৌতূহল হতে পারে; কারণ, অভিজ্ঞের কাছে এ কথা অগোচর থাকতেই পারে না যে, ওস্তাদী তর্কের কোনও মীমাংসা হওয়া অন্ততঃ এ মরজগতে সম্ভব নয়। এক্ষেত্রেও তাই হইয়াছিল। অর্থাৎ, এ গুরুতর ও দুঘণ্টা ব্যাপী আলাপের পর প্রত্যেকেই স্থির সিদ্ধান্ত করে বস্‌লেন যে, প্রতিপক্ষ সঙ্গীতে গণ্ডমূর্খ। সৌষ্টবজ্ঞান (sense of proportion) বস্তুটি বোধ হয় গান-বাজনার চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষিতে উবে না গিয়েই পারে না।

যাই হোক্, রহিম খাঁ বাজাতেন অতি চমৎকার। আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর মনোহর সেতার উপভোগ কর্ত্তাম। তাঁর মিড়ের হাত, প্রকাশ-ভঙ্গী, দরদ সবই ছিল অপূর্ব্ব। আহা, যদি কেবল বিধাতা তাঁর মস্তিষ্ককে সম্পূর্ণ করে গড়তেন!

ভাওনগরের বিখ্যাত বাই চন্দ্রপ্রভার নাম আমি দু চারজন বন্ধুর কাছে আগেই শুনেছিলাম ও প'ড়েছিলাম (Fox Strangways মহোদয় তাঁর "Music of Hindustan"এ চন্দ্রপ্রভার কণ্ঠস্বরের খুবই প্রশংসা করেছেন)। তাই ভাওনগরে এঁর গান শুন্‌বার জন্য আমি অনেক দিন থেকেই অত্যন্ত আগ্রহান্বিত ছিলাম। তবে শুন্‌লাম, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দেহের আয়তন ও ধর্ম্মচর্চ্চার আগ্রহের বৃদ্ধি হওয়ার দরুণ তিনি ভজনপূজন ছাড়া আজকাল আর কিছুই করেন না। তাঁর বয়স বোধ হয় ৫০এর বেশি হবে না। কিন্তু তাঁর মতন বিপুল কায় একটা দ্রষ্টব্য বস্তু। তিনি সম্প্রতি ধর্ম্মাচরণে একনিষ্ঠ হয়ে অবধি না কি গোযান ছাড়া অন্য কোনও যানে আরোহণ করেন না। মোটরযান ম্লেচ্ছব্যাপার ব'লেই তিনি সনাতন

গোযানেরই এত পক্ষপাতী ছিলেন কি না ঠিক্ জানা নেই,—তবে যারা জানে এমন তুচারজন তুষ্ট লোক না কি কাণাকাণি করত যে, তিনি গোযানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কেবল এই জন্য যে, অন্য কোনও যানে প্রবেশ করা তাঁর কাছে অনায়াসসাধ্য ছিল না। তাঁর বিপুল পরিধি না দেখ্‌লে তুষ্ট লোকের এ জল্পনার সদর্থ ঠিক্ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

যাই হোক্, তিনি গান আরম্ভ করলেন। আমাদের দেশে কোনও স্ত্রীলোকের এত খাদে গলা নাম্‌তে আমি শুনি নি। এরূপ গলাকে য়ুরোপে বলে **contralto** ও পাশ্চাত্য জগতে এর আদরও খুব। কিন্তু আমাদের দেশে স্ত্রীলোকের এরূপ খাদে গলা বোধ হয় খুব বেশি লোকে পছন্দ করবে না। কিন্তু তাহ'লেও তাঁর গলার জম্‌কালো গম্ভীর আওয়াজ ও প্রায় তিন সপ্তক **range** একটা শোন্‌বার জিনিষ। তবে তাঁর গানের ঢং মোটেই কোমল ঢং নয়। যাকে বলে মর্দ্দানা ঢং, সেইটেই তিনি বিশেষ-রকম আয়ত্ত করেছেন। তবে (এ আয়ত্ত করার ফলে কি না জানি না) তাঁর কৃতিত্ব বা বাহাতুরির দিক্ দিয়ে লাভ যথেষ্ট হ'লেও মিষ্টত্বের দিক্ দিয়ে যেন লোকসানই হয়েছে মনে হ'ল। কারণ, তিনি সোহিনী, মালকোষ প্রভৃতিতে যে পরিমাণ তানবিস্তার করলেন, সে পরিমাণ রস আমদানী কর্ত্তে পারলেন না। মনে আছে, এই মালকোষ আলাপেই আবতুল করিম খাঁ এক দিন আমাদের চোখে জল এনেছিলেন। চন্দ্র-প্রভার মধ্যে খাঁ সাহেবের সে অনুপম শিল্পীর দরদ্ নেই। তাই তাঁর তানালাপ প্রায় মামুলি প্রাণহীন ওস্তাদী ঢঙের মতন হয়ে পড়েছে। জোহরা বাই গ্রামোফোনে তিন মিনিটেও শুদ্ধকল্যাণ বা ভূপালী বা যোগিয়াতে যে সুধাবর্ষণ করেছেন, তার সিকি মিষ্টত্বও চন্দ্রপ্রভা সাক্ষাতে গেয়ে সৃজন কর্ত্তে পারলেন না। আমাদের দেশে বড় বড় বাইজীরা গানকে

ভারি মিষ্ট কর্ত্তে পারেন। কিন্তু চন্দ্রপ্রভা তা পারেন না। তবে তাঁর গানে নৈপুণ্যকে বাহবা না দিয়েই পারা যায় না।

ভাওনগরে হামীর খাঁ বলে আর একজন বড় ওস্তাদের গান শোনা গেল। এঁকে টেলিগ্রাফ ক'রে কাছের কোন এক রাজার সভা থেকে আনানো হয়েছিল। তবে হামীর খাঁর চেহারাটা ছিল অনেকটা "তাল-পত্রের সিপাহী-খাঁর" মতন। কারণ না কি তাঁর ধূম্রবিশেষের প্রতি অত্যধিক স্নেহাসক্তি। বিধাতা কেন যে বিশেষ ক'রে ভারতবর্ষের ওস্তাদদের এতটা রঙীণ-চিত্ত করে গড়েছিলেন, তা তিনিই জানেন। কিন্তু কারণ যাই হোক্, রঙের এমন একনিষ্ঠ ভক্ত বোধ হয় জগতের অন্য কোনও সম্প্রদায়েই মেলে না। তাছাড়া এ সম্প্রদায় এ বিষয়ে যেমন বৈচিত্র্যের পক্ষপাতী, নেশার জাতিভেদে তেমনি উদারপন্থী। অর্থাৎ, কোনও নেশায়ই ভারতীয় ওস্তাদদের আপত্তি বা অরুচি নেই এবং অহোরাত্রের মধ্যে কোনও সময়ই তাঁর নেশার অনুপযোগী নয়। হামীর খাঁ আমাকে গান শোনাতে এসেছিলেন সকালে—কিন্তু তখনই তাঁর অনুপম মুখবিবরে বিবিধ পানীয়, আহার্য্য ও ধূম্রের মিলিত সৌরভ কেমন যেন এক জমাট ভাব ধারণ ক'রে সকলকে আমোদিত করে রেখেছিল।

হামীর খাঁর চেহারা যে তাঁর নেশা-গবেষণার ফলে বিশেষ উন্নতিলাভ করে নি, এ কথা বোধ হয় বলা বাহুল্য। তদুপরি গানের সময় তাঁর মুদ্রাদোষের প্রাচুর্য্যে ও স-দোক্তা তাম্বুলরসের শীকরোৎক্ষেপে শ্রোতৃবর্গ তাঁর সঙ্গে "শতহস্তেন" রূপ ব্যবহার কর্ত্তে বাধ্য হতেন, বিশেষতঃ শুভ্রবেশী শ্রোতা।

হামীর খাঁ কিন্তু ওস্তাদ লোক। খুব বিশুদ্ধ গাইতে পারেন। তান-কর্ত্তব্যও খুব। কিন্তু—একজন নির্জ্জলা ওস্তাদ। গানের মধ্যে প্রাণ ব'লে জিনিষটির কোনও ধারণাই এঁর নেই। তাল, লয়, তান, আস্থায়ী,

অন্তরা সব শুদ্ধ হ'লেও যে সঙ্গীত আসল সঙ্গীতের পর্য্যায়ভুক্ত হ'তে পারে না, তার যদি কেউ প্রত্যক্ষ প্রমাণ চান, তবে তিনি যেন কাথিওয়াড়ের হামীর খাঁর গান একবার শোনেন।

ভাওনগর থেকে আমেদাবাদে ফিরে বরোদায় যাওয়া গিয়েছিল রাজ-অতিথি হ'য়ে। এবার রাজ-অতিথি হয়ে রামপুরের মতন অবস্থা হয় নি। অর্থাৎ এবার রাজার পরিচারকগণ প্রমাণ কর্ত্তে চেষ্টা পান নি যে, অতিথির স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হরণ না করলে তাঁর চূড়ান্ত সৎকার করা অসম্ভব।

বরোদার শ্রেষ্ঠ ওস্তাদ—ফৈয়াস খাঁ। ইনি বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের একজন শ্রেষ্ঠ গুণী। তাঁর গান দুদিন শুন্‌লাম। খাঁ সাহেব খেয়ালে আবদুল করিমের অনেক নীচে ও এমন জোরে হার্মোনিয়াম বাজিয়ে খেয়াল গান করলেন যে তাঁর এত নাম শুনে এসে তাঁর খেয়াল শুনে বড়ই নিরাশ হয়ে পড়লাম। কিন্তু পর দিন তাঁর ঠুংরি শুনে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। একজন প্রকৃত শিল্পী বটে। কি দরদ! কি ছোট ছোট তানের কাজ! কি তালের উপর আধিপত্য! ও কি অফুরন্ত বিচিত্র তানালাপ! ফৈয়াস খাঁ না কি কল্‌কাতার অনেক বড় বড় বাইজীকে গান শিখিয়েছেন। ঠুংরি যদি শিখিয়ে থাকেন, তবে সে সব বাইজী নিশ্চয়ই খুব লাভ করেছে। তবে খেয়াল যে ইনি খুব চমৎকার শেখাতে পারেন, তা মনে হ'ল না। তাছাড়া খেয়ালের ধারণাই এঁর তেমন নেই। ঠুংরির পক্ষে কিন্তু এঁর গলা বেশ সুন্দর—যেহেতু সূক্ষ্ম কাজে ভরা, যদিও খুব যে মিষ্ট তা বলা যায় না। তবে মনে হয়, এক সময়ে এঁর গলা আরও মিষ্ট ছিল। আজকাল না কি নানা কারণে এঁর কণ্ঠস্বর খারাপ হয়ে গেছে। তবে সে সব কারণের উল্লেখ না করাই ভাল।

বরোদায় তসদ্দুক হোসেন বলে আর একজন গায়কের গান শুন্‌লাম। গলাটি বড় তীক্ষ্ণ ও দরদ বড়ই কম। কাজেই আমার হোসেন

থাঁর গান শুনে যে খুব ভাল লেগেছিল, এ কথা শপথ করে বল্‌তে পারি না।

জমালুদ্দীন খাঁ কাতর কণ্ঠে বল্‌লেন যে তাঁর জ্বরে খিন্ন অবস্থা। কাজেই তাঁর বীণা শোনা হ'ল না।

বরোদায় এক ভারতীয় ব্যাণ্ড আছে। সেখানকার কলেজের প্রিন্সিপাল Fredelis সাহেব একদিন এ ব্যাণ্ড শুন্‌তে নিয়ে গেলেন। বরোদায় এক প্রকাণ্ড বাগানে বাজনা হ'ল। অনেক রকম যন্ত্রীই এল ও বাজনাটা বেশ শ্রুতিমধুরও লাগল। মনে হ'ল, এ দিক্ দিয়ে আমাদের যন্ত্র-সঙ্গীতের একটা নূতন বিকাশ হওয়া অসম্ভব নয়। তবে তার অধ্যক্ষ একজন বিদেশী হ'লে চল্‌বে না। আমাদের দেশেরই কোনও উদারপন্থী, সঙ্গীতজ্ঞ ও প্রতিভাবান্ লোকের মৌলিকতার সাহায্যেই এ কাজ হবে। কারণ এ কথাটা আমাদের ভুল্‌লে চল্‌বে না যে, বিদেশী আমাদের শিল্প সম্বন্ধে হয় ত অনেক নূতন আলো দিতে পারে, সে শিল্প সম্বন্ধে নূতন তথ্যও জ্ঞাপন কর্ত্তে পারে; কিন্তু একটা জিনিষ সে পারে না। অর্থাৎ সে পারে না··· আমাদের শিল্পে তার প্রতিভার দ্বারা আমাদের বিশিষ্ট ধারা বজায় রাখ্‌তে। তাই আমাদের শিল্প সম্বন্ধে বিদেশী সমজদারের মতামত আমরা মন দিয়ে শুন্‌তে পারি, তা থেকে লাভও কর্ত্তে পারি—কিন্তু একটা জিনিষ পারি না; অর্থাৎ কি না আমরা পারি না কেবল—তাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে আমাদের শিল্প-জগতে মৌলিক সৃষ্টি করতে।

বরোদার শ্রেষ্ঠ বাইজীর নাম ইদনজান। এঁর কণ্ঠস্বর মিষ্ট বটে কিন্তু এঁর তান মিষ্ট নয় মোটেই। তাছাড়া ইনি তার সপ্তকের "সা"র একটু বেশি পক্ষপাতী। সঙ্গীতে কেবল চড়া পর্দ্দাকে বড় ক'রে তুলে ধরলে ভাবে গানের symmettry বা সৌষ্ঠব নষ্ট হয়। এই জন্য এঁর গান অল্পক্ষণের পরই একঘেয়ে মনে হয়।

১৯২৪ সাল ডিসেম্বর মাসে লক্ষ্মৌয়ে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশন হয়। কিন্তু সব জড়িয়ে পাঁচ ছয় দিন মাত্র এ সঙ্গীতস্রোত ছিল। কারণ বোধ হয় এই যে অনেক প্রচণ্ড স্রোতই বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া হ'য়ে দাঁড়ায়। অন্ততঃ লক্ষ্মৌয়ে সঙ্গীতের বিরাট্ আড়ম্বর এরূপভাবেই ফলপ্রসূ হয়েছিল। অর্থাৎ সেখানে গর্জ্জন হয়েছিল যথেষ্ট কিন্তু বর্ষার বেলাই হয়েছিল যত গোলযোগ। আজ এই গোলমালটির বর্ণনাতেই মনোনিবেশ করব ভেবে কলম ত ধরা গেছে। পরিণাম কি হবে আমার জানা নেই, যেহেতু শাস্ত্রে আছে যে পরিণামদর্শী নাকি কেবল এক অন্তর্যামী আর সেকালকার বৃদ্ধেরা—আজকালকার ছেলেরা নয়।

প্রথম দিন বরোদা ব্যাণ্ড "গৌড় সারঙ্গে" উদ্বোধন সঙ্গীত আরম্ভ কর্‌ল। বরোদায় এ ব্যাণ্ডের উদ্‌যোক্তা সেখানকার সঙ্গীত-কলেজের অধ্যক্ষ Fredelis সাহেব। ইনি রুষ-জার্ম্মাণ ইহুদী ও আরও কত কি। লোকটী আমাদের সঙ্গীত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না বুঝলেও, শুনে শুনে একটু গুণগ্রাহী হ'য়ে পড়েছে। ব্যাণ্ডটী মন্দ তৈরি করেনি। ব্যাণ্ডের বাদকগণ মাঝে মাঝে একা একা আলাপ করে থাকেন, আবার মাঝে মাঝে সব বাদকগণই বাজান। সময়ে সময়ে ভারি মধুর শোনায়। আমি বরোদায় গত বৎসর এ ব্যাণ্ড শুনেছিলাম কিন্তু তখন এতটা ভাল লাগেনি। এবার আমার বেশ লাগল মোটের উপর, কারণ এর মধ্যে একটা বিশেষত্ব ছিল। ব্যাণ্ডের মধ্যে এস্রাজ, সেতার, সরেঙ্গী, নানা রকমের বাঁশী, জলতরঙ্গ সবই ছিল। তব্‌লা ত ছিলই। সকলেই বেশ গুণী দেখা গেল। তবে সবচেয়ে ভাল বাজালেন জলতরঙ্গ বাদক বৃদ্ধ আমীর খাঁ। তিনি অনেক সময়ে একাই জমিয়ে দিতেন।

তারপর বাজালেন রামপুরের ফিদা হোসেন। যন্ত্র শরোদ। শরোদ যন্ত্রটী মুসলমানরা সৃষ্টি করেছিল—হিন্দু রবাব থেকে। আওয়াজ সেতারের বা বীণার চেয়ে জোর যদিও বীণা বা সুরবাহারের মতন মিষ্ট নয়। তবে গত্ প্রভৃতি শরোদে যেমন বাজে এমন অন্য কোনও যন্ত্রে বাজে না। ফিদা হোসেন রামপুরের নবাবের সভাবাদক। গুণী লোক। প্রথম দিন কাফি ও পিলু বাজালেন। চমৎকার গত্ তাঁর। যেমন দরদ্, তেম্নি ভঙ্গী ও তেম্নি দক্ষতা! তবে তাঁর সবচেয়ে বড় সম্পৎ—তাঁর মুখ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের expression। সঙ্গীতের অনেকখানি সৌন্দর্য্য নির্ভর করে শুদ্ধ মুদ্রার উপর। অর্থাৎ শিল্পী যে ভাব সঙ্গীতে ফুটিয়ে তুল্তে চান তাঁর মুখ ও অবয়বের প্রকাশ্যভঙ্গীর কর্ত্তব্য সেই ভাবটীর সহায়ক হওয়া। এতে যে সঙ্গীতের প্রকাশক্ষমতার কতখানি সৌষ্টব বাড়ে তা' যিনিই ফিদা হোসেনের বাজনা শুনেছেন তিনিই জানেন। ফিদা হোসেন বাজাতে বাজাতে মণ্ডলাকারে পরিক্রমণ কর্ত্তেন যেটা ছিল ভারি সুদৃশ্য। তার ওপর তিনি যন্ত্রটিকে এমন সুন্দর বঙ্কিমভাবে ধর্ত্তেন যেন মনে হ'ত যন্ত্রটী তাঁর স্নেহপুত্তলী। বাজাতেন যেন তাকে তিনি আদর কর্চ্ছেন। বাস্তবিক ফিদা হোসেন ছিলেন একজন সত্যকার শিল্পী। শরোদে এমন সুন্দর মিষ্ট হাত ও expression বোধ হয় সমগ্র ভারতে মেলা ভার। এঁর চেয়ে ভাল শরোদ বাজনা কেবল একজনের কাছে শুনেছি। তিনি বিখ্যাত আলাউদ্দীন খাঁ। তবে তাঁর সম্বন্ধে পরে যথাস্থানে লিখবো।

ফিদা হোসেনের সঙ্গে সেদিন তব্লা বাজিয়েছিলেন বিখ্যাত আবেদ হোসেন। এঁর মত আশ্চর্য্য তব্লাবাদক ভারতে একান্ত বিরল। এঁর হাত যেমন পরিষ্কার, বোলের বৈচিত্র্যে যেমন অধিকার, সঙ্গীতের ক্ষমতাও তেমনি চমৎকার। এঁর বাজনা যেদিন প্রথম শুনেছিলাম সেদিন আমার বিস্ময়ের আর অন্ত ছিল না। তব্লাকে নিয়ে যে এভাবে ছিনিমিনি

খেলা যেতে পারে এ ধারণাই আমার ছিল না। গুণী বটে! তবে সঙ্গতকৃতিত্বে ও ভঙ্গির মনোহারিত্বে এঁর চেয়ে ভাল বাজনা কেবল একজনের শুনেছি। তিনি কাশীর বিখ্যাত ধীরুমিত্র। তাঁর সম্বন্ধেও যথাস্থানে লিখবো।

সেদিন অর্থাৎ ৯ই জানুয়ারী রাত্রি ৯টার সময় বিখ্যাত আলাউদ্দীন খাঁ তাঁর অপূর্ব্ব ব্যাণ্ড বাজিয়েছিলেন। ১৭।১৮ জন অনাথ বালককে নিয়ে আলাউদ্দীন খাঁ মাইহার রাজ্যে এই ব্যাণ্ডটি গঠন করেন। আমাকে বল্‌লেন যে ৫।৭টী অনাথা বালিকাকেও তিনি এই ব্যাণ্ডের জন্যে গ'ড়ে তুলেছেন, তবে এ সম্মেলনের হাঙ্গামে তাদের আনেন নি। তাদের মধ্যে নাকি পিয়ানোও বাজায় এমন মেয়ে আছে। লক্ষ্ণৌয়ের ব্যাণ্ডে পিয়ানো বাজে নি; তবে যা' বেজেছিল তাতেই আমরা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। ৪।৫ জন বালক সেতার বাজাল, ৩ জন বাঁশী, ১ জন বেহালা, দুটী দুগ্ধপোষ্য শিশু তবলা, একজন Violencello ও একটী ৭।৮ বৎসরের বালক জলতরঙ্গের ঢঙে নানা সুরের ছোটবড় লোহার নল বাজিয়েছিল। এ নলগুলি একটা কাঠের বাক্সের ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছিল ও তার আওয়াজ ও বাজনার পদ্ধতি জলতরঙ্গের চেয়ে সতেজ পরিষ্কার ও সুশ্রাব্য। এ বালকটির বাজানর দক্ষতা অদ্ভুত। সমস্ত ব্যাণ্ডের ধর্‌তে গেলে সে একরকম প্রাণ বল্‌লেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। আলাউদ্দীন খাঁ নিজে বেহালা বাজিয়ে conductorএর কাজ করেছিলেন।

ব্যাণ্ডটি যে কি অপূর্ব্ব মধুরতার সৃষ্টি করেছিল ও সমজদার অসমজ-দারকে যে কিরূপ এককালে মুগ্ধ করেছিল সে কথার যথার্থতা বর্ণনা করা অসম্ভব। যাঁরা আলাউদ্দীন খাঁ'র এ ব্যাণ্ড শোনেন নি, তাঁরা আমার এ উচ্ছ্বসিত উৎসাহ ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন না। কারণ এ ব্যাণ্ডে যা শোনা গেল তার ঢং ঠিক স্বদেশীও নয় বিলিতিও নয়, অথচ তাতে ভারতীয় বৈশিষ্ট্যের ধারাটি অক্ষুণ্ণ ছিল। এ একটা সৃষ্টি। ওস্তাদ সম্প্রদায় বা বিজ্ঞতম সমজদার সম্প্রদায় হয়ত এরূপ সৃষ্টির মাধুর্য্য ও মহিমা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন না; কারণ নূতনত্ব সহজে পুরাতনপন্থীদের কাছে আমল পায় না, এটা অনেকটা জীবনের ধর্ম্ম হিসেবে বোধ হয় গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু সুখের বিষয় যে জীবনের ধর্ম্ম শুধু এই গতানু-গতিকতার খাঁজেই গড়িয়ে চলে না; সময়ে সময়ে অনন্যসাধারণ প্রতিভার হাতে প'ড়ে নূতন ভাবে গঠিত, সৃষ্ট ও কল্পিত হয়ে মহিমময় হ'য়ে ওঠে। এ অভিনবত্বের বিরুদ্ধে প্রবীণরা সৃষ্টির আদিমকাল থেকেই যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে আসছে; কিন্তু পরাভবও স্বীকার না ক'রে পারে না। এ দুঃখময় জগতে যদি আশার বাণী ও ভরসার কথা কিছু থাকে তবে এ সত্যটি তাদের অন্যতম সন্দেহ নেই।

আলাউদ্দীন খাঁকে একজন অতি উচ্চতম শ্রেণীর নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভার বিকাশ ব'লে মনে করার অনেক কারণ আছে। উত্তরভারতে তাঁর মতন বেহালা আমি শুনেছি ব'লে মনে হয় না। শরোদেও হাত তাঁর অতি তৈরি—বিশেষতঃ জলদ বাজনায়। তার উপর তিনি সেতার সুর-বাহার, তবলা, কর্ণেট, বাঁশি প্রভৃতি প্রায় সমস্ত রকম বাজনাতেই নিপুণ। এ রকম প্রতিভা য়ুরোপে জন্মগ্রহণ ক'রলে দেশদেশান্তর থেকে লোক দেখতে আসতো;—যেমন ভিক্টর হিউগোর পরিচ্ছদের একটী প্রান্ত স্পর্শ করতে একজন তীর্থযাত্রী বহুদূর হ'তে এসেছিল। তবে দুঃখ এই, আমাদের

দেশের শিল্পকলায় প্রবুদ্ধ লোকমত গ'ড়ে ওঠে নি ব'লে সঙ্গীতাদি ললিত-কলায় অনন্যসাধারণ প্রতিভার দাম দিতে লোকে জানেও না, শেখেও নি। তা' ছাড়া আর একটা কথা আছে।

সঙ্গীতাদি তুচ্ছ শিল্পকলা নিয়ে মাথা ঘামানও আমরা পণ্ডশ্রম মনে করি। কাজেই আলাউদ্দীন খাঁ কলিকাতায় এলেন, কিন্তু কোনও উৎসাহ না পেয়ে বাংলার বাইরে মাইহার রাজসরকারে চাকরী নিতে বাধ্য হ'লেন। বাঙালী বাংলার বাইরে যাবে না এমন কথা আমি বলি না, বা আলাউদ্দীনকে বাঙালীর গৌরব হিসেবেও দেখার আমি সম্পূর্ণ বিরোধী, এমন কি ভারতের গৌরব হিসেবেও আমি দেখতে চাই না—যেহেতু তাঁকে শিল্প-জগতের গৌরব বলে মনে করাই সব চেয়ে সঙ্গত বলে মনে হয়। আমি কলিকাতার মতন সহরে তাঁর অনাদরের কথা উল্লেখ করলাম শুধু এই সত্যটি দেখাতে যে সঙ্গীত-কলার প্রতি আমাদের শিক্ষিত, অপিচ অভিজাত সমাজের নিহিত অবজ্ঞা কত গভীর। অথচ ভেবে দেখলে দেখা যায় যে যদি মানুষের হৃদয়ের সৌকুমার্য্যের (refinement) উৎকর্ষ সাধন করতে হয়, যদি মানুষকে সত্য সত্য সভ্য ব'লে পরিচয় দিতে হয়, তাহলে সুন্দরকে ভালবাসা তার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। কারণ আমরা সুন্দরকে, মহিমময়কে, সত্যকে যত গভীরভাবে ভালবাসতে শিখি, আমাদের প্রবৃত্তির অসারতা, পাশবিকতার ততই উর্দ্ধে উঠতে সক্ষম হই। অরবিন্দ তাঁ'র **National Value of Art**এ দেখিয়েছেন আমাদের নীতিবোধের বিকাশের ওপর সুন্দরের প্রভাব কত বেশি ;—যেমন নিষ্ঠুরতা, পাশবিক প্রবৃত্তি অন্যায় ব'লে গণ্য হওয়ার অনেকখানি কারণ নিহিত আছে এ সবের কদর্য্যতার মধ্যে। কথাটা খুবই সত্য সন্দেহ নেই। তবে একটা কথা এ সম্পর্কে ভোলা চলে না ও সেটা এই যে, এ ভালবাসার ক্ষমতা অর্জ্জনসাপেক্ষ,—অর্থাৎ এটা সত্যই শিখতে

হয়। আশৈশব শুধু অর্থকরী বিদ্যা ও অর্থসার নীতি শুনলে আমাদের মনের এদিকের সুন্দরতম বিকাশ যেন অনেকটা অঙ্কুরেই বিনাশ হয়। আলাউদ্দীন খাঁকে শিক্ষাভিমানী বাঙালীর দুয়ারে হাত পাততে হয়েছিল ও প্রত্যাখ্যাত হ'তে হয়েছিল এটা যে বাঙালীর সৌন্দর্য্যপ্রিয়তার বিরুদ্ধে কতবড় একটা অভিযোগ তা' লক্ষ্ণৌয়ে আলাউদ্দীনের মহিমময় শিল্পসৃষ্টির নমুনা দেখে অনেকেই উপলব্ধি করেছিলেন। কোনও কোনও বাঙালী গর্ব্বস্ফীত হ'য়ে বলতেন যে আলাউদ্দীন বাঙালীর গৌরব। আমার ইচ্ছা হ'ত তাঁদের জিজ্ঞাসা করি যে আলাউদ্দীন কলিকাতায় মাথা গুঁজবার স্থান পেলেন না সেটাও কি বাঙালীর গুণগ্রাহিতার বা সভ্যতার গৌরব? তবে থাক্ এ আক্ষেপ।

আলাউদ্দীন খাঁ সে দিন ব্যাণ্ডে তিলক কামোদ, শঙ্করা ও বেহাগ বাজিয়েছিলেন। সকলে সব সময়ে একত্রে বাজাত না—এক এক সময়ে হয়ত শুধু বাঁশি বাজ্‌ল বা বেহালা ও এস্রাজ বাজ্‌ল। মাঝে মাঝে হয়ত বা লোহার জলতরঙ্গ ঝঙ্কার দিয়ে বিদ্যুদ্বেগে চলে গেল। কখনও জলদ্, কখনও ঠায়ে, উচ্চৈঃস্বরে, কখন নিম্নস্বরে, কখনও আড়িতে কখনও সরলভাবে—এরূপ অপূর্ব্ব বৈচিত্র্যের মশলা দিয়ে যে রসটি আলাউদ্দীন খাঁ সৃষ্টি করেছিলেন, সেটা শ্রোতৃবৃন্দের কাছে একটা **revelation** স্বরূপে এসেছিল বল্‌লেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। ফলে হ'ল এই যে, তাঁকে তিন দিন এ ব্যাণ্ড বাজাবার অনুমতি দেওয়া হ'ল যদিও প্রথম দিন কর্ত্তৃপক্ষ আলাউদ্দীনকে মণ্ডপের ভিতরে ব্যাণ্ড বাজাতে অনুমতিই দিতে চাননি, বলেছিলেন মণ্ডপের বাইরে বাজানো হ'ক। আলাউদ্দীন তাতে স্বস্থানে প্রস্থান করার অসুবিধাকর প্রস্তাব করাতে, কর্ত্তৃপক্ষ নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে তাঁকে আধ ঘণ্টা মাত্র সময় দিয়েছিলেন। আলাউদ্দীন খাঁ আমাকে আক্ষেপ ক'রে বল্‌লেন যে তিনি ২০০।৩০০ গৎ ছেলেদের

শিখিয়েছেন; কিন্তু মাত্র আধ ঘণ্টায় তিনি কতটুকু শোনাবেন? যাই হোক্ পরে তাঁকে যথেষ্ট সময় না দিয়েই কর্ত্তৃপক্ষ পারেন নি,—তাঁদের গোঁড়ামী সত্ত্বেও। এতেই খানিকটা বুঝতে পারা যাবে আলাউদ্দীন খাঁ পাঁচ জনের মনের উপর কতটা গভীর ছাপ অঙ্কিত করেছিলেন। আমার মনে হয় যে আলাউদ্দীন যদি কলিকাতা বোম্বে প্রভৃতি বড় বড় সহরে এরকম দু'একটা ব্যাণ্ড পার্টি organize ক'রে দিয়ে যান, তবে আমাদের যন্ত্র-সঙ্গীতের একটা বড় অভাব পূর্ণ হয়। এর ফলে যদি আর কোনও সুফল না-ও ফলে তা' হ'লে অন্ততঃ এটাও ত বুঝতে পার্‌ব যে আমাদের সচরাচর **concert** আখ্যায় অভিহিত সঙ্গীতের আর্ত্তনাদ সহ্য করাটা আমাদের সঙ্গীতের গুণগ্রাহিতার বিরুদ্ধে একটা কত বড় অভিযোগ! এটা একটা কম লাভ নয়, এ কথা বোঝবার আমাদের সময় এসেছে।

আলাউদ্দীন খাঁর দাদা আফতাব উদ্দীন খাঁও একজন মস্ত গুণী। এক পরিবারে এ রকম তুজন প্রথম শ্রেণীর গুণী বড় দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। আফতাব উদ্দীনের মতন বংশীবাদক বোধ হয় আজ সমগ্র ভারতবর্ষে আর নেই। মাদ্রাজী গুণী সঞ্জীব রাওয়ের বাঁশি অবশ্য দক্ষতায় অদ্ভুত। কিন্তু দক্ষতা বা কার্‌দানী দেখানো এক ও যথার্থ কলাকারু আর। কোথায় গুণপনা যে সত্য ও মহিমময় হ'য়ে ওঠে সে পরিচয় বড় সুন্দর পাওয়া যায় সঞ্জীব রাওয়ের সঙ্গে আফতাব উদ্দীনের বংশীবাদকের তুলনা করলে। এবং এই রকম ক্ষেত্রেই বেশি করে ম'নে হয় যে স্রষ্টা শিল্পী বিধাতার কাছে থেকেই সৃষ্টির সনন্দ নিয়ে আসেন—তাঁকে তৈরী করা যায় না। আফতাউদ্দীন কারুর কাছে শেখেন নি। কিন্তু কি অপূর্ব্ব তাঁর বাঁশি!

তার পরে সে দিন রামপুরের ধ্রুপদী নাজির খাঁ আড়ানা ও হিন্দোল গাইলেন। গানটি মন্দ নয়—কর্ত্তব্‌ও বেশ সুসম্পন্ন। তবে কল্পনার

কোনও মহত্ত্বই ছিল না। শ্রীযুক্ত ভাতখণ্ডে এঁর সুখ্যাতি করেছিলেন—কিন্তু আমি অনেকটা নিরাশই হয়েছিলাম বল্‌তে হবে। এখানে একটা কথা বলা দরকার মনে কর্‌ছি। ভাতখণ্ডে প্রমুখ সত্যকার সমজদারের সঙ্গে আমাদের একটা প্রভেদ ক্রমেই স্পষ্ট হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে। সেটা হচ্ছে এই যে এঁরা সঙ্গীতে রাগ-তাল শুদ্ধ ও তানালাপ বাট প্রভৃতির **technical perfection** হ'লেই অনেকটা খুসি থাকেন ব'লে মনে হয়—যদিও ভাতখণ্ডে নিজে "গানের মধ্যে প্রাণের মূল্য" তাঁর সতীর্থদের চেয়ে অনেক বেশি বোঝেন। তবে আমাদের ঠিক আগেকার **generation** হিন্দুস্থানী সঙ্গীতকে সচরাচর কি চোখে দেখতেন এখন আমি সেই কথা মনে ক'রেই আমাদের মতামতের সঙ্গেই তাঁদের মতামতের তুলনা কর্‌ছি। কারণ ভাতখণ্ডে নিজে অনেকটা এগিয়ে এলেও (কেননা গানের নিছক্ মিষ্টত্বে তাঁকে দ্রবীভূত হ'তে দেখেছি) ঠাকুর নবাবালি প্রমুখ তাঁর সতীর্থেরা অনেক পেছিয়ে আছেন। যাই হোক্ নাজির খাঁর গান শোন্‌বার জন্য যে আমি ভবিষ্যতে ব্যগ্র হ'য়ে উঠব না এটা ধ্রুব—যদিও শুদ্ধ এলাহাবাদের চন্দ্রশেখর ব'লে একটী বালকের গান শুন্‌তে আমি কাশী থেকে এলাহাবাদ গিয়েছিলাম। এ বালকটিকে লক্ষ্ণৌ কন্‌ফারেন্সে অনেক ক'রে গাইয়েছিলাম। তবে সে কথা যথাস্থানে।

যা' বল্‌ছিলাম—এই নিছক্ **classicism** জিনিষটার ভক্ত হ'তে বোধ হয় আমরা একেবারেই পারি না ও পার্‌বও না। তাই আল্লাবন্দে খাঁর গান আমার ভাল লাগেনি, অথচ ভাতখণ্ডে প্রমুখ সমজদারেরা তাঁর ভারি ভক্ত। কিন্তু আমার মনে হয় যে শুধু আমাদের সঙ্গীতের নয়, যে কোনও সঙ্গীতের প্রাণ বিরাজ করে—সঙ্গীতকারের সেটা অনুভব করার মধ্যে। এ কথা আমি অনেকবার বলেছি। তবে আরও অনেকবার বলার দরকার আছে ব'লেই আবার বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি। আল্লাবন্দে, নাজির খাঁ প্রমুখ শত-

করা নিরানব্বই জন ওস্তাদ আজ যে তানালাপে মশগুল হ'য়ে থাকেন সেটা তাঁরা নিজেরা অনুভব করেন না। কাজেই তাঁদের প্রকাশভঙ্গীতে তাঁদের দরদ ফুটে ওঠে না। এইটেই তাঁদের বিরুদ্ধে শিল্পানুরাগীর প্রধান অভিযোগ। নইলে তাঁদের সঙ্গীতে অসাধারণ দক্ষতা অস্বীকার করা কারুরই উদ্দেশ্য নয়। এবং এইখানেই ঠাকুর নবাবালি, ভাতখণ্ডে প্রমুখ সমজদারদের প্রবুদ্ধ উপভোগ ও আমাদের সানুরাগ উপভোগের প্রধান তফাৎ। গানে দরদ না থাক্‌লে তা' আমাদের আশ্চর্য্য বা স্তম্ভিত কর্‌তে পারে বটে কিন্তু—মোহিত কর্‌তে পারে না। গানের নিহিত মহিমা যে তার ভাবের উপর নির্ভর করে, নিছক্ ওস্তাদিপন্থীরা প্রায়ই সে কথা ভুলে গিয়ে থাকেন দেখা যায়। উদাহরণতঃ—অতি মর্ম্মস্পর্শী মিষ্ট গানে এঁরা সাড়া প্রায় দেন না বল্‌লেই চলে ; অথচ সুরের ক্লান্তিকর মল্লযুদ্ধে এঁদের (অন্তরের আনন্দের কথা জানি না, কিন্তু) বাইরে খুবই বাহবা দিতে শুনেছি—সে বাহবার সদর্থ যাই হোক্। আমার বিশ্বাস হয় না এ বাহবার মানে এই যে তাঁদের অন্তরে এত পুলক-শিহরণ জাগে। আমার মনে হয় এ বাহবার সদর্থ শুধু নিছক্ ওস্তাদিকে স্বীকার করা মাত্র। অথচ ফল হ'য়েছে এই যে গানের প্রাণটি কোথায় সে দিকে দৃষ্টি না দিয়ে শেষটা সে বস্তুটির অস্তিত্বও এঁরা ভুলে বসে আছেন। আমাদের হৃদয়ের অনেক সদ্‌গুণই যে চেষ্টা ও অনুশীলন অভাবে অনেক সময়েই শুকিয়ে যায় এটা ত অত্যন্ত জানা কথা। হৃদয়স্পর্শী সরল মিষ্টতাতে সাড়া দিতে না পারার এইটেই বোধ হয় নিহিত মনস্তত্ত্ব।

আমার এ কথার আর একটা উদাহরণ মিলেছিল যখন এঁরা সকলে মিলে রামপুরের মুস্তাক হোসেনকে মেডেল দিলেন। এঁর কর্ত্তব অসাধারণ, গলার কাজ আশ্চর্য্য ও সুর চড়ে নামে বোধ হয় তিন সপ্তক। কিন্তু এঁর গান এতই কুশ্রী অঙ্গভঙ্গীদোষদুষ্ট ও প্রাণহীন (অবশ্য ক্রন্দন লম্ফ ঝম্পাদি

রূপ প্রাণের কথা বল্‌ছি না, সুরের মধ্যে দরদ-রূপ প্রাণের কথা বল্‌ছি) যে তাঁকে মেডেল দেওয়াটা আমার কাছে সমর্থনযোগ্য বলে' মনে হয়নি। অবশ্য দয়াপরবশ হ'য়ে দরিদ্র গায়ককে মেডেল দেওয়া হয় তাতে আপত্তি কিছু নেই। কিন্তু যেখানে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের তরফ থেকে মেডেল দেওয়ার একটা মস্ত দায়িত্ব আছে, সেখানে মেডেলটা ভেবে চিন্তেই দেওয়া উচিত বলে' আমার মনে হয়। আলাউদ্দীনকেও রৌপ্য পদক দেওয়া হ'য়েছিল, মুস্তাক হোসেনকেও তাই। অথচ এ দু'জনের মধ্যে কি আকাশ পাতাল প্রভেদ! প্রভেদ এই যে একজন স্রষ্টা শিল্পী ও যন্ত্রে কবি, আর একজন নিছক ওস্তাদ, ও কণ্ঠে পালোয়ান মাত্র। এই সব দেখে শুনেই আমার মনে হয় লক্ষ্ণৌএর বিচারকগণের সঙ্গে আমাদের মতামতের একটা মস্ত ব্যবধান থাক্‌বেই।

সেদিন মুস্তাক হোসেন মালকোষ, বেহাগ ও তেলেনা গেয়েছিলেন। ঠাকুর নবাব আলি তাঁর মল্লযুদ্ধে বাহবাপরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু আমার ত' তাঁর মুদ্রাদোষ অসহ্য মনে হচ্ছিল। এখানে একটা কথা ভেবে দেখা দরকার। যে গানের ভাব সুন্দর তার আনুষঙ্গিক ভাব ভঙ্গীও সুন্দর হওয়াটা যে একান্ত প্রয়োজন! নইলে ভাব বজায় রাখা কেমন ক'রে সম্ভবপর হ'তে পারে? মুস্তাক হোসেনের সেদিনকার লম্ফঝম্প, চক্ষু বিস্ফারণ, বদন ব্যাদান, ভূমিলুণ্ঠন, ভূয়ঃ চীৎকার ও হস্তোৎক্ষেপকে কোনও ভারতীয় সঙ্গীতানভিজ্ঞ ভিষক্‌রাজের পক্ষে ধনুষ্টঙ্কারের নিদান স্বরূপ গণ্য করাও বোধ হয় অসম্ভব ছিল না। লক্ষ্ণৌয়ের একজন সঙ্গীতজ্ঞ কাশ্মীরী ভদ্রলোক তাঁর কাণ্ডকারখানা দেখে বলেছিলেন যে সঙ্গীত নিশ্চয়ই একটা অসম্ভব রকমের মহৎ ব্যাপার; যেহেতু এতে নেই কি?— আতস বাজী আছে, ভুঁইপট্‌কা আছে—এমন কি ছুছুন্দর বাজীও বাদ যায়নি। অনুরূপ একজন গায়কের কৃতিত্ব সম্বন্ধে একটা গল্প

শুনেছিলাম। তাঁর ভক্ত বল্লেন—"মহাশয়, ওস্তাদপুঙ্গবের অসাধারণ সঙ্গীতনৈপুণ্যের কথা আর কি বল্ব? গাইতে গাইতে উন্মত্ত হ'য়ে তিনি শেষটা কিনা সতরঞ্চখানাকে কোলে তুলে নিলেন!"

সে দিন বিকেলে ৪টের সময় পাতিয়ালার প্রসিদ্ধ মম্মন খাঁর স্বরসাগর বাজালেন। স্বরসাগর যন্ত্রটি সেতার ও সারঙ্গী মিশিয়ে তৈরি করা। মাঝে মাঝে আঙ্গুলে ক'রে সেতারের ঢঙে বাজানো হয়, ঝঙ্কারও দেওয়া হয়। তবে বেশির ভাগ সময়ে ছড় দিয়ে সারঙ্গীটিই বাজানো হয়। এতে অবশ্য যন্ত্রটি সারঙ্গীর চেয়ে বেশি উপভোগ্য হ'য়েছিল সন্দেহ নাই। তবে তার প্রধান কারণ যন্ত্রটির ঔৎকর্ষ নয় অবশ্য; প্রধান কারণ—শিল্পী ছিলেন স্বয়ং মম্মন খাঁ। মম্মন খাঁ বৃদ্ধ হলেও তাঁর দক্ষতা এখনও অসামান্য। আমি নিজে ত অন্ততঃ এরূপ সারঙ্গী কখনও শুনিনি। তিনি একটি শ্রী ও ভীমপলশ্রী বাজালেন, কিন্তু সে যে কি মধুবর্ষণ কর্লেন তা' যিনি না শুনেছেন তাঁকে লিখে বোঝান অসম্ভব। তাই সে বিফল-প্রয়াস আমি কর্তে চাই না। তবে মম্মন খাঁর ছড়ের কায়দা সম্বন্ধে দু'একটা কথা না বলেই পার্ছি না। তিনি ছড়ের এক টানেই ২ মাত্রা, ৩ মাত্রা, ৪ মাত্রা, ৫ মাত্রা, ৬ মাত্রা ও ৭ মাত্রার ঝোঁক পর পর এমন পরিষ্কার দেখালেন যে তাঁর গুণপনার তারিফ না ক'রেই পারা যায় না। য়ুরোপে bow করাকে অভিজ্ঞরা একটা মস্ত আর্ট ব'লে মনে করেন। তাই মনে হ'য়েছিল তাঁরা বোধ হয় এ অদ্ভুত bowingএ কৃতিত্ব দেখ্লে আমাদের চেয়ে বেশি আশ্চর্য্য হ'তেন। মম্মন খাঁ স্বরসাগরে সময়ে সময়ে "একহাতেই" নানা তারগুলি বাজিয়ে যেতেন—যে ভাবে সাধারণ লোকে "দু'হাতে" বাজায়। সে কৃতিত্বও তাঁর প্রশংসনীয়। তবে তিনি শ্রেষ্ঠ শিল্পী এসবে নয়, তিনি শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন রাগের বিকাশে প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর্‌বার মধ্যে। **Mathew Arnold** লিখে গেছেন

যে শ্রেষ্ঠ কাব্য কি বুঝতে হ'লে শ্রেষ্ঠ কবির শ্রেষ্ঠ রচনাকে নমুনা হিসেবে চোখের সাম্‌নে ধরতে হবে; কারণ তারপর কোন্ কবিতা সাচ্চা ও কোন্ কবিতা ঝুঁটো সেটা সে নমুনার কষ্টিপাথরে এক মুহূর্ত্তেই ধরা পড়বেই পড়বে। সঙ্গীত সম্বন্ধেও তাই। শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত কি তা' বুঝতে হ'লে আলাউদ্দীন, আবদুল করিম, চন্দন চোবে, ফৈয়াস খাঁ, মন্মোহর লাল, ফিদা হোসেন, শেষণ, উজীর খাঁ, জয়পুরের গহর বাই, মম্মন খাঁ প্রমুখ জনকয়েক শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সৃষ্টিকেই কষ্টিপাথর হিসেবে ধ'রে নিলে বোঝা সহজ হবে যে কোন্‌টা সত্য আর্ট আর কোন্‌টা লম্ফঝম্প। মম্মন খাঁর সারঙ্গী শুন্‌তে শুন্‌তে আমার মনে সে পুরাতন আক্ষেপ নূতন ক'রে উদয় হয়েছিল যে, হায়! এমন সুন্দর যন্ত্রও আজ কিনা ওস্তাদ ও সমজদারদের দ্বারা অবজ্ঞাত! যে জাতি যন্ত্ররাজ্যে বীণা, শরোদ, সুরবাহার ও সারঙ্গীর সৃষ্টি করেছে তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবশ্য সময়ে সময়ে আশা না হয়েই পারে না; কিন্তু যখন আবার দেখি সঙ্গীতের মিষ্টত্বে অভিজ্ঞদের সাড়া দেওয়ার অক্ষমতা বা সারঙ্গীর বিরুদ্ধে ওস্তাদের অবজ্ঞা, তখন মনে সন্দেহ হয় বুঝি বা আমরা সঙ্গীতের চরম দান যে মধুরতা এ সরল সত্যটির প্রতি উড়ো তর্ক ও পাণ্ডিত্যাভিমানের আঁধিতে অন্ধ হ'য়ে বসে আছি।

১০ই জানুয়ারী বৈকালে মম্মন খাঁর "সুরসাগর" রাজানোর পর মথুরার বিখ্যাত চন্দন চৌবে গান গেয়েছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ঠাকুর নবাবালি আমাকে বলেছিলেন যে চন্দন চৌবের ধ্রুপদ তিনি আল্লাবন্দে খাঁর চেয়েও উচ্চশ্রেণীর বলে মনে করেন। বিখ্যাত সমালোচক ও পণ্ডিত ভাতখণ্ডে মহোদয়ও আমাকে ঐ কথাই বলেছিলেন। তিনি আমাকে বলেন যে চন্দন চৌবে আল্লাবন্দের মতন "আলাপী" নন্ বটে কিন্তু ধ্রুপদ গানে তাঁর চেয়ে বড়। আমি ইতিপূর্ব্বে লিখেছি (**Forward 8th February**) যে চন্দন চৌবে আল্লাবন্দে খাঁর চেয়ে বড় গায়ক এ কথা আমি নিজে একটা মস্ত কথা বলে মনে করি না। যেহেতু প্রথিতযশা আল্লাবন্দে খাঁ একজন বড় দরের মল্ল যোদ্ধা হ'তে পারেন, কিন্তু উচ্চদরের শিল্পী নন্। কেন নন্ সে কথার অবতারণা যথাস্থানে কর্‌ব যদিও ফলে বিজ্ঞ মহলের বিরাগভাজন হবার সম্ভাবনা যে পনর আনা সে কথা আমার অজ্ঞাত নেই। তবে সমালোচনা কর্ত্তে নেমে নির্ভীক ভাবে মতামত ব্যক্ত কর্ত্তে কুণ্ঠা বোধ কর্লে সমালোচকধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হতে হয় বলে এ অপ্রিয় কাজ জেনে শুনেই কর্ত্তে হবে; উপায় নেই। তবে সে কথা যথাসময়ে। আপাততঃ চন্দন চৌবের গান নিয়েই একটু আলোচনা করা যাক্।

প্রথম দিন চন্দন চৌবে একটি পূরবী ও একটি গৌরি গাইলেন। তবে সেদিন তাঁর গান তত জমে নি—যদিও তাঁর চমৎকার কণ্ঠস্বর ও মনোহর মিড় আমার খুবই ভাল লেগেছিল। কিন্তু ১৪ই জানুয়ারি রাত্রে যখন চন্দন চৌবে একটি বেহাগ গাইলেন তখন আমরা সকলে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম।

এখানে একটা কথা বলা দরকার মনে করছি। কথাটা এই যে ধ্রুপদ

সঙ্গীত ভাল হ'লেও খেয়ালকে সঙ্গীতরাজ্যে শ্রেষ্ঠতর সঙ্গীত মনে করার অনেক কারণ আছে। অবশ্য আমার এ কথা বলার উদ্দেশ্য এ নয় যে ধ্রুপদ কোনও হিসেবেই খেয়ালের মত শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য হতে পারে না। ধ্রুপদের মধ্যে এমন গুটিকতক গুণ আছে যা' খেয়ালের মধ্যে মেলে না। কিন্তু সব জড়িয়ে সঙ্গীতরাজ্যে খেয়ালের বিকাশ ধ্রুপদের চেয়ে মহত্তর। কেন মহত্তর সে সম্বন্ধে যুক্তি প্রয়োগ ক'রে বিস্তারিত আলোচনা অন্য প্রবন্ধে করার ইচ্ছে আছে। আজ কেবল মোটামুটি এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হওয়া যথেষ্ট মনে করছি যে, খেয়ালে যে তানালাপের স্বাধীনতা আছে, তালের বাঁধাধরা গঠনের দাবী হ'তে যে মুক্তি মেলে, কল্পনার রাশ ছেড়ে দেওয়ার যে সুযোগ পাওয়া যায় ধ্রুপদের মধ্যে তা পাওয়া যায় না।

তবু এক আবদুল করিমের ছাড়া আর কোনও খেয়ালীর খেয়ালই আমাকে আজ অবধি চন্দন চৌবের ধ্রুপদের চেয়ে বেশি আনন্দ দেয় নি। তবে এর প্রধান কারণ চন্দন চৌবের ধ্রুপদ একরকম খেয়ালই হয়ে পড়েছে। ভাতখণ্ডেও আমাকে বলেছিলেন যে চন্দন চৌবের ঢঙে ধ্রুপদ গাইতে তিনি কাউকে শোনেন নি, তার গানের ঢঙটি একেবারে তার নিজস্ব, মৌলিক। কথাটা চিন্তনীয়। পরে অনেকবার চন্দন চৌবের কাছে গান শুনে ও পরিশেষে মথুরায় তার শিষ্য হয়ে আমি পূর্ব্বোক্ত সত্যটি আবিষ্কার করি যে চন্দন চৌবে ধ্রুপদ ও খেয়াল মিশিয়ে এক অপূর্ব্ব মৌলিক ঢঙের সৃষ্টি করেছেন, যেমন প্রসিদ্ধ শিল্পী রায় সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার বাহাদুর খেয়াল ও টপ্পা মিশিয়ে তাঁর অপূর্ব্ব মনোহর ঢঙ গ'ড়ে তুলেছেন। চন্দন চৌবের ধ্রুপদ এত মিষ্টও এই জন্য যে তাঁর গান হচ্ছে বস্তুতঃ খেয়াল—কেবল সে খেয়ালকে তিনি ধ্রুপদের মুখোষ পরিয়েছেন মাত্র। এর একটা প্রধান প্রমাণ এই যে তাঁর ধ্রুপদ পাখোয়াজের সঙ্গেও যেমন শোনায়, তব্‌লার সঙ্গেও তেমনি শোনায়, যেটা খাঁটি ধ্রুপদের ক্ষেত্রে অসম্ভব।

অর্থাৎ খাঁটি ধ্রুপদের তাল বাঁধাধরা কাঠামের মধ্যে থাকতে বাধ্য ও তার সৌন্দর্য্যের অনেকটা নির্ভর করে পাখোয়াজের জলদ-গম্ভীর আওয়াজের ওপর। চন্দন চৌবের ধ্রুপদ তা. নয়। তিনি হাতে তাল দিয়েও গান না, তাঁর গানের গঠন-পদ্ধতির মধ্যে ধ্রুপদ-সুলভ সমান্তরালে ঝোঁকও নেই। গমক আছে বটে কিন্তু মিড়ই তাঁর প্রধান সম্পদ। এমন অপূর্ব্ব মিড় বড় শোনা যায় না। বস্তুতঃ তাঁর মনোহারী সঙ্গীতের প্রাণই হচ্ছে—তাঁর ভাব ও মিড়ের সম্পদ। তার ওপর তাঁর কণ্ঠস্বর তাঁর বৃদ্ধ বয়স সত্ত্বেও (চৌবেজীর বয়স ৬০ হবে) অতি মিষ্ট। আজকালকার ওস্তাদদের মধ্যে এরূপ মিষ্ট গলা অত্যন্ত বিরল। তাঁর গানে ত্রুটি যে নেই তা নয়। প্রধান ত্রুটি এই যে তাঁর গলা বেশি চড়ে না—অথচ তিনি নিরন্তর অত্যন্ত বেশিদূর চড়াতে যান। এতে তাঁকে এত কষ্ট কর্ত্তে হয় যে দেখ্‌লেও কষ্ট হয়। হার্ব্বার্ট স্পেন্সার তাঁর Purpose of Art বলে একটি চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধে ঠিকই লিখেছেন যে শ্রোতার মনে এরূপ কষ্ট বা সহানুভূতির উদয় হওয়া তার উপভোগের পক্ষে অনুকূল নয়। তাছাড়া চৌবেজীর গলা—বোধ হয় এই অত্যধিক strain করার দরুণ—একটু ভাঙা-ভাঙা। কিন্তু এ দুটি ত্রুটি সত্ত্বেও চৌবেজী একজন সত্যকার শিল্পী। চৌবেজী যে একজন প্রকৃত শিল্পী তার প্রধান কারণ তিনি যা গান তা' অনুভব করেন—কাজেই সে অনুভূতি জাগাতেও পারেন, যেতুহ, "He best can paint them who shall feel them most", কথাটি সব শিল্প সম্বন্ধেই একটি চরম কথা। আমাদের অধিকাংশ ওস্তাদদের দোষ হয় এই যে তাঁরা যা গান সেটা অনুভব করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রায় সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন। এতে ফল হয় এই যে তাঁদের গান প্রায়ই intellectual gymnastics এ পর্য্যবসিত হয়। অবশ্য গানের মধ্যে

এই intellectual আবেদন না থাক্‌লেও সে গান উচ্চসঙ্গীত হয় না, এ কথা আমি ইতিপূর্ব্বে বলেছি (Modern Review, May 1924)। কিন্তু তার সঙ্গে আবার emotional আবেদনটিও মূর্ত্ত করে তোলা শিল্পীর অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ এ emotional আবেদনটি না থাক্‌লে সে গান শুধু সায়েন্স হয়ে পড়ে, আর্ট থাকে না। আসল আর্টের মধ্যে এই দুই আবেদনের একটা সহজ সামঞ্জস্য বিরাজ কর্‌বেই করবে। চন্দন চৌবে, গহর বাই, ফৈয়াস খাঁ, আবদুল করিম, জানকী বাই, শেষণ, আলাউদ্দীন, ফিদা হোসেন, মন্মোহনলাল প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ শিল্পীর গান বাজনা শুন্‌লে একথা উপলব্ধি করা সহজ হয়ে ওঠে। বিশেষতঃ চন্দন চৌবের গানের মধ্যে এই emotional আবেদন অনন্যসাধারণভাবে পরিস্ফুট। কি আশ্চর্য্য তাঁর খাঁটি সুরের স্থায়িত্ব, কি সুন্দর তাঁর দুরূহতম গমক, কি মনোহর তাঁর সুমিষ্ট খোলা স্বর, কি প্রাণস্পর্শী তাঁর মিড়, ও সর্ব্বোপরি কি ভাবব্যঞ্জক তাঁর গানের সময়ে মুখের ভাব।

চন্দন চৌবের ভাব ভঙ্গী এতই সুন্দর যে সে সম্বন্ধে দু'একটা কথা না লিখেই থাকতে পাচ্ছি না। তাঁর ভাব ভঙ্গীকে মুদ্রাদোষ না বলে' মুদ্রাগুণ বল্লেই ঠিক হয়। আমি অনেকবার বলেছি যে গায়কের শুদ্ধ মুদ্রা (correct expression) অর্জ্জন করা একান্ত প্রয়োজন। য়ুরোপের একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক (Caruso) বলেছেন যে গাইতে হবে শুধু গলা দিয়ে নয়—প্রতি অঙ্গ দিয়ে। এখানে প্রশ্ন অবশ্য উঠতে পারে তবে আমি আমাদের ওস্তাদের দোষ দেই কেন—যখন উক্ত বাণীটির প্রশস্ততা সম্বন্ধে তারা এত কায়মনোবাক্যে সচেতন? উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে তারা সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে গায় বটে, কিন্তু তারা "যেভাবে" সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে গায় "সেভাবে" গাওয়াটা বোধ হয় স্বর্গীয় Caruso মহোদয়ের অভিপ্রেত ছিল না। তিনি যদি আজ হঠাৎ কবর হতে উঠে এসে

আমাদের সাধারণ ওস্তাদদের তাঁর উপদেশানুবর্ত্তিতার হৃৎস্তম্ভনকারী দৃষ্টান্ত একবার দেখতেন তাহলে খুব সম্ভবতঃ তিনি স্বীয় ললাটে করাঘাত করে সেই সনাতন ভিখারীর প্রতিধ্বনি ক'রে বল্‌তে বাধ্য হতেন "উল্‌টা বুঝিলি রাম।"

কিন্তু সুখের বিষয় এই যে চন্দন চৌবে তাঁকে 'উল্টা বোঝেননি'। তাই তাঁর মুখের বা অঙ্গের প্রতি ভঙ্গিটী তাঁর গানের প্রতিকূল না হ'য়ে সহায়কই হ'ত। একথা চন্দন চৌবের অনুপম সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগীই লক্ষ্য ক'রে থাক্‌বেন।

সে দিন (১০ই জানুয়ারী) রাত্রি ন'টার সময় গান আরম্ভ কর্‌লেন— পণ্ডিত ভাতখণ্ডের তরুণ শিষ্য শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকর। রতনজনকর গুজরাতী যুবক, বয়স ২২।২৩ বৎসর হবে। এঁর গান অতি সুন্দর। ইনি খেয়াল শিখেছিলেন বম্বেতে ভাতখণ্ডের কাছে ও তান কর্ত্তব্ শিখেছিলেন বরোদায় ফৈয়াস খাঁর কাছে। এঁর কথা আমি ইতিপূর্ব্বেই "ভ্রাম্যমানের দিন-পঞ্জিকায়" লিখেছিলাম। এঁর খেয়ালের ঢঙ অতি উৎকৃষ্ট ও এঁর রাগরাগিণী ভাতখণ্ডের কাছে শেখা বলে' অতি বিশুদ্ধ, একথা বলাই বেশি। এঁর গান শুনে আমার ভাতখণ্ডের সঙ্গীত-শিক্ষাপদ্ধতির উপর শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গিয়েছিল। ভাতখণ্ডে বম্বেতে আমাকে বলেছিলেন যে, রতনজনকরকে তিনি ৪০০।৫০০ খেয়াল শিখিয়েছিলেন। তারপর বরোদায় গাইকবারকে ব'লে সেখানে বিখ্যাত ফৈয়াস খাঁর কাছে তানালাপ শিখতে পাঠান। কিন্তু ফৈয়াস খাঁ ওস্তাদদের মতন শেখাতে একান্তই নারাজ

ছিলেন ও পাঁচ বৎসরে রতনজনকরকে মোটে ২৫টি গান শিখিয়েছিলেন। ওস্তাদরা তাঁদের পুঁজি অপরকে শেখাতে যে কত অনিচ্ছুক, রতনজনকরের মত প্রতিভারও এভাবে প্রত্যাখ্যাত ও অনাদৃত হওয়াটা তার অন্যতম দৃষ্টান্ত মাত্র। রতনজনকর আমাকে বলেছিলেন যে তাঁর কত সময়ই না বাধ্য হ'য়ে নষ্ট কর্তে হ'য়েছে—যেহেতু ফৈয়াস খাঁর ঝুলিতে আর যারই অভাব থাকুক না কেন, না-শেখাবার ওজর-আপত্তির অভাব কখনও হ'ত না। অথচ হেতু এইমাত্র যে তিনি বড় ওস্তাদ ও সত্যকার গুণী। কেন না, সব শাস্ত্রেই আছে গুণী গুণং বেত্তি—এক ওস্তাদী শাস্ত্রে ছাড়া!

রতনজনকরের রাগের বিকাশ দেখাবার পদ্ধতি সত্যই উচ্চাঙ্গের। তার উপর তিনি শিক্ষিত হওয়ার দরুণ তাঁর গানে ওস্তাদসুলভ মুদ্রাদোষ বা লম্ফঝম্প ছিল না। গানের প্রাণটি কোথায় তিনি সেটা জান্‌তেন। আমি একাধিকবার বলেছি যে সঙ্গীতে গুণীর ব্যক্তিত্বের নানান্ সৌকুমার্য্য (**refinement**) না ফুটে উঠেই পারে না, একথাটা ওস্তাদিপন্থীরা যেন অনেক সময়েই ঠিক্ উপলব্ধি করেন না। কারণ তাঁরা ভাবেন যে ভাল ক'রে গান গাইতে হ'লে শুধু বুঝি কায়দা দুরস্ত হ'লেই হয়; শুধু বুঝি রাগরাগিণীর অনবদ্য জ্ঞান থাক্‌লেই যথেষ্ট; শুধু বুঝি তান লয় নিখুঁত হ'লেই হ'য়ে গেল। কিন্তু অন্যান্য ললিত কলার ন্যায় সঙ্গীতেও যে আমাদের নানান্ দিকে সৌন্দর্য্যানুভূতি ফুটে না উঠেই পারে না, এ সত্যটির প্রতি পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায় বড় বেশি উদাসীন ব'লে মনে হয়। অনেকের মুখে প্রায়ই আক্ষেপ শোনা যায় যে, যে ওস্তাদটি চলে গেল তেমনটি আর কখনও জন্মাবে না। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমাদের সঙ্গীতের **Renaissance** আরম্ভ হ'য়েছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আমাদের সঙ্গীত সৌন্দর্য্যের বিকাশে ভূত সঙ্গীতের চেয়েও মহিমময় হ'য়ে উঠবে। আমার এ বিশ্বাসের প্রধান ভিত্তি এই নিশ্চয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত যে অদূর ভবিষ্যতে শিক্ষিত

সুকুমারহৃদয় ভদ্র সম্প্রদায়ই হবেন আমাদের উচ্চসঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ও সাধক, এবং সত্যকার শিক্ষা ও cultureএর যোগাযোগে আমাদের সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে তখন যে অভিনব সৌন্দর্য্যটি মূর্ত্ত হ'য়ে উঠবে বিগত যুগের ওস্তাদসম্প্রদায়ের তার সম্যক্ ধারণা ছিল না। কারণ, তাঁদের মধ্যে সঙ্গীতে অনেক সময়েই সাধারণ দক্ষতার অভাব না থাক্‌লেও সে সুকুমার অনুভূতি তেমন ভাবে ফুটে উঠতে পারেনি, যে অনুভূতি যথাযথ ভাবে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠতে পারে এক আমাদের নানান্ কোমল চিত্তবৃত্তির মনোজ্ঞ বিকাশ-সামঞ্জস্যের ভিতর দিয়ে। গুজরাত, * ও বাংলার নানান তরুণ talent-এর সনে সংস্পর্শে এসে কথাটি আমি বার বার উপলব্ধি করেছি। অবশ্য এটা ঠিক্ যে নূতন সম্প্রদায় যখন গ'ড়ে উঠ্‌বে তখন তাহার পরিণতির ধারা ঠিক্ আগেকার ওস্তাদদের মতন হবে না। কারণ এ নূতন সম্প্রদায়ের সঙ্গীতের মধ্যে তাদের শিক্ষা, সৌকুমার্য্য ও জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ছাপ পড়বেই যেটা ওস্তাদি সঙ্গীতের মধ্যে ফুটে উঠতে পারেনি। কিন্তু সেটা আক্ষেপের বিষয় ব'লে মনে না ক'রে, মূলতঃ আনন্দেরই বিষয়। একথা বলা অবশ্য আমার উদ্দেশ্য হ'তেই পারে না যে এ জন্য বর্ত্তমান ওস্তাদি সঙ্গীতকে অবজ্ঞা করাই উচিত। কারণ ওস্তাদি সঙ্গীতের আমি আন্তরিক অনুরাগী। তা' ছাড়া আমি জানি এবং মানি যে আমাদের ওস্তাদেরা আমাদের উচ্চ সঙ্গীতের চর্চ্চা রেখেছেন ব'লেই সেটা আজও জীবন্ত আছে— (যদিও আজ সে জীবনীশক্তি প্রায় মুমূর্ষু হ'য়ে পড়েছে এ কথাও সত্য)। তাই অধিকাংশ ওস্তাদই সত্যিকার শিল্পী না হ'লেও কতিপয় ওস্তাদ এখনও জীবিত আছেন যাঁদের

* এ বালকটী এলাহাবাদে থাকে। উচ্চবংশীয় ও শিক্ষিত পরিবারের ছেলে। বয়স ১০।১১ বৎসর। লক্ষ্ণৌয়েও এ বালকটি গেয়েছিল—তবে সে কথা যথাস্থানে লিখ্‌ব।

সৌন্দর্য্যানুভূতি মহনীয় ব'লে তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও, সত্য শিক্ষার যোগাযোগ থাক্‌লে এঁদের গানও যে শতগুণে বরেণ্য ও মহিমময় হ'য়ে উঠত, রতনজনকরের গান শুনে ও পণ্ডিত ভাতখণ্ডের শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে এ কথা আরও বেশি ক'রে মনে না হ'য়েই পারে না। অল্প বয়সেই সুশিক্ষার প্রভাবে রতনজনকর তাঁর গানে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা' শুন্‌লে সঙ্গীতজ্ঞ মাত্রেই বোধ হয় উপলব্ধি কর্‌তে পার্‌বেন গানে cultureএর স্থানকে কেন একটু বড় ক'রে দেখা দরকার। রতনজনকর তাঁর সুন্দর মিড়, তান, গমক ও শুদ্ধ সুরের মধ্য দিয়ে যে রসটি সেদিন ফুটিয়ে তুলেছিলেন, খুব কম ওস্তাদের পক্ষেই সেটা সম্ভব, এ কথা আমি নিঃসঙ্কোচে বল্‌তে পারি। রতনজনকরের একমাত্র ত্রুটি—তাঁর কণ্ঠস্বর একটু চেরা, গোল ও উদাত্ত নয়। তাঁর স্বর অমিষ্ট না হ'লেও মিষ্টত্বে গরীয়ানও নয়। তিনি যদি কেবল এ মিষ্টত্ব বাড়াবার দিকে একটু দৃষ্টি রাখেন তা' হ'লে তাঁর মতন সুগায়ক আমাদের দেশে মেলা ভার হবে।

সেদিন শেষ বাজালেন বিখ্যাত শিল্পী আলাউদ্দীন খাঁ। ইতিপূর্ব্বে তিনি বাজিয়েছিলেন শরদ। সেদিন বাজালেন বেহালা। আলাউদ্দীনের শরদ শুন্‌লে মনে হয় শরদ শেখাই হচ্ছে সব চেয়ে বাঞ্ছনীয়; আবার তাঁর বেহালা শুন্‌লে মনে হয় শরদ ছেড়ে বেহালাই শেখা ভাল। এক হাফেজ আলির কাছে ছাড়া এমন শরদ ও বেহালা আমি স্বদেশে কখনও শুনিনি। ফিদা হোসেনের চেয়েও আলাউদ্দীন ভাল শরদ বাজান। এবং এটা বড় সামান্য কথা নয়। কি তাঁর রাগরাগিণীর উপর কর্ত্তৃত্ব! এবং কি তাঁর অবলীলাক্রমে বাজানর ভঙ্গী! যখন দুরূহতম সুর নিয়ে তিনি আলাপ কর্‌তেন, তখনও মনে হ'ত যেন সে সব তাঁর কাছে ছেলেখেলা। বিলম্বিত লয়ে, চিকারির কাজে, দ্রুত লয়ে, আড়ি কুয়াড়ির চালে—সব তাতেই

তাঁর নিপুণতা ফুটে উঠ্‌ত এমন স্বাভাবিকভাবে যে মনটা বিস্ময়ে ও আনন্দে লুটিয়ে না পড়েই পার্‌ত না। তাঁর একমাত্র ত্রুটি ছিল তাঁর দ্রুত লয়ের একটু বেশি পক্ষপাতিত্ব। তিনি এটা কর্‌তেন বোধহয় তাঁর জলদ লয়ের কাজ দেখানোর জন্য; কিন্তু যে মূহুর্তে শিল্পীর উদ্দেশ্য হয় আত্ম-প্রকাশ নয়, অপরের বিস্ময়োৎপাদন, সে মুহূর্ত্তে তিনি কমবেশি ভ্রষ্ট না হয়েই পারেন না। এইখানে হয়ত ফিদা হোসেন তাঁর চেয়ে উপরে উঠেছিলেন, যদিও সব জড়িয়ে আলাউদ্দীন তাঁর চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ বাদক ছিলেন।

আলাউদ্দীনের সঙ্গে শরদে সঙ্গত করেছিলেন বিখ্যাত আবেদ হোসেন। আলাউদ্দীন আমাকে পরদিন বলেছিলেন যে আবেদ ক্রমাগতই তাঁর লয়কে জলদের দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা কর্‌ছিলেন। বল্লেন "আমারও ত রক্তমাংসের শরীর, তাই শেষটায় আমিও বল্লাম আচ্ছা, দেখা যাক্ কত জলদ্ তুমি কর্‌তে পার।" ফলে সেদিন হ'ল এই যে আলাউদ্দীন ক্রমশঃ এমন বিদ্যুদ্বেগে জলদ লয়ে পৌঁছুলেন যে আবেদ সেই লয়ে শুদ্ধ ঠেকা দিতেই গলদ্‌ঘর্ম্ম-কলেবর হ'য়ে উঠ্‌লেন। আর একটু জলদ্ কর্‌লেই যেন তাঁকে ইস্তফা দিতে হ'ত মনে হ'ল। এমন সময়ে ঠাকুর নবাবালি আলাউদ্দীনকে বল্‌লেন যে গান বাজনায় এরূপ প্রতিযোগিতায় আর্ট নষ্ট হয়ে যায়। তখন আলাউদ্দীন নিরস্ত হ'লেন। কথাটা সত্য। তবলার সঙ্গে গুণীর এই রূপ যুদ্ধে শেষটা প্রত্যেকের লক্ষ্য হয়,—অপরকে পরাস্ত করা, নিজের সৌন্দর্য্যানুভূতি প্রকাশ করা নয়। এরূপ প্রবৃত্তি প্রশস্ত নয় একথা বলাই বেশি। গান বাজনায় নন্ কো-অপারেশনের স্থান নেই পরস্পরে পরস্পরের সঙ্গে কো-অপারেশন না কর্‌লে সঙ্গতের উৎকর্ষ সাধিত হ'তে পারে না। দ্বিতীয় দিন যখন আলাউদ্দীনের বেহালার সঙ্গে কাশী বিখ্যাত বীরু মিশ্র সঙ্গত করছিলেন তখন এই সত্যটি যেন **contrast**

আরও বেশি ক'রে ফুটে উঠেছিল। সেদিন আলাউদ্দীনের ও বীরুর একত্র বাজনায় যে রসটি ফুটে উঠেছিল সেটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিল্পীযুগলের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সঙ্গতের রস। এ রসটির মধ্যে যে কি পুলক-শিহরণের উপাদান বিরাজ কর্‌তে পারে তা সম্যক বুঝতে পারেন—এক বোদ্ধা রসিক। সত্যই সেদিনকার স্মৃতি ভুল্‌বার নয়। প্রত্যেকেই জীবনে কখনও না কখনও এমন কোন আনন্দ না পেয়েই পারেন না যার স্মৃতি স্মরণ মাত্রেই তাঁর মনে সেই পূর্ব্বানুভূত গভীর আনন্দের পরশ এনে দিয়ে থাকে। কে না জানে যে আমাদের সৌন্দর্য্যানুভূতির কোনও কোনও দিনের উপলব্ধি যেন আমাদের মানস-চক্ষুর সামনে এক গভীর রহস্যের পর্দ্দা হঠাৎ উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে যায়? আলাউদ্দীনের সেদিনকার বেহালা ও বীরু মিশ্রের তব্‌লা সঙ্গত অন্ততঃ আমার মনে ঐ রকম ভাবেই হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের আদর্শ সঙ্গতের গভীর আনন্দস্পর্শ এনে দিয়েছিল। আলাউদ্দীন ও বীরুর সেরাত্রির বাজানো ছিল যা হওয়া উচিত, অর্থাৎ—সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা নয়। বীরু মিশ্র যে একজন কত বড় শিল্পী ও আমাদের তব্‌লা বাজানো যে একটা কত বড় শিল্প তা তাঁর সেদিনকার বাজনা যিনিই শুনেছেন তিনিই বোধ হয় মনে প্রাণে উপলব্ধি না ক'রেই পারেন নি। আমি সেদিন যে বেহালা শুনেছিলাম ও যে তব্‌লা শুনেছিলাম সে রকম বাজনা বা সঙ্গত আমাদের দেশে কখনও শুনি নি। য়ুরোপীয়দের বেহালা অবশ্য আমার সব চেয়ে ভাল লাগে—কিন্তু ভারতবর্ষে কখনও আলাউদ্দীনের মতন বেহালাও শুনি নি বা বীরু মিশ্রের মতন তব্‌লাও শুনি নি। আলাউদ্দীন ও বীরুর পরস্পরের প্রতি চাহনির ও হাসির প্রত্যেক ভঙ্গীটি সেদিন উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল—যে রস কেবল গুণীর ও সঙ্গতকারের মধ্যে সম্পূর্ণ সহানুভূতির নিবিড় বন্ধনের মধ্যে দিয়েই ফুটে উঠতে পারে।

সেদিন আর একজন মস্ত বড় গুণী সেতার বাজিয়েছিলেন। ইনি বিখ্যাত এম্‌দাদ খাঁর পুত্র এনায়েৎ খাঁ। এম্‌দাদ খাঁ গ্রামোফোণে একটি জৌনপুরী টোড়ি বাজিয়েছেন। গ্রামোফোণে এ জৌনপুরী টোড়িটির চেয়ে ভাল যন্ত্রসঙ্গীত আমি শুনি নি। এনায়েৎ খাঁর বাজনা শুনে মনে হ'ল শিল্পী-পিতার যোগ্য পুত্র বটে। লক্ষ্ণৌ কন্‌ফারেন্সে যত সেতারী এসেছিলেন তার মধ্যে এনায়েৎ খাঁই সবচেয়ে ভাল বাজিয়েছিলেন। এনায়েৎ খাঁ স্বর্ণপদকও পেয়েছিলেন। এনায়েৎ খাঁর বাজনার মধ্যে যে জিনিষটি ছিল সেই জিনিষটিই হচ্ছে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের আসল বস্তু, অর্থাৎ হৃদয়ের সৌন্দর্য্যানুভূতি। এক ভাওনগরের বৃদ্ধ রহিম খাঁ ছাড়া—(যাঁর কথা আমি ইতিপূর্ব্বে লিখেছি)—আমি এনায়েৎ খাঁর মতন হৃদয়-স্পর্শী সেতার কখনও শুনেছি ব'লে মনে হয় না। (আলাউদ্দীনের সেতার আমি অনেকদিন আগে একবার মাত্র শুনেছিলাম, তবে সে কথা স্মরণ নেই ব'লে আমি এ দুজনের মধ্যে তুলনা কর্ত্তে পারি না।) যেমন তাঁর প্রকাশভঙ্গী, তেম্‌নি তাঁর দরদ, তেম্‌নি তাঁর মর্ম্মস্পর্শী মিড় ও তেম্‌নি তাঁর গভীর অনুভূতি! এনায়েৎ খাঁ লক্ষ্ণৌয়ে প্রধানতঃ ঠুংরিই বাজিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর ঠুংরি বাজনা যে খেয়ালের চেয়ে বিশেষ হীন ছিল না একথা বলা বোধ হয় অত্যুক্তি নয়। এনায়েৎ খাঁ বড় রাগের আলাপ করেন নি—প্রথমদিন একবার মাত্র একটি ইমনকল্যাণ আলাপ ছাড়া—কিন্তু কাফি, পিলু, খাম্বাজ প্রভৃতি যে সব ঠুংরির রাগের আলাপ করেছিলেন তাতে আমাদের মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন ও তাতে মনে হয়েছিল ঠুংরিই তাঁর forte। এনায়েৎ খাঁর ঠুংরি গৎ ও মিড় প্রভৃতির মধুর স্পর্শে আমারও প্রথম দিনই এই কথাই মনে হয়েছিল। এনায়েৎ খাঁর একমাত্র দোষ—তিনি বাজাবার সময় মুখ নীচু করে থাকতেন ও

মনোজ্ঞ অবয়ব ভঙ্গীর সাহায্যে বিষয়টিকে ফুটিয়ে তোল্‌বার কোনই প্রয়াস পেতেন না। আর এক কথা; আলাউদ্দীন, শেষণ প্রভৃতির মতন অত হাত দুরস্ত তাঁর ছিল না। কখনও কদাচিৎ একটু আধটু বেপর্দ্দায় হাত পড়ে যেত। তবে নানান্ ঝঙ্কার রাশির মধ্যে এরূপ একটু আধটু ত্রুটিকে মারাত্মক ত্রুটি ব'লে গণ্য করা উচিত নয়। তাই তাঁর এ সামান্য ত্রুটি-সত্ত্বেও বলা চলে যে তাঁর বাজনার মধ্যে দোষ ধরার বিশেষ কিছুই ছিল না বল্‌লেই হয়। তিনি মাঝে মাঝে কাফীতে তীব্র ধৈবত থেকে কোমল ধৈবত হ'য়ে পঞ্চমে নেমে, বা খাম্বাজে নিখাদ হ'তে কোমল নিখাদ হ'য়ে ধৈবতে নেমে এমন মনোহর রসসঞ্চার কর্‌তেন (একে ইংরাজীতে বলে accidental ব্যবহার করা) যার সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত না হ'য়েই পারা যায় না। এই সব surprises তাঁর বাজনার মধ্যে প্রায়ই থাক্‌ত ব'লে বোধহয় তাঁর কলাকারু আরও হৃদয়গ্রাহী হত। প্রকৃত শিল্পী অতি জানিত পর্দ্দাপরম্পরার মধ্যেই এমন স্বরবিন্যাস বেছে নিয়ে থাকেন যে বিন্যাস অতি সহজ বোধ হ'লেও এক শিল্পীহৃদয়ের কাছেই ধরা দেয়। এ বেছে নেওয়াটা যেন অনেকটা ইন্দ্রজাল বিদ্যার (magic) মতন। অর্থাৎ ব্যাপারটা কি দেখিয়ে দিলে তা জলের মতনই সোজা হয়ে যায় কিন্তু না দেখিয়ে দিলে মনটা অনুক্ষণ সচকিত না হ'য়েই পারে না। এনায়েৎ খাঁ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্য্য চৌধুরীর সভাবাদক। আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় সঙ্গীতানুরাগী মাত্রেরই অভিনন্দনীয়। দুঃখ এই যে অনুরূপ কোনও ধনী সমজদার আলাউদ্দীনকে কল্‌কাতায় এনে রাখ্‌তে পারেন না। কারণ আলাউদ্দীন এনায়েৎ খাঁ, ফিদাহোসেন, মন্মোহনলাল, *

---

† এই সুরবাহারীটি ঢোলপুরের রাজার ওখানে অতি অল্প মাহিনায় নিযুক্ত আছেন এত উচ্চদরের সুরবাহার আমি কখনও শুনি নি। ইনিও লক্ষ্ণৌয়ে তাঁর অপূর্ব্ব সুরবাহার আলাপে আমাদের মুগ্ধ করেছিলেন, তবে সেকথা যথাস্থানে।

হাফেজআলি খাঁ প্রমুখ বাদকদের বাজনা শোনাই হচ্ছে আমাদের যন্ত্র-সঙ্গীতের প্রাণস্পর্শ করবার শ্রেষ্ঠ উপায়। বক্তৃতা বা লেখায় আমাদের যন্ত্রসঙ্গীতের বিকাশের উপর শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধা আনা যেতে পারে মাত্র, কিন্তু অনুরাগ সঞ্চার কর্ত্তে পারেন এক শিল্পী ও স্রষ্টা—বিশ্লেষক বা সমালোচক নন। তাই আলাউদ্দীন, এনায়েৎ খাঁ প্রমুখ সত্যকার শিল্পী বাদকের বাজনা যাতে সঙ্গীতানুরাগীরা বেশি শুন্‌তে পান সে চেষ্টা করা একান্ত বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। কারণ সকলেই কিছু শিখে বোদ্ধা হ'তে পারে না। তবে শুনে সমজদার হ'তে অনেকেই পারে।

পরদিন (১১ই জানুয়ারী) রবিবার সকাল বেলা বালক চন্দ্রশেখর দু'টি গান গেয়েছিল! এই বালকটির গান সম্বন্ধে আমি দু'চারটি কথা বল্‌তে চাই, যদিও আমি জানি যে আমি এ সম্পর্কে যা বল্‌ব তার সঙ্গে অধিকাংশ ওস্তাদেরই মতে মিল্‌বে না। তবে যেহেতু আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের উচ্চ সঙ্গীতের outlookএর একটা মূলগত পরিবর্ত্তন না হ'লে তার পুনর্জ্জন্ম অসম্ভব, সেহেতু আমি এ বালকটির গানের প্রসঙ্গে আমাদের উচ্চ সঙ্গীতের outlook নিয়ে একটু আলোচনা করা দরকার মনে কর্‌ছি।

এ বালকটীর বয়স ১০-১২ বৎসর। নাম চন্দ্রশেখর, কোনও বিশিষ্ট পদস্থ আচারী ব্রাহ্মণ বংশীয়। এর মাতুল শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ যোশী একে প্রায় শতাধিক শুদ্ধ রাগ শিখিয়েছেন। তিনি এলাহাবাদে থাকেন ও নিজে গান না কর্‌লেও গান সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। তার ওপর তিনি রীতিমত শিক্ষিত ও সুকুমারহৃদয় (refined) লোক। এ বালকটিও তাঁর কাছেই থাকে ও সঙ্গীতে খুব ভাল রকম শিক্ষাই পাচ্ছে। সুশিক্ষিত, ভদ্রবংশীয় বিশেষজ্ঞ মাতুলের কাছে চন্দ্রশেখর প্রায় আদর্শ শিক্ষা পাচ্ছে বল্‌লেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না। তার উপর বালকটির সঙ্গীত-

প্রতিভা অসামান্য। বৎসর দুই আগে চন্দ্রশেখর মাত্র তিন মাসে ৭২টি ধ্রুপদ গান শিখেছিল। আমি ইতিপূর্ব্বে লক্ষ্ণৌয়ে এর গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম। এর সঙ্গীতে পারদর্শিতার মূল যে নিছক্ প্রতিভা সেটা এর গান একবার মাত্র শুন্‌লেই বোঝা যায়। বিখ্যাত জার্ম্মাণ সঙ্গীতরচয়িতা (composer) Mozart অতি অল্প বয়সেই সঙ্গীতে অদ্ভুত প্রতিভা দেখিয়েছিলেন। সুইজর্লণ্ডে ও হাঙ্গেরিতে দু'টি ছোট ছেলেকে আমি অদ্ভুত পিয়ানো বাজাতে শুনেছিলাম। এরূপ শিশুকে বলে prodigy। আমাদের দেশেও শিশুদের মধ্যে সময়ে সময়ে অসামান্য সঙ্গীত-প্রতিভার দর্শন মেলে। ভাগলপুরের উকীল ৺উপেন্দ্রনাথ বাক্‌চী মহোদয়ের এক পৌত্রীকে ৬ বৎসর বয়সে ধামারে ধ্রুপদ গাইতে শুনেছিলাম। মাষ্টার মদনের অবিসংবাদিত প্রতিভা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। আমেদাবাদে এক ব্যবসায়ীর চার বৎসর বয়স্ক পুত্রের মুখে দুরূহ রাগের আলাপ শুনে আশ্চর্য্য হয়েছিলাম। এই লক্ষ্ণৌ সম্মেলনেই আর একটি বালক prodigy এসেছিল, যার কথা যথাস্থানে লিখ্‌ব। কিন্তু আমি আমাদের দেশের কোনও শিশু প্রতিভার গান শুনে' তত মুগ্ধ হইনি যত মুগ্ধ হয়েছিলাম বালক চন্দ্রশেখরের গান শুনে। আমি একবার কাশী হতে এলাহাবাদে গিয়েছিলাম শুধু এর গান শুন্‌তে, যদিও খুব ডাকসাইটে নাম শুনে গান শুন্‌তে গিয়ে আমাকে এত বেশী নিরাশ হ'তে হয়েছে যে খুব কম ওস্তাদ আছে যার গান শুন্‌তে আজ আমি ১০০ মাইল রাস্তা ট্রেণে যেতে মনকে রাজী করতে পারি।

এ বালকটির গান শুনে আমার নানান্ কথাই মনে হ'য়েছে। সে সব কথার বিস্তারিত আলোচনা করা এ প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়। তবে এ প্রসঙ্গে একটি কথার একটু বিস্তারিত আলোচনা আমি না ক'রেই পার্‌ছি না।

প্রথমতঃ চন্দ্রশেখরের গান শুনে আমার মনে হ'য়েছিল উচ্চ সঙ্গীতে

সুকণ্ঠের মূল্য যে কত বেশি সে সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট সচেতন নই। নইলে স্বভাবতঃ মিষ্ট গলার প্রতিও ওস্তাদেরা এত উদাসীন হ'তে পার্‌তেন না। এ সম্বন্ধে আমি আমার এক পূর্ব্ব প্রবন্ধে লিখেছিলাম যে কণ্ঠস্বরের মিষ্টতাবর্দ্ধনের মতন প্রয়োজনীয় সাধনা সঙ্গীতে অল্পই আছে, যদিও ওস্তাদেরা এ প্রয়োজনীয়তাটি মনে প্রাণে উপলব্ধি করেন না। তার উত্তরে একজন ওস্তাদিপন্থী ফরওয়ার্ডে তাঁদের সনাতন মতই সমর্থন ক'রেছিলেন। তিনি আদ্যন্ত অবিমিশ্র কালোয়াতিরই সমর্থন করে যা বলেছিলেন তার মোদ্দা কথাটি এই যে —"না, কণ্ঠস্বরের মিষ্টত্বের তত দাম নেই। আসল কথা সুর শুদ্ধ হ'লেই হ'ল। এরূপ নিছক্ **classicism**এর স্বপক্ষে যে অনেক কথাই বল্‌বার আছে তা' আমি বিলক্ষণ জানি *। তবে পুনরুক্তি ভয়ে সে কথা না তুলে আমি আজ কেবল এই কথাটি খুব জোর ক'রে বল্‌তে চাই যে উচ্চ সঙ্গীতে শুদ্ধ সুর যত দরকার সুকণ্ঠ তার চেয়ে কম দরকারী নয়। কেবল বিশুদ্ধ সুর ও রাগ আমাদের ততটা সঙ্গীতানন্দ দিতে পারে না বা বেশি ক্ষণ শোনাও যায় না যদি সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠস্বর মিষ্ট না হয়। অনভিজ্ঞের মনে হ'তে পারে এটা ত common sense, কিন্তু তাঁদের কাছে আমার অনুরোধ এই যে, তাঁরা যেন এই কথাটি কখনও না ভোলেন যে ওস্তাদিপন্থীদের মধ্যে common senseএর মতন uncommon জিনিষ জগতে বড় কমই আছে। নইলে তাঁদের মহলে জানকী বাঈ, অচ্ছন বাঈ, জহরা বাঈএর আদর হয় না (যাঁদের কণ্ঠস্বরে পাষাণও বোধ হয় বিগলিত হয়) আদর হয়—এমন সুস্বর ওস্তাদের যাঁদের স্বর শুনলে

---

* ১৯২৪ সালে এপ্রিলের মাঝামাঝি Forwardএ ও ১৯২৩এ জানুয়ারীতে Rupam কাগজে Classical Music of Northern India শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সরল বালক বা অবলা বালা মূর্চ্ছা যদি বা না যান রাত্রে বিভীষিকা বোধ হয় না দেখেই পারেন না। অবশ্য আমি একথা বলি না যে সুকণ্ঠই সব; কারণ আমি বার বার বলেছি হিন্দুস্থানী সঙ্গীত এত উচ্চ বিকাশ লাভ ক'রেছে যে সেটা বহুদিন ধ'রে শিক্ষা না করলে আয়ত্ত করা যায় না। তবে সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলি যে তানলয়ের শুদ্ধতাই সব নয়। আমাদের দেশে সুকণ্ঠের আদর নেই ব'লেই সুকণ্ঠ এত বিরল; যেমন য়ুরোপে অমিষ্ট কণ্ঠের প্রতি অবজ্ঞা অত্যন্ত বেশি ব'লে সেখানকার অধিকাংশ পেশাদারী গায়ক গায়িকাই সুকণ্ঠ। কোথায় প'ড়েছিলাম যে, যে দেশে যার আদর নেই সে দেশে তা জন্মায় না; আমেরিকায় সাহিত্যিকের, চিত্রকরের বা গায়কের আদর নেই কিন্তু লক্ষপতির আছে, তাই সেখানে শিল্পীর স্থলে জন্মেছে—বণিক। পক্ষান্তরে রুষ দেশে ধার্ম্মিক খৃষ্টান ও উচ্চ সাহিত্যিক জন্ম গ্রহণ ক'রেছে কিন্তু আমেরিকার মতন রাস্তায় ঘাটে লক্ষপতি মেলে না। য়ুরোপীয়েরা সঙ্গীতে সুকণ্ঠের স্থান অতি উচ্চে মনে করে, তাই পাশ্চাত্য গায়ক গায়িকা সুকণ্ঠের উৎকর্ষ সাধন করার জন্য যে কি সাধনা করেন সে কথা যিনিই য়ুরোপীয় সঙ্গীতের কিছু খবর রাখেন তিনিই জানেন। ফলে সেখানে হ'য়েছে এই যে, কোন গায়কের কণ্ঠস্বর অমিষ্ট হ'লে তার গান কেউ শোনেই না। পক্ষান্তরে আমরা উড়ো তর্কের আঁধিতে এই সরল সত্যটির প্রতি অন্ধ হ'য়ে বসে আছি যে চিত্রকলায় দর্শনেন্দ্রিয়ের উপর অঙ্গসৌষ্ঠবের আবেদনের মূল্য যতখানি, গানে শ্রবণেন্দ্রিয়ের উপর স্বর-মাধুর্য্যের আবেদনের মূল্য তার চেয়ে অণুমাত্রও কম নয়। মনে করুন দেখি কোন কুৎসিৎগঠনা রমণীর চিত্র হাজার নিখুঁত হ'লেও আমাদের কি সে আনন্দ দিতে পারে, যে আনন্দ ভিনাস ডি মিলোর অনুপম গঠন-কল্পনা বা রাফেলের সিষ্টিন ম্যাডোনার উদ্ভাসিত আনন দিতে সক্ষম? গানের ক্ষেত্রেও ঠিক ঐ কথা। শুদ্ধ রাগ গাওয়ার কৃতিত্বের

আমরা খুব তারিফ কর্ত্তে পারি, কিন্তু সে কৃতিত্বে মন মোহিত হয় না, যদি গায়কের কণ্ঠস্বর মিষ্ট না হয়। আমাদের দেশের অনভিজ্ঞ সঙ্গীতানুরাগী হয়ত সুকণ্ঠের জন্য আমার এতটা ওকালতি বাহুল্য মনে করতে পারেন; কিন্তু যিনিই আমাদের ওস্তাদদের সুকণ্ঠের প্রতি নিহিত অবজ্ঞার খবর রাখেন তিনিই বুঝবেন কেন আমার এ সাদা সত্যটা জোর ক'রে বল্‌বার জন্য এত মাথাব্যথা। ফরওয়ার্ডের পূর্ব্বোক্ত ওস্তাদিপন্থী মহাশয় আমার এ মতের যে প্রতিবাদ করেছিলেন সেটা বস্তুতঃ সুকণ্ঠের প্রতি ওস্তাদদের সাধারণ মনোভাবই ব্যক্ত করে। আমি প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ওস্তাদদের গান শুনে মূলতঃ যা বোধ করেছি সেটাও ঐ এক জিনিষ। অর্থাৎ আমাদের ওস্তাদরা প্রায়শই মিষ্টত্বকে খারিজ ক'রে নিছক কালোয়াতির সাধক হ'য়ে পড়েছেন। এরূপ সাধনার স্বপক্ষে বলার যে কিছু নেই তা নয়, কারণ নিছক কালোয়াতির মধ্যেও একটা **intellectual** আনন্দ আছে। তবে শুধু এই **intellectual** আনন্দকে নিয়ে ঘর করতে গেলে, আর্ট নিছক সায়েন্স হ'য়ে দাঁড়ায়। আর্টের মধ্যে **intellectual** ও **emotional** দুটো আবেদনই থাকা দরকার, এ কথা আমি বার বার বলেছি এবং এই **emotional** আবেদনের একটা মস্ত বড় খোরাক যোগায়—কণ্ঠসঙ্গীতে সুমিষ্ট কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীতে সুস্বর জোয়ারি (overtones)।

চন্দ্রশেখরের মধুনিস্যন্দী কণ্ঠস্বর শুনতে শুনতে আমার পূর্ব্ব বিশ্বাস আরও দৃঢ়মূল হয়েছিল বলেই এ "দৃশ্যতঃ" সাদা কথাটি নিয়েও (দৃশ্যতঃ বল্‌লাম কারণ ওস্তাদরা একে সাদা সত্য ব'লে স্বীকার করেন না) এত বাক্যব্যয় করা দরকার মনে করলাম। কিন্তু তাই ব'লে কেউ যেন মনে না করেন যে বালক চন্দ্রশেখরের একমাত্র সম্পদ ছিল তার সুকণ্ঠ। কারণ শুধু যে তার কণ্ঠস্বর সুধাবর্ষণ করত তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে

তার সুর ছিল শুদ্ধ, দরদ ছিল বিস্ময়জনক ও স্থায়িত্ব ছিল হৃদয়স্পর্শী। এক কথায় এরূপ musical স্বর আমি খুবই কম শুনেছি। তার সাদা সা-রে-গা-মা শুনে যে সঙ্গীতের আনন্দ মনে উদয় হয়, অনেক ওস্তাদের জটিল স্বরবিন্যাসেও সে আনন্দ-সঞ্চার সম্ভব হয় না। সে সেদিন প্রসিদ্ধ বিষ্ণু-দিগম্বর কর্তৃক রচিত একটী বিশুদ্ধ ভৈরবী ভজন গেয়েছিল—"ভজ মন রাম চরণ সুখদায়ী"। কিন্তু সে ভৈরবীতে সে দশ মিনিট যা মধু বর্ষণ করেছিল তা অবর্ণনীয়। এক কথায় শুধু কণ্ঠস্বরে সে শ্রোতৃবৃন্দকে এমন মোহিত করে দিয়েছিল যে সে গানটি শেষ হওয়া মাত্রই পাঁচ জন বিশিষ্ট ভদ্রলোক তাকে সোৎসাহে পাঁচটী স্বর্ণ পদক পুরস্কার দিলেন। তৎপূর্ব্বে কয়দিন অধিকাংশ ওস্তাদের মিষ্টত্বহীন তানালাপে ক্লিষ্ট হওয়ার দরুণই হয়ত সেদিন contrastএ শ্রুতিসুখকর গান সাধারণের এত বেশি ভাল লেগেছিল; কিন্তু কারণ যাই হোক্, চন্দ্রশেখর যে আমাদের মুগ্ধ করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। তার কোমল শিশুসরল আননও তার গানের সৌন্দর্য্য কম বর্দ্ধন করে নি।

এক্ষেত্রে আর একটা কথার উল্লেখ করেই এ প্রসঙ্গের শেষ কর্‌ব। চন্দ্রশেখরকে সঙ্গীত-সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ প্রথমে কোনমতেই গাইতে দিতে চান নি। তাঁদের আমি নিতান্ত পীড়াপীড়ি ক'রে বলাতে তাঁরা বলেছিলেন, "এখানে বড় বড় ওস্তাদের সামনে এক দুগ্ধপোষ্য বালক গাইবে কি? সেও কি সম্ভব?" এ প্রশ্নটি ওস্তাদিপন্থীদের যোগ্যই হ'য়েছিল। তাঁরা মনে করেন যে, যে গানে গলাবাজিই না থাক্‌লো; সে গান হাজার মিষ্ট হলেও উচ্চ সঙ্গীত হ'তে পারে না। কারণ লক্ষ্ণৌ সঙ্গীত সম্মেলনের অধিকাংশ ওস্তাদের মধ্যেই গলাবাজির প্রাচুর্য্য থাক্‌লেও মিষ্টত্বের বালাই যে প্রায়ই ছিল না এ কথা প্রায় অবিসংবাদিত; অথচ তাঁহারাই কেবল গাইবার যোগ্য—মিষ্ট গায়ক নয়। এ ধারণার মূলোচ্ছেদ না কর্‌তে

পারলে আমাদের সঙ্গীতের outlook বদ্‌লাবার সম্ভাবনা বোধহয় সুদূর-পরাহত। তবে এ বিষয়ে ওস্তাদিপন্থীদের সঙ্গে মিষ্টতাপন্থীদের একটা ব্যবধান অন্ততঃ এখনও বহুদিন ধ'রে থাক্‌বেই থাক্‌বে, যেটা এ সম্মেলনে আমি বেশি ক'রেই উপলব্ধি করেছিলাম। তাই চন্দ্রশেখরের দশ মিনিট গান ক'রে পাঁচ-পাঁচটী স্বর্ণপদক লাভে পূর্ব্বোক্ত দল যেমন হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, আমরা তেমনি উৎফুল্ল না হ'য়েই পারি নি।

অতঃপর পণ্ডিত মন্মোহনলাল সুরবাহারে ভীমপলশ্রী বাজালেন। এঁর কথা আমি ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। হিন্দুদের মধ্যে এবার যে কয়জন সঙ্গীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিলেন তার মধ্যে মন্মোহনলালের স্থান অতি উচ্চে ছিল। ইনি ঢোলপুরের রাজার সভাবাদক। সেতার সুরবাহার দুই-ই বাজান। সেতারে এনায়েৎ খাঁর কাছে ইনি দাঁড়াইতেই পারেন না, কিন্তু সুরবাহারে এঁর আলাপের হাত অপূর্ব্ব। এরকম মিষ্ট ও মনোজ্ঞ সুরবাহার আমি কখনও শুনি নি। কি এঁর মিড়! কি এঁর দরদ! কি এঁর রেশের ক্ষমতা! কি এঁর বাজানোর ভঙ্গী। আমি প্রথম দিন থেকেই এঁর বাজনার ভক্ত হয়ে পড়েছিলাম। এঁর সুরবাহার শুনে আমি যে আনন্দ পেয়েছিলাম তা উচ্চতম যন্ত্র সঙ্গীতের আনন্দ। শরদের চেয়ে সুরবাহার আলাপের পক্ষে উপযোগী। এক বীণা ছাড়া যে আলাপে সুরবাহারের সঙ্গে কোনও যন্ত্রেরই তুলনা হ'তে পারে না, একথা যেন মন্মোহনলালের বাজনা শুনে আমি প্রথম উপলব্ধি করেছিলাম।

এঁর জৌনপুরী, কানাড়া, ভীমপলশ্রী প্রভৃতি সব শ্রেষ্ঠ রাগের আলাপেই এঁর শিল্পীমনের গরীয়ান্ সমাহিত ভাবটি ফুটে উঠত। তবে একটা কথা শুনে দুঃখ হ'ল। শুন্‌লাম ইনি নাকি ঢোলপুরের রাজার ওখানে ২০৲ মাত্র মাহিনা পান। আর য়ুরোপে? য়ুরোপে অনুরূপ দরের গায়ক বা বাদক সত্যই envy of kings. তাই আমি Patronage of Music প্রবন্ধে লিখেছিলাম যে উচ্চ-সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ পৃষ্ঠপোষকতার ভার আভিজাত্যের হাত থেকে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের হাতে না এলে আমাদের সঙ্গীতের মুক্তি নেই। য়ুরোপে যে উচ্চ শিল্পী আজ পূজিত সেটা আভিজাত্যের কৃপাবলে নয়, সেটা প্রবুদ্ধ মধ্যবিত্তের গুণগ্রাহিতার ফলে। যে দেশে মন্মোহনলালের মতন বাদক ২০৲ মাত্র মাহিনা পেলেও সাধারণে তাতে আহত বোধ করে না, সে দেশ শিল্পানুরাগ ও গুণগ্রাহিতায় আজ materialistic য়ুরোপেরও কত পিছনে পড়ে আছে সে কথা ভাব্‌বার সময় কি আজও আসে নি?

সেদিন সন্ধ্যায় কলিকাতার বিখ্যাত ৺রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয় গেয়েছিলেন। বাংলার নাম এক ইনিই রেখেছিলেন। এঁর মৃত্যুতে বাংলা আজ মুকুটহীন হ'য়েছে একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে। এঁর পাণ্ডিত্য ও বিনয় দেখে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে আমাকে বলেছিলেন "I love him." প্রথমদিন গোঁসাইজীকে তিনি বলেছিলেন যে তিনি গোঁসাইজীর শিষ্য হ'য়ে তাঁর কাছ থেকে অনেকগুলি ধ্রুপদ শিখে নেবেন—স্বরলিপি করে প্রকাশ করার জন্য। গোঁসাইজীর আকস্মিক মৃত্যুতে পণ্ডিত ভাতখণ্ডের আক্ষেপের বোধ করি অবধি থাকবে না। কারণ তিনি গুণী বলে গোঁসাইজীর গুণ বুঝেছিলেন। গোঁসাইজীর বিশুদ্ধ নায়কী ও মুদরী কানাড়া গানে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে, ঠাকুর নবাবালি প্রমুখ বোদ্ধারা স্বীকার করেছিলেন যে তিনি একজন শিক্ষিত ওস্তাদ ছিলেন বটে। গোঁসাইজীকে

ভাতখণ্ডে অতি উচ্চ সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন। গোঁসাইজীর সম্বন্ধে বিস্তারিত লেখার এ স্থান নয়। তাই আজ আমি এইটুকু মাত্র ব'লেই ক্ষান্ত হব যে গোঁসাইজীর মৃত্যুতে শুধু বাংলার নয় ভারতবর্ষের যে ক্ষতি হ'ল সে ক্ষতি শীঘ্র পূর্ণ হবার নয়।

সেদিন শেষ গাইলেন বিখ্যাত সঙ্গীতরত্নাকর জরাজীর্ণ বৃদ্ধ আল্লাবন্দে খাঁ ও তাঁর পুত্র নাসির উদ্দীন খাঁ। আল্লাবন্দে খাঁর গান আমি আমেদাবাদে শুনেছিলাম ও ইতিপূর্ব্বে তাঁর গানের আমি নিন্দাই করেছি। আজ সে নিন্দাবাদের দুচারটি কারণ প্রদর্শন করব।

গোড়ায়ই বলে রাখা ভাল আল্লাবন্দে খাঁর কৃতিত্ব সম্বন্ধে আমি যে সচেতন নই তা' নয়। তাঁর বিশুদ্ধ সুর, মনোজ্ঞ মিড়, অসাধারণ কণ্ঠসাধনা প্রভৃতি অতি প্রশংসনীয়। কিন্তু তাঁর গান শুধু এক দোষে সঙ্গীত হিসেবে ছোট হয়ে গেছে; তার মধ্যে আর্টের অভাব ও লম্ফঝম্পের প্রাদুর্ভাব বড়ই বেশি। অর্থাৎ তিনি গান করেন শুধু নিজের কৃতিত্ব দেখাতে, আত্মপ্রকাশ করতে নয়। এইটেই ললিতকলায় কলাকারুর বা আর্টের বোধহয় সবচেয়ে বড় পরিপন্থী। আল্লাবন্দে খাঁর গান শুনতে শুনতে আমার বারবার মনে এই আক্ষেপ হ'য়েছে যে শুধু একটা মিথ্যা আদর্শের ফেরে পড়ে মানুষের লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া কতই না সোজা! আমাদের সঙ্গীতে আল্লাবন্দে খাঁর ধ্রুপদের উচ্চসঙ্গীত বলে' গণ্য হ'বার বা প্রথম পদক পাবার মূল—এই মিথ্যা আদর্শের প্রচার ও প্রবুদ্ধ লোকমত গড়ে' না ওঠা। যে দিন আমাদের দেশে শিক্ষিত ও প্রবুদ্ধ লোকমত গড়ে' উঠবে সে দিন থেকে এরূপ সুরের পালোয়ানকে ছেড়ে আমরা ফৈয়াস খাঁ, আবদুল করিম খাঁ, চন্দন চৌবে প্রভৃতি সুরের শিল্পীকেই অভিনন্দন করতে শিখব। তা' ছাড়া এ সম্পর্কে নামের একটা মোহমন্ত্র আছে যাতে বিদ্রোহী মনের উদ্যত ফণাও অনেক সময় শান্ত হ'য়ে পড়ে। যেমন

গাইছেন কে?—না সঙ্গীতরত্নাকর আল্লাবন্দে খাঁ। গাইছেন কি?—না খাণ্ডারবাণী ধ্রুপদ। ও বাবা! তবে ত অবস্থা সঙীন বল্‌তে হবে! এরূপ মনের ত্রস্ত অবস্থা যে সঙ্গীতের আদর্শ-নির্ণয়ের অনুকূল নয় একথা বোধ হয় বলাই বেশি।

আল্লাবন্দে খাঁ আলাপী। অর্থাৎ ইনি গান বড় একটা করেন না, করেন—গানের আলাপ। ৺গোঁসাইজীর আলাপ শুনেছি, আবদুল করিমের আলাপচারীও শুনেছি, আবার আল্লাবন্দে খাঁর আলাপও শুন্‌লাম। প্রথম দু'জনের আলাপের মধ্যে রস কষ আছে, কিন্তু খাঁ সাহেবের আলাপে আছে কেবল শিরঃ সঞ্চালনের তিরস্কার, লম্ফ ঝম্পের অতিচার, মুদ্রাদোষের ভীতিসঞ্চার ও গমকের ধমক। হয়ত তাঁর মধ্যে আরও কিছু গুণ আছে ব'লে আমি এরূপ ভাবে তাঁর সঙ্গীতের পরিচয় দিয়ে তাঁর প্রতি অবিচার কর্‌ছি। কিন্তু আমি নির্ভীকভাবে কেবল এই কথাটি বল্‌তে চাই যে, এ গানের মধ্যে গুণ যাই থাকুক, আদর্শের চ্যুতি এত বেশি ছিল যে এরূপ সঙ্গীত সে সঙ্গীতরূপে গণ্য হ'তে পারে না যার সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে ব'লে গেছে—"গানাৎ পরতরং নহি।"

তাই এর মধ্যে যদি নিঃসংশয় গুণও কিছু থাকে তবে সে গুণ যে এত ত্রুটীর আগাছায় বাড়তে পারেনি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই জন্যই আমি ইতিপূর্ব্বে আল্লাবন্দে খাঁর গান সম্বন্ধে বলেছিলাম যে এঁর চালের গান ভারত হ'তে আজ প্রায় লুপ্ত হ'তে বস্‌লেও তা'তে আক্ষেপের বিশেষ কিছু নেই।

আল্লাবন্দে খাঁ ক্রমাগত যন্ত্রের চিকারী প্রভৃতি কাজ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তেন। এক এক সময়ে বেশ সুন্দর শোনালেও কণ্ঠের পক্ষে এরূপ যন্ত্রসঙ্গীতের অনুকরণ কর্‌তে যাওয়া মোটের উপর বিড়ম্বনা। কণ্ঠের একটা স্বতন্ত্র আবেদন আছে ব'লে কণ্ঠসঙ্গীতের ও যন্ত্রসঙ্গীতের ধারা

একই ভাবে বিকাশ পাওয়া উচিত নয়। যন্ত্রের উৎকর্ষ যে স্থলে, সে স্থলে কণ্ঠ তার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কখনই দাঁড়াতে পারে না। ধরুন, যন্ত্রে যত রকম সুরের কায়দা, ঝঙ্কারের বৈচিত্র্য, দীর্ঘ স্বরগ্রামের (range) খেলা ও অলঙ্কারের শোভা দেখানো যায়, কণ্ঠে তত রকম কারুকার্য্য দেখানো কি সম্ভবপর বা সম্ভবপর হ'লেও সুশ্রাব্য হয়? কণ্ঠের আবেদন তার নিজের গরিমায়ই মহিমময়। প্রায় সকল অভিজ্ঞ ব্যক্তিই স্বীকার করেন যে, কণ্ঠস্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের যন্ত্র। তাই জগতের সর্ব্বত্রই গায়ক বাদকের চেয়ে বেশি আদর পেয়ে থাকেন। কিন্তু কেন পেয়ে থাকেন সে খবর আল্লাবন্দে খাঁ ও তাঁর ভক্তগণ বোধ হয় ভেবে দেখেন নি। কণ্ঠ যে যন্ত্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তার কারণ এ নয় যে, কণ্ঠে কায়দা বেশি দেখানো যায়, বরং ঠিক তার উল্টো। কণ্ঠ এই জন্য যন্ত্রের চেয়ে বড় যে কণ্ঠের আবেদন যন্ত্রের চেয়ে ঢের বেশি direct ও human, ও ঢের বেশি গভীর স্তরে তার আবেদন পৌঁছে দেয়। তাই কণ্ঠস্বর যে ভাবে আমাদের রক্তরাগকে রঞ্জিত ক'রে তোলে, যে ভাবে আমাদের হৃদয়ের তন্ত্রীরাজীকে ঝঙ্কৃত কর্‌তে সক্ষম, যে ভাবে আমাদের মনের পরতে পরতে গভীর ছাপ অঙ্কিত ক'রে রেখে যায়, সে ভাবে যন্ত্রের আবেদন আমাদের বিচলিত কর্‌তে পারে না। কথা উঠ্‌তে পারে তা' হ'লে য়ুরোপীয় সঙ্গীতে যন্ত্র-সঙ্গীতের স্থান কণ্ঠসঙ্গীতের চেয়ে উচ্চ কেন? তার উত্তর এই যে য়ুরোপীয় সঙ্গীতে সব বড় বড় প্রতিভা harmonyতে চ'লে যা'বার দরুণ তার melody দরিদ্র হ'য়ে পড়েছে। তাই য়ুরোপীয় সঙ্গীতে কণ্ঠসঙ্গীতের বিকাশ খুব বেশি হ'তে পারেনি। একথা অন্যান্য যুক্তি দিয়েও প্রমাণ করা যেতে পারে; তবে এটা অনেকটা অবান্তর ব'লে এ সম্পর্কে আজ এইটুকু ব'লেই ক্ষান্ত হ'ব যে উচ্চতম বিকাশের রাজ্যে কণ্ঠ-সঙ্গীতের আবেদন যন্ত্রসঙ্গীতের চেয়ে বেশি গভীর ও তৃপ্তিদায়ক। তাই আল্লাবন্দে

খাঁর নিরন্তর সেতারের "ডারা ডারা"র অনুকরণে বিদ্যুদ্বেগে "তা রা না না, রা না না না, দের দের দা না, নোম্ না না না" গাওয়া খুব প্রশস্ত হ'তে পারে না। অনেক বোদ্ধা সঙ্গীতজ্ঞ তাঁর ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যাপী বিদ্যুদ্গতি তোম্ না না শুন্তে শুনতে অধীর হ'য়ে উঠেছিলেন। আল্লাবন্দে খাঁর গলায় চমৎকার মিড় আছে, তবে বিজ্ঞন্মন্যত্বের দোষই এই যে সে সুন্দরকে ছেড়ে পাণ্ডিত্য-প্রকাশের জন্য অসুন্দর ও "জবড়জং" এর পিছনে ছোটে। এটা যে কত বড় আক্ষেপের বিষয় তা' আল্লাবন্দের মতন শক্তিশালী গায়কের শিল্পভ্রষ্ট হওয়ার দৃষ্টান্ত থেকে বোধ হয় বেশি ক'রেই উপলব্ধি করা যায়।

আল্লাবন্দে খাঁর আর এক মহাদোষ তাঁর বহুক্ষণ ধ'রে গমক দেওয়ার বদভ্যাস। এ অভ্যাসেরও মূল তাঁর পাণ্ডিত্য প্রকাশের দুর্দ্দম্য আকাঙ্ক্ষা। গমক, মিড়, মূর্চ্ছনা, জম্‌জমা, খষিট্ প্রভৃতি অলঙ্কারের অর্থই এই যে তারা একত্রে মিলে মিশে পরস্পরের সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে থাকে। সঙ্গীতরাজ্যে অলঙ্কার হৃদয়গ্রাহী হয় কেবল তখনই যখন গুণী তা'দের প্রয়োগজ্ঞান জানেন। যদি কোনও সঙ্গীতে কেউ অনুক্ষণ গিট্‌কারী দেয় তবে তা' যে কিরূপ একঘেয়ে হ'য়ে ওঠে সে কথা আজকালকার ওস্তাদদের যাঁরা জানেন তাঁদের কাছে অবিদিত থাক্‌তে পারে না। তা' ছাড়া আল্লাবন্দে খাঁর গমকও সুশ্রাব্য নয়। যদি তাঁর গমক চন্দন চৌবের মতন মিষ্ট হ'ত তা' হ'লেও বা তা বেশিক্ষণ শুন্‌তে পারা সম্ভব ছিল। কিন্তু তাঁর গমককে ছদ্মবেশী গমক বল্‌লেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। কাজেকাজেই গান শুন্‌তে এসে নিরন্তর ধমকিত হ'য়ে শ্রোতৃবৃন্দ যে প্রথম দিন রাত্রে চঞ্চল ও সরব হ'য়ে উঠেছিলেন সে জন্য তাঁদের বোধ হয় বেশি দোষ দেওয়া সঙ্গত নয়। যাই হোক্, ভরসা হয় শিক্ষিত ও সুকুমার লোকমত গড়ে' ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণহীন পাণ্ডিত্যের স্থলে লোকে সৌন্দর্য্যানুভূতির

প্রকাশকেই বড় ক'রে দেখতে শিখবে। সুন্দরকে ভালবাসাও শিক্ষাসাপেক্ষ। তাই আমাদের শিক্ষিত সমাজে এ বিষয়ে স্বাধীন চিন্তার আমদানী হওয়া বড়ই দরকার হ'য়ে পড়েছে।

সেদিন (অর্থাৎ ১২ই জানুয়ারী) আল্লাবন্দে খাঁর সঙ্গে তাঁর পুত্র সঙ্গীতরত্ন নাসির উদ্দীন খাঁ গেয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন বেহাগ ও হিন্দোল আলাপে তিনি সর্ব্বদা তাঁর পূজ্যপাদ পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন ব'লে তাঁর গান আমাদের মনের উপর বিশেষ কোনও ছাপ অঙ্কিত করতে পারে নি। কেবল এইটুকু মাত্র বোঝা গিয়েছিল যে তাঁর কণ্ঠস্বরটি মনোহর ও বিশুদ্ধ সুরের উপর কর্ত্তৃত্ব তাঁর অসামান্য।

নাসির উদ্দীন কিন্তু আমাদের তারপরদিন সকালে হিন্দোল, আশাবরী ও ভৈরবী গেয়ে মুগ্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। গুণী বটে! কি তাঁর বিশুদ্ধ সুরের অচঞ্চল স্থায়িত্ব! কি চমৎকার পর্দ্দা হ'তে পর্দ্দান্তরে যাওয়ার ক্ষমতা! ও কি অপূর্ব্ব মিড়! এক চন্দন চৌবে ছাড়া এ রকম মিড় আমি কখনও শুনি নি। তা'ছাড়া আশাবরীতে পর পর কোমল ও অতিকোমল সুরে তিনি যেরূপ নিষ্পলক ভাবে স্থায়ী হচ্ছিলেন সেটা বাস্তবিকই আমাদের মনে পুলক সঞ্চার করেছিল। তবে আমার বরাবরই ধারণা ছিল যে যে রাগে কোনও কোমল পর্দ্দার ব্যবহার হয় সেই রাগে তার অতি কোমল পর্দ্দার ব্যবহার করা দস্তুর নয়। নাসির উদ্দীন কিন্তু পর পর এরূপ দুই পর্দ্দাই ব্যবহার কর্ত্তেন। এতে রাগ

রাগভ্রষ্ট হয় কিনা জানি না, (অর্থাৎ আশাবরীতে কোমল ও অতিকোমল রে ও ধা একত্রে ব্যবহার করা ওস্তাদানুমোদিত কি না জানি না) কিন্তু এটা জানি যে নাসির উদ্দীন পর পর এরূপ পর্দ্দা ব্যবহার করেছিলেন ও অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে সেটা দেখিয়েছিলেন। রাগের শুদ্ধ অশুদ্ধের বিচারের মতন কঠিন কাজ বোধ হয় এ মরজগতে আর দুটি নেই, তাই এ বিচার থাকুক। কিন্তু একটা কথা আমি এ প্রসঙ্গে বল্‌তে বাধ্য যে কোমল ও অতিকোমল পর্দ্দা পর পর এরূপ অভ্রান্তভাবে দেখাতে পারা ও শুনে বোঝার মধ্যে একটা উচ্চদরের Intellectual আনন্দ আছে। এ প্রবুদ্ধ উপভোগের মধ্যে অবশ্য খানিকটা emotional আনন্দ না থেকেই পারে না, যেহেতু প্রায় সব Intellectual তৃপ্তির মধ্যে যে আনন্দ আছে সেটা আনন্দ ব'লেই খানিকটা emotional ব্যাপার না হ'য়েই পারে না। তবে এরূপ উপভোগের মধ্যে বিশেষ করে থাকে বিশ্লেষণে সতর্কতা, নিজেকে হারিয়ে ফেলার-তৃপ্তি নয়। এবং বিশ্লেষণ ক্ষমতা বস্তুটি সাধারণের মধ্যে বড় একটা মেলে না ব'লে নাসির উদ্দীন খাঁর সেদিনকার নিক্তির-ওজন-করা বিশুদ্ধ সুরের স্থায়িত্ব এক বিশেষজ্ঞের কাছেই তৃপ্তিদায়ক হ'য়েছিল। অবিশেষজ্ঞের কাছে সে গানের আবেদন বড়ই হীনপ্রভ ছিল। যাই হোক যে গুণী বিশুদ্ধ সুরকে এমন আয়ত্ত করতে পারেন তাঁর কৃতিত্বের সুখ্যাতি মন খুলেই করা দরকার।

তবে নাসির উদ্দীন খাঁকে আমি শিল্পী হিসাবে ফৈয়াস খাঁ ও চন্দন চৌবের সমান বলে মনে করতে পারি না। তার প্রধান কারণ তাঁর pedantry বা অহমিকা প্রায়শঃই অসহ্য ছিল। আমি বারবার বলেছি উচ্চতম শ্রেণীর গানের একটা প্রধান বিশেষত্ব এই যে তার উদ্দেশ্য আত্মপ্রকাশ, আত্ম-জাহির নয়। নাসির উদ্দীন খাঁ বেশির ভাগ সময়েই চেষ্টা করতেন তাঁর সুরের দখল দেখাতে। অর্থাৎ তিনি যেন সর্ব্বদাই

ইঙ্গিত করতেন—সুরকে দেখো না, আমাকে দেখ। তা'ছাড়া তাঁর গমক ছিল দুঃসহ। তাঁর হৃৎস্তম্ভনকারী, রক্তজমাটকর গমকের প্রাচুর্য্য, সময়ে সময়ে আমাদের অতিষ্ঠ করে তুল্‌ত। যার মিড় এত হৃদয়স্পর্শী সে প্রাণস্পর্শী মিড় ব্যবহার না ক'রে ধনুষ্টঙ্কারী গমকের এত ভক্ত কেন এ প্রশ্ন মনে স্বতঃই উদয় হ'তে পারে। একথার উত্তর খুব কঠিন নয়। অর্থাৎ এ বিষয়ে তিনি তাঁর পিতৃপদাঙ্কানুসারী মাত্র। আল্লাবন্দে খাঁর গমকের বাহ্বাস্ফোটন অবশ্য এখনও তাঁর পুত্রের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন হয় নি। বোধ হয় তাই এখনও তিনি অকিঞ্চিৎকর মিড় ব্যবহার করে থাকেন। তবে ওস্তাদি-পন্থীরা নিশ্চিন্ত থাকুন—পুত্র যে রেটে পিতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছেন, তাতে অনতিবিলম্বেই তাঁর গানও গমকের তালঠোকায় দীক্ষাগুরুর গানের চেয়েও সুশ্রাব্য হয়ে উঠবে। একজন ওস্তাদিপন্থী সম্প্রতি রাগে লাল হ'য়ে লিখেছেন যে এরূপ গলার কাজ কত কঠিন তা' আমি বুঝি না ব'লেই মুদ্রাদোষকে দোষ দেই, কেন না এরূপ গলার মল্লযুদ্ধ কর্‌তে গেলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মল্লযুদ্ধকে ঠেকানো যায় না। কথাটা খুব সম্ভবতঃ সত্য। তবে উত্তরে ভীত শঙ্কাকুল মন ব'লে ওঠে আমার এরূপ কোস্তাকুস্তিকেও নমস্কার ও অঙ্গভঙ্গীর ধনুষ্টঙ্কারকেও দূরে থেকে প্রণাম। কারণ শেষটা কি এরূপ গমক সাধনা কর্‌তে গিয়ে পৈতৃক প্রাণটা অপঘাতে যাবে? সুন্দর গমক আমি শুনেছি। চন্দন চৌবে বেঁচে থাকুক, ফৈয়াস খাঁ চিরজীবী হোক্‌,—সুমিষ্ট হৃদয়গ্রাহী গমক ঢের শুন্‌ব। কিন্তু শুধু অবলা সরলা বালাদের ভয় দেখানোর জন্য আল্লাবন্দে খাঁর ঢঙের দুর্দ্ধর্ষ গমকের দুরন্ত সাধনার সঙ্গে "বাজিনা শতহস্তেন" নীতি অনুসারে ব্যবহার করাই ভাল।

যে বহুদিনব্যাপী সাধনার ফলে আল্লাবন্দে খাঁ দুরূহ গমক ও ততোধিক দুরূহ অঙ্গভঙ্গী আয়ত্ত করেছেন (এবং তদীয় পুত্র আজকাল করছেন)

সে সাধনার একাগ্রচিত্ততাকে আমি প্রশংসা না ক'রেই পারি না। এরূপ সাধনার মধ্যে যে একটা গরিমা আছে (তার মধ্যে হাস্যকর উপাদান থাকা সত্ত্বেও) একথা অস্বীকার করার মতন অজ্ঞতা বা স্পর্দ্ধা আমার নেই। তবে সাধনার দিগ্‌ভ্রম হওয়ার দৃষ্টান্ত সংসারে খুব বিরল নয়। উচ্চদরের অনেক সঙ্গীত প্রতিভার সঙ্গীত সাধনাকেও অনেক সময়েই এভাবে ভুল দিকে পরিণতি লাভ কর্‌তে দেখা যায় বিশেষতঃ আমাদের দেশে। এটা বড় আক্ষেপের বিষয় মনে করি ব'লেই আমি এরূপ outlookকে একটু ব্যঙ্গ করার প্রলোভন সংবরণ কর্ত্তে পারলাম না। আমার মনে হয় যে, শিল্পে যা দুরূহ তাই যে প্রশস্য নয় একথাটা না বুঝলে শিল্পের লক্ষ্য সম্বন্ধে আমাদের চোখ ফোট্‌বার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। দুরূহের প্রতি শ্রদ্ধা মানুষের অনেকটা মজ্জাগত। তাই আমাদের সঙ্গীতে এরূপ অমানুষিক কাণ্ডকারখানার বিরুদ্ধে অনভিজ্ঞেরা শঙ্কাবশতঃ কিছু বল্‌তে সাহস করেন না, এবং অভিজ্ঞেরাও সংস্কারবশতঃ কোনও উচ্চবাচ্য কর্‌তে ইতস্ততঃ করেন। কিন্তু তবু এ সাদা সত্যটা জোর করে বলার আজ সময় এসেছে। কারণ এ **thankless** কাজের ভার কেউ না কেউ না নিলে আমাদের সঙ্গীতের মুক্তি নেই। তাই আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ কথা বল্‌তে বাধ্য হ'লাম। উর্দ্ধবাহু হয়ে থাকাটা কঠিন ব'লেই প্রমাণ হয় না যে সেটা আধ্যাত্মিকতার পরাকাষ্ঠা বা দুটি হস্তই ব্যবহার করাটা হীনতার চূড়ান্ত। যে সন্ন্যাসীরা আধ্যাত্মিকতায় উন্নতিলাভ কর্‌বার জন্য অম্লানবদনে শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেদন করেন তাঁদের চেয়ে যে পরমহংসদেব কম মুক্তপুরুষ ছিলেন তাও নয়। সত্যকার শিল্পী বা ত্যাগী হওয়া কুস্তিগীর বা উর্দ্ধবাহু হওয়ার চেয়ে ঢের বড় জিনিষ এ সাদা সত্যটির প্রতি যেন উড়ো তর্কজাল সৃষ্টি করে আমরা অন্ধ হ'য়ে না থাকি। এরূপ উড়ো তর্কের মোহগর্ত্তে পড়া বড়ই সহজ—বিশেষতঃ আমাদের সঙ্গীতজ্ঞদের

ক্ষেত্রে। উদাহরণতঃ এই অন্ধতার ফলেই নাসির উদ্দীন খাঁ তাঁর সুন্দর মিড়কে বর্জ্জন ক'রে অনুক্ষণ গমকের ঊর্ণজালের মধ্যে গিয়ে আমাদের উদ্‌ভ্রান্ত করে দিতেন। শিল্পকলার আদর্শ সম্বন্ধে একটু সজাগ না থাক্‌লে নানান্ অসার পাণ্ডিত্যের আগাছার আওতায় সুকুমার অনুভূতির অঙ্কুরটি উদ্গমেই শুকিয়ে গিয়ে থাকে। লাভের মধ্যে হয় এই যে খাণ্ডারবাণী, নাদব্রহ্ম, সুরের ষট্‌চক্রভেদ প্রভৃতি গুটিকতক গালভরা বুলি আওড়াবার ক্ষমতা অর্জ্জন করাই সার হ'য়ে দাঁড়ায়।

কথা উঠ্‌তে পারে তবে কি এই একাগ্রচিত্ত সাধনার দাম কিছুই নেই যার ফলে আমাদের এই সব অমানুষিক গমক, হৃৎস্তম্ভনকারী সুরের পালোয়ানির বিকাশ সম্ভব হয়েছে? উত্তর এই যে গানবাজনার মধ্যে যতটুকু সত্যকার সৌন্দর্য্যানুভূতির বিকাশ পাওয়া যায় তার দামও ততটুকু মাত্র থাকে। যদি সত্য অনুভূতির কোন বালাইই না থাকে তাহ'লেও এরূপ কীর্ত্তির খানিকটা দাম অবশ্য আছে। কেবল সেটা বিশুদ্ধ **intellectual** ব্যাপার হয়ে পড়ে, ললিতকলা থাকে না এইমাত্র। খানিকটা ক্ষমতা থাক্‌লে তাই নিয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করলে মানুষ যে জীবনের নানা দিকে দুরূহ কীর্ত্তিকলাপ দেখিয়ে অপরকে স্তম্ভিত ক'রে দিতে পারে, এটা প্রায়ই দেখা যায়। আমি একটি বালককে দেখেছিলাম সে হাত পা অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে যথেচ্ছভাবে এমন অদ্ভুত রকমে দুম্‌ড়ে ফেল্‌তে পারত যে সে না দেখলে বিশ্বাসই হয় না। যেন তার কোথাও অস্থি স্নায়ুর নামগন্ধও নেই। কিন্তু সেটা যেমন উচ্চ শিল্পকলা ব'লে গণ্য হ'তে পারে না,—কেবলমাত্র দুরূহ স্বর সাধনা দ্বারাও তেমনি উচ্চদরের শিল্পী হওয়া যায় না। কারণ সঙ্গীতে কিছু পারদর্শিতা থাক্‌লেও অধ্যবসায়ের সঙ্গে নিরন্তর অভ্যাস করলে এরূপ দুরূহ স্বরবিন্যাসে অনেক গায়কেই কৃতিত্ব দেখাতে পারে। কিন্তু শুধু অভ্যাসে শিল্পী হওয়া যায় না। ধরুন

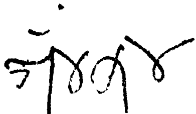
"সা ধা রে ধা মা নি ধা গা" খুব দ্রুত গাওয়া দুঃসাধ্য, কিন্তু বহুদিন ধ'রে চেষ্টা করলে অসাধ্য নয়। কিন্তু দুঃসাধ্য ব'লেই প্রমাণ হয় না যে এরূপ স্বরবিন্যাসকে আয়ত্ত করতে পারলেই উচ্চদরের শিল্পী হওয়া অবধারিত। অথচ চন্দন চৌবে বা আবদুল করিমের অপূর্ব্ব দরদের সঙ্গে কেদারার "সা মা মা পা"র মিড় শিল্পে অনুপম হয়ে ওঠে, কারণ এই শ্রেণীর গুণী এই সাদা পর্দ্দার বিন্যাসের মধ্যেই হৃদয়ে যে গভীর অনুভূতির সঞ্চার কর্‌তে সক্ষম তার তুলনা মেলা ভার। আসল কথা কে কতটা অনুভব করে। চিত্রকর ছবি আঁকেন—রঙ দিয়ে। শিল্পী ছবি আঁকেন—হৃদয়ের রক্ত দিয়ে।

আসল ও নকল গানের ভিতরকার এই প্রভেদটা সেদিন যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন—ফৈয়াস খাঁ। লক্ষ্ণৌ সঙ্গীত সম্মেলনে যত গায়ক এসেছিলেন তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া উচিত দুজনকে—ফৈয়াস খাঁ ও চন্দন চৌবে। এঁদের মধ্যে কে যে শ্রেষ্ঠতর সেটা বলা একটু কঠিন। তবে সব জড়িয়ে ফৈয়াস খাঁকেই বোধহয় শিল্পী হিসেবে শ্রেষ্ঠতর বল্‌তে হয়। কারণ ফৈয়াস খাঁর গলায় মিষ্টত্ব একটু কম হ'লেও দরদ চমৎকার ও সূক্ষ্মকাজের কারুকার্য্য প্রায় অফুরন্ত। এঁর সম্বন্ধে আমি "ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জিকায়" লিখেছিলাম যে খেয়ালে ইনি আবদুল করিমের অনেক নীচে হ'লেও ঠুংরিতে তাঁর চেয়ে অনেক বড়। ঠুংরিকে যাঁরা নগণ্য মনে করেন তাঁরা হয় ত এ কথাটা অনেকটা **"damning with faint praise"** রকম মনে কর্‌তে পারেন। কিন্তু যেহেতু ঠুংরিকে আমি উচ্চতম হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের অন্যতম বলে মনে করি সেহেতু অন্ততঃ আমি যে এতদ্দ্বারা ফৈয়াস খাঁকে হীন প্রতিপন্ন কর্‌বার প্রয়াসী হ'তে পারি না একথা বোধ হয় বল্‌তে পারি। সত্যই ফৈয়াস খাঁ গান গেয়ে থাকেন—হৃদয়ের রক্ত দিয়ে। তাঁর ঠুংরি গান আমি বরোদায়

শুনেই মুগ্ধ হয়েছিলাম, কিন্তু সেদিন সকালে লক্ষ্ণৌয়ে তিনি যা গাইলেন তাকে ইংরাজীতে বলে surpassing oneself। শিল্পী এক গভীর প্রেরণার আলোতেই এরূপ সৌন্দর্য্যের দৃশ্য তৃষিত হৃদয়ের সাম্‌নে উন্মুক্ত করে দিতে পারেন। আর এ প্রেরণাও ধরা দেয়—এক সহজ শিল্পীর কাছে। চেষ্টা ক'রে এ জিনিষ হয় না। কারণ বিধাতৃদত্ত প্রতিভার উৎস যদি অন্তরে বিরাজ না করে তবে শত চেষ্টায়ও কেউ আবদুল করিম বা ফৈয়াসের মত সে অপরূপ নির্ঝরের সন্ধান পায় না। **Genius is the capacity for taking infinite pains** কথাটির মতন ভুল কথা জগতে কমই উচ্চারিত হয়েছে। আল্লাবন্দে খাঁর প্রাণে শত চেষ্টায়ও ফৈয়াস খাঁর প্রেরণা আস্‌বে না। যেমন রামদাস পরামাণিক শত চেষ্টায়ও রবীন্দ্রনাথের মতন কবিতা লিখ্‌তে পারবেন না। ফৈয়াস সে দিন দু'তিনটি ভৈরবী ঠুংরিতে আমাদের যে দৃশ্য দেখালেন ও যে বাণী শোনালেন সেটা এক প্রতিভারই করায়ত্ত।

ঠুংরি যে কত উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীত হ'তে পারে, সে দিন ফৈয়াস খাঁ তার জ্বলন্ত প্রমাণ দিয়েছিলেন। তিনি ঠুংরি ঠিক জানিত চালে গাননি। তাঁর নিজের একটা বিশিষ্ট ঢঙ্‌ আছে। তিনি ঠুংরিতে ধ্রুপদের গমক, খেয়ালের হলক তান, টপ্পার দানা ও ঢেউ খেলানো মিড়ের যে সমন্বয় ক'রে থাকেন তার পুলক জাগানোর ক্ষমতা যে কি অপূর্ব্ব মনোহর, তা' না শুন্‌লে ঠিক্‌ বোঝানো সম্ভব নয়। ফৈয়াস খাঁর ঠুংরি শুনে আমার ঠুংরির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশ্বাস আরও বদ্ধমূল হ'য়েছিল। নাসির উদ্দীন সে দিন আশাবরীতে তাঁর অপূর্ব্ব মিড় ও বিশুদ্ধ সুরের দ্বারা যে মায়াপুরী সৃজন ক'রেছিলেন, আমার মনে হচ্ছিল সে মায়াপুরী অন্য কোনও গায়কের গানে ধূলিসাৎ না হ'য়েই পারে না। কিন্তু ফৈয়াস

খাঁ শুধু যে সে মায়াপুরীকে তাঁর গীত সুধারসে সঞ্জীবিত ক'রে রেখেছিলেন তাই নয়, তিনি তাঁর ঠুংরিতে যাদুতে নাসিরের উচ্চতম আলাপের আনন্দের গভীর ছাপও প্রায় মুছে দিয়েছিলেন। এটা বড় কম কৃতিত্ব নয়।



উদ্দেশ্যটা ছিল রাজপুতানা-ভ্রমণ ও সেখানে নানা রাজসভাগায়কদের গান শ্রবণ। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। তাই সূচনাটা হ'ল অন্যরূপ। প্রথম যেতে হ'ল—কয়লার খনির রাজ্যে। অবশ্য গানের প্রেরণার জন্য নয়, নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে।

ধানবাদ সহরটী যাকে বলে খনিতে খনিতে ধূল-পরিমাণ। কত যে কয়লার খনি আছে তার ইয়ত্তা নেই। সহরের সর্ব্বত্রই ধূম্রনিঃসারী কুৎসিত চিমনি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, দৃশ্য সৌন্দর্য্যের কণ্ঠরোধ করতে যার সমতুল্য উদ্ভাবন বোধ হয় আজ অবধি মানুষ করতে পারে নি। মনে আছে একবার ল্যাঙ্কাশায়ারে এক নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে গিয়েছিলাম ও সেখানে সমস্ত পরগণাটির মধ্যে চিম্‌নির উদ্বমন-নিষেবিত নয়, এমন স্থান শত চেষ্টাতেও খুঁজে পাইনি। বইয়ে পড়া গেছে যে জাপানে নাকি industrialismকেও তারা একটু ভব্য বেশ পরিধান করিয়েছে। তা যদি হয় তবে সেটা বোধ হয় মানুষী কীর্ত্তির অষ্টম আশ্চর্য্য ব'লে গণ্য হবে।

বন্ধুবর ছিলেন সিবিলিয়ান ও সিন্ধুদেশবাসী। কাজেই তাঁর আলাপ ছিল বেশির ভাগ সাহেব-মেমদেরই সঙ্গে। ফলে তাঁর আলাপের সূত্রে

অনেকগুলি সাহেব মেমের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তাদের যেমন অজস্র টাকা (কয়লার জয় হোক্) তেম্‌নি মুখ মিষ্ট। তাঁদের অধিকাংশের philosophy of lifeও তেমনি সুবিধা মতন গ'ড়ে উঠছে। তাঁদের মধ্যে একজন ধনী অর্দ্ধ-আইরিশ-অর্দ্ধ-ইংরাজ ভদ্রলোক বল্‌লেন যে, ভারতবর্ষের গরীব লোকের টাকা কম বটে, কিন্তু এ কম টাকায়ও তারা য়ুরোপের গরীব লোকের চেয়ে ঢের সুখে থাকে। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি অম্লান-বদনে সেই মামুলি উত্তর দিলেন যে এখানকার লোকের অভাবও নেই, তাদের standard of living নীচু ব'লে। ভাবলাম জিজ্ঞাসা করি যে দুবেলা দুমুষ্টি আহারের প্রয়োজনও কি নীচু standard of livingএর জন্য শূন্য ডিগ্রীতে নেমে যেতে বাধ্য? কিন্তু আলোকিত পাঙ্খানিষেবিত কট্‌লেট-চর্ব্বণ-নিরত, সম্ভ্রান্ত-খান্‌শামা-বাবুর্চ্চি-পরিচারিত, হাস্যমুখ ইংরাজ অভ্যাগত ও অভ্যাগতাদের মধ্যে এ নিরর্থক অর্থনীতি নিয়ে দ্বন্দ্ব করা বোধ হয় নিষ্ফল ভেবেই বন্ধুবরও কিছু বল্‌লেন না—আমিও না। আমার কেবল আর একবার নূতন করে মনে হ'ল যে এরা মুখে যতই কেন না ভদ্র ব্যবহার করুক মূল স্বার্থের ভেদের ক্ষেত্রে ওরা নানারূপ সুবিধারকম Philosophy সাড়ম্বর যুক্তি তর্কের অস্থায়ী ভিত্তির উপরেও প্রতিষ্ঠিত করবার প্রাণপণ চেষ্টা পাবেই পাবে। এবং তখনও আমাদের দেশে নিরপেক্ষ মডারেটগণ বল্‌বেন যে সত্যের খাতিরে ওদের দিকটাও আমাদের দেখা উচিত। তবে এরূপ উদার মত প্রকাশের সময় তাঁরা ভুলে যান যে এমন কোনই ব্যবহারই নেই, যার স্বপক্ষে বুদ্ধির মারপেঁচ দিয়ে সমর্থনসূচক দুটো চারটে যুক্তি খাড়া করা না যায়। নৈলে কি দাসদাসী পরিষেবিত, শ্যাম্পেন-পান-নিরত, Home-sweet-home-গান-মুখরিত, দীপালোকিত, সুবেশ নরনারী এরূপ আলোচনা করতে পারে যে ভারতের দরিদ্রের অবস্থা য়ুরোপের দরিদ্রের চেয়ে

ভাল যেহেতু তাদের অভাবও অল্প? না, যে দেশের কৃষক দিনান্তে একবারও পূর্ণ আহার না পাওয়ার জন্য প্রসিদ্ধ, যে দেশে ম্যালেরিয়া মহামারী কায়েমী বন্দোবস্ত ক'রে নিয়ে বৎসর বৎসর গ্রামের পর গ্রাম উজাড় ক'রে দিতে বদ্ধপরিকর, যে দেশে দুর্ভিক্ষ, প্লাবন, অনাবৃষ্টির জন্য প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র লোক অনাহারে বা অল্পাহারে প্রাণ দেয়—সে নির্জীব নিপীড়িত জাতির অবস্থাকেও একজন সুস্থমন ব্যক্তি অম্লানবদনে Prosperous ব'লে মনে ক'রে নিজেদের উপকারী ভাব্‌তে পারত?

আমাদের হৃতধন, বিগত-সর্ব্বস্ব দরিদ্রের একটি করুণ দৃশ্য পরদিনই আমার চোখে পড়ল। বন্ধুবর আমাকে তাঁর একটি ইংরাজ খনি-অধিকারীর খনিতে নিয়ে গেলেন। য়ুরোপে ইয়র্কশায়ারে খনিকদের অবস্থা আমি স্বচক্ষে দেখে এসেছিলাম ব'লে আমাদের দেশের খনির শ্রমজীবীদের করুণ দৃশ্য যেন বেশি ক'রেই চোখে পড়ল। শুধু পুরুষেরা নয়, মেয়েরাও সেই দূষিত বাষ্পময়, তমসাচ্ছন্ন, স্যাঁৎসেঁতে, নিঃশ্বাসরোধকারী অসহ্য গরম খনিতে প্রত্যহ দশ বার ঘণ্টা ক'রে কাটায়। কোনও কোনও জননী আবার শিশুসন্তানকেও সেই অন্ধকূপে নিয়ে যান। মানুষের জন্মগত অধিকার যে আলো ও খোলা হাওয়া, এইসব হতভাগ্য নারী ও শিশু তা হ'তে প্রত্যহ দশ বার ঘণ্টা ক'রে বঞ্চিত থাকে। য়ুরোপের অবস্থা এত মন্দ নয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা কর্‌লে হয়ত সে ইংরাজ মহাপ্রভু বল্‌তেন যে এতেও প্রমাণ হয় না যে ভারতীয় খনিকের অবস্থা ইংরাজ খনিকের চেয়ে মন্দ, কেন না, ভারতীয়গণের স্বাস্থ্যের পক্ষে আলো ও হাওয়া তেমন দরকার করে না, বা ভারতীয়দের একটা মস্ত সুবিধে যে তাঁদের শিশুসন্তান বিধাতা এমন করে সৃষ্টি ক'রেছেন যে তারা মাতার কাছে থাক্‌লে আর খেলা কর্‌তে চায় না ইত্যাদি।...যুক্তি দিয়ে কি না প্রমাণ করা যায়?...

* * * * *

৺কাশীধাম। হিন্দুর পুণ্যতম তীর্থ। মনে পড়ে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একদিন রেলের সাঁকোর উপর থেকে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একত্রে কাশীর সেই চিরপরিচিত অথচ চিরনূতন দৃশ্য উপভোগের কথা। সেদিন সে গাড়ীতে অধ্যাপক যদুনাথ সরকার ও ফণীভূষণ অধিকারী মহাশয়ও ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সঙ্গে মহাত্মাজীর সত্যগ্রহ আন্দোলনের সূচনা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এমন সময় হঠাৎ ট্রেণটি গঙ্গার ব্রিজের উপর এসে যেন কাশীর নয়নাভিরাম দৃশ্যে আকৃষ্ট হ'য়ে গতিবেগ মন্দ ক'রে সতৃষ্ণ মন্থর গুঞ্জন আরম্ভ ক'রে দিল। সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আলোচনা ছেড়ে তাঁর সুন্দর রহস্য-নিমীলিত চোখে কাশীর পানে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। রবীন্দ্রনাথের সে চিত্রার্পিতপ্রায় সানুরাগ দৃষ্টি—প্রতিবারই কাশীর দৃশ্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে মনে পড়ে।

প্রতি দৃশ্যেরই অন্তর্নিহিত রহস্যটি দর্শকের গ্রহণ-ক্ষমতার অনুপাতেই তার কাছে আত্মপ্রকাশ ক'রে থাকে। সেদিন রবীন্দ্রনাথের সেই অপলক মুগ্ধ দৃষ্টি হঠাৎ যেন এ সত্যটি সম্বন্ধে আমাকে বেশি সচেতন ক'রে তুলেছিল, মনে আছে। মনে পড়ে, তখন মনে হয়েছিল 'কই! আমরাও ত এ দৃশ্য কতবার দেখেছি; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতন এভাবে ত' কখনও দেখতে চাই নি বা পাই নি!' তারপর প্রতিবারই কাশীর সে দৃশ্য নিত্য-নূতন আকারে তার আবেদন গোচর ক'রেছে ও প্রতিবারই আশ্চর্য্য মনে হয়েছে এই কথা ভেবে যে, সৃষ্টিকর্ত্তা প্রতি মহিমময় দৃশ্যের মধ্যে কি বিচিত্র উপায়েই না এমন নিত্য নব প্রেরণার উৎস রেখে দিয়েছেন যার রঙীন পরশ প্রতিজনকে তার অনন্ত আবেদন জানিয়েও নিঃসম্বল হ'য়ে পড়ে না। তাই বুঝি কবি উচ্ছ্বসিত হয়ে ব'লেছিলেন :—

A thing of beauty is a joy forever!

তারপর প্রভাতের রূপালি অরুণালোকে, গো-ধূলির স্তিমিত

রক্তিমাভায়, সন্ধ্যার ধূসর ম্লানিমায় ও চাঁদের সোণালি কিরণপাতে—কতবারই না নৌকাবক্ষে কাশীর দৃশ্য উপভোগ করেছি! কত ছন্দেই না তার রহস্যভাণ্ডার হ'তে মনের সম্পদ আহরণ ক'রেছি! কিন্তু নিবিড়তর পরিচয়ে সে দৃশ্য ত' কই কখনও পুরানো হয় নি! বরং এবার নৌকাবক্ষে বিজয়াদশমীর দিন ভাসান দেখ্‌তে দেখ্‌তে কাশীর যেন এক অদৃষ্টপূর্ব্ব শোভা চোখে পড়ল। মনে হ'ল যেন আমরা সময়ের তরণীতে এক ভূতযুগের বেলায় এসে পৌঁছেছি—যেখানে পরিচিত সব কিছুও যেন কি একটা অচেনা নূতনত্বের রঙে রাঙিয়ে এক অপরূপ গরিমায় ভূষিত হ'য়ে দেখা দিয়েছে। হঠাৎ মনে হ'ল যে য়ুরোপের অমরাবতী—ভেনিসে কোন্ এক শুভ লগ্নে যেন ঠিক এইরকমই একটা অনুভূতির সোণার কাঠি হৃদয়ের দুয়ারে আঘাত ক'রে তার মধ্যে সুপ্ত কোনও এক সৌন্দর্য্যরস-বোধকে জাগিয়ে তুলেছিল। ভেনিসে সে চাঁদনি রাতের কথা ভুল্‌বার নয়। সেদিন পূর্ণিমাও ছিল। একটি ইতালীয়ান "গণ্ডোলা"য় (Gondola = নৌকা) আমি আমার এক চেক (Czech) বন্ধু ও তাঁর ফরাসী পত্নীর সঙ্গে সময়ের হিসেব সম্বন্ধে বেউলে হ'য়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম; কেন না সেদিন আমাদের খেয়াল ছিল না যে সময় ব'লে কোনও বস্তুর মানুষের চৈতন্যের বা দৈনন্দিন কর্ম্ম পঞ্জিকার উপর কিছু দাবী-দাওয়া থাক্‌তে পারে।

ভেনিসের নীলাভ জলপথ, দু'ধারে আলোকিত হর্ম্ম্যরাজি, সাম্‌নেই সমুদ্রের কল্লোল, চারিধারে নানান্ সুশোভিত তরণীমালার শোভাযাত্রা, নানান্ রঙীন গণ্ডোলা-বক্ষ হ'তে ইতালীয়ান গায়ক গায়িকার গীত-বাদ্য, ছোট ছোট বাষ্পীয় পোতে সুবেশা তরুণীর চকিত চাহনি ও কলহাস্যরব—এ সবের মিলিত আবেদন যেন সেদিন আমাদের এক বিলুপ্ত রাজ্যের বিস্মৃত এলাকার মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

এবার দশমীর ভাসান দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমার হঠাৎ কি জানি কেন,

ভেনিসের সেই ভূতযুগের স্মৃতি বহন করার উজান স্রোত মনে পড়ে গেল। তা'তে আর এতে কত তফাৎ! কেননা ভেনিস ভূতযুগের সৌরভ বহন ক'রে আনা সত্ত্বেও যেন গতিশীলতারই প্রতিমূর্ত্তি, যে স্থলে কাশীর দশমীর গঙ্গাবক্ষ ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর স্থিতিশীলতার প্রায় একটা অকাট্য সাক্ষ্য বল্‌লেও চলে! ভেনিস বর্ত্তমানকে অস্বীকার কর্‌লেও ইহজগতকে ছোট ক'রে দেখার ধার দিয়েও যায় না; যেখানে কাশীর দশাশ্বমেধ, হরিশ্চন্দ্রের ঘাট, বেণীমাধব, বিশ্বেশ্বর চিরদিনই যেন উৎসবামোদের বিরুদ্ধে জগতের অনিত্যতার এক মধুর ঔদাস্যের সাক্ষ্য নিয়ে দণ্ডায়মান। ভেনিসনগরী বর্ণের, গতির, লাস্যের, সঙ্গীতের, কাব্যচিত্রের অনুরাগিনী; যেখানে কাশী বিগত বৈভবের, লুপ্ত গৌরবের, জীবনের দৃপ্ত আশা বাসনার চরম অবসানকেই বড় ক'রে দেখবার প্রয়াসী। এক কথায় ভেনিস আমাদের আধুনিক মনকে পূর্ব্বযুগের চিরন্তন রহস্যের নৃত্যশীল ছন্দের মধ্যে টেনে নিয়ে গেলেও এমন ছন্দের মধ্যে নিয়ে যায় যা মন্থর নয়, গতিশীল, স্তিমিতদ্যুতি নয় ভাস্বর, যা পেছনে টেনে নিয়ে যেতে চায় না সামনে এগিয়ে দেবারই পক্ষপাতী। কারণ এইটেই য়ুরোপের প্রাণচঞ্চল প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। অপর পক্ষে কাশী বোধহয় যুগসঞ্চারী হিন্দুসভ্যতার একমাত্র অনধিকৃত দুর্গ। তাই কাশীর দৃশ্যের প্রতি রেখাপাতই ভূতকালের উদাত্ত সামস্তোত্র, শান্তরসাস্পদ আশ্রম ও স্থিতিশীল জীবনযাত্রার গম্ভীর ছন্দের এক অপূর্ব্ব রসকে উজ্জ্বল ক'রে তুলে ধরতে চায়। জীবনকে আমরা এভাবে দেখতে চাইনা সত্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতেই হবে যে জীবনকে এভাবে দেখার মধ্যেও একটা মস্তবড় মাদকতা আছে। যিনি কাশীর এই অন্তর্গূঢ় সুরটি কাণ পেতে শোন্‌বার চেষ্টা করেন নি, তাঁর বোধহয় কাশীতে আসাই বৃথা। প্রতি প্রাচীন স্মৃতি-পবিত্র স্থানের মধ্যেই এরূপ একটী নিগূঢ় সুরের রেশ

নিরন্তর ধ্বনিত হ'তে থাকে, যে সুরটী যারা আমেরিকানদের মতন হট্টগোল ক'রে নোট নিতে নিতে ভ্রমণ ক'রে বেড়ান তাঁদের কাছে মূর্ত্ত হ'য়ে উঠতে পারে না।

কাশীর শ্রেষ্ঠ বীণকার বোধ হয় মিঠাইলাল। তাঁর বাজানর ঢংটি সত্যই বড় মিষ্ট এবং মিঠাইলাল যে গুণী সে বিষয়ে সন্দেহও নেই। কিন্তু তা' সত্ত্বেও যাঁদের তাঁর শিষ্য ৺রজনী রায় মহাশয়ের মনোহর বীণা শোনার সৌভাগ্য হ'য়েছে তাঁরা সম্ভবতঃ স্বীকার করবেন যে শিষ্য এ ক্ষেত্রে গুরুর চেয়ে শিল্পী হিসাবে বড় ছিলেন। তাঁদের দু'জনের বাজনা একত্র শুন্‌লে মনে হ'ত যে ৺রজনীবাবু তাঁর শিক্ষা ও সৌকুমার্য্যের আলোতে গুরুর শিক্ষিত রাগরাগিণীতে এক নূতন বর্ণ-বৈচিত্র্যের সৃজন কর্‌তে পার্‌তেন। আমাদের দেশের বড়ই দুর্ভাগ্য যে রজনীবাবুর মতন সঙ্গীত-প্রাণ শিল্পীর সে-দিন এত অল্প বয়সে মৃত্যু হ'ল! অল্পজীবিত্বের সবচেয়ে বড় ট্রাজিডি বোধ হয় এই সব ক্ষেত্রেই বেশি ক'রে আমাদের অভিভূত ক'রে থাকে। কারণ, বেঁচে থাক্‌লে রজনীবাবু যে পরে আমাদের বীণাসঙ্গীতে তাঁর মনোজ্ঞ সুকুমার হৃদয়টিকে অভিনবভাবে ফুটিয়ে তুল্‌তে পার্‌তেন, একথা তাঁর বাজনা যিনিই শুনেছেন তিনিই স্বীকার কর্‌বেন।

তাঁর মধ্যে শুধু যে সুশিক্ষা, ভদ্রতা ও সঙ্গীতানুরাগ ছিল তাই নয়।—তার সঙ্গে ছিল মৌলিকতা, অসাধারণ সৃষ্টিকুশলতা ও শিক্ষার অধ্যবসায়! আমাকে তিনি একদিন তাঁর বাড়ীতেই বীণা বাজাতে বাজাতে ব'লেছিলেন যে তাঁর দ্বারা সংসারের কোন কাজই হয় না। বীণা বাজাতে বস্‌লে তিনি সব কাজ ভুলে যান। তাই গৃহে তাঁর অকর্ম্মণ্য ব'লে বদ্‌নাম। সত্যই তাঁর সঙ্গীতানুরাগ ছিল অনন্যসাধারণ। তিনি ৮।১০ বৎসর সেতার ও সুরবাহার সেধে তা'তে নিপুণ হ'য়ে তবে বীণা আরম্ভ ক'রেছিলেন। কিন্তু হায়, আমাদের প্রতিভাবিরল দেশেও মহাকাল প্রতিভার প্রতি এরূপ

ঘন ঘন স্নেহ দৃষ্টিপাত কর্‌লে ক্ষোভের আর সীমা থাকে না। রজনীবাবু চল্লিশ পার না হ'তেই কয়েক বৎসর আগে ইহ-জগতের দেনা-পাওনার হিসেব নিকেশ ক'রে অজানার উদ্দেশে পাড়ি দেন। তাঁর স্থান অধিকার কর্‌তে পারে এমন বাঙালী বাদক আজ বড়ই বিরল।

যন্ত্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রে এরূপ ট্রাজিডি আরও আক্ষেপজনক। কারণ, বাদকের পক্ষে সুবাদক হওয়া গায়কের পক্ষে সুগায়ক হওয়ার চেয়ে বেশি সাধনা ও ধৈর্য্য-সাপেক্ষ—বিশেষতঃ বীণার মতন যন্ত্রের ক্ষেত্রে। কারণ সুরের সূক্ষ্মতম সৌন্দর্য্য বীণার মতন যন্ত্রে বাহির করা গলায় স্ফুট ক'রে তোলার চেয়ে ঢের বেশী কঠিন ব'লে আজ কাল বীণার চর্চ্চা প্রায় উঠে গেছে বল্‌লেই হয়। বাঙ্গালোরে আমাকে একজন বীণাবাদিনীর স্বামী ব'লেছিলেন যে দক্ষিণে ত শেষণের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ শ্রেণীর বীণা-বাজানোর কথা কিংবদন্তীতে মাত্র পরিণত হ'য়ে পড়বে। তাঁর স্ত্রীর বীণা শুন্‌তে শুন্‌তে আমার মনে হচ্ছিল যে তাঁর সে আশঙ্কা অমূলক নয়। কারণ, তাঁর স্ত্রী বেশ ভাল বাজাতে পার্‌লেও শেষণের অনুপম স্বরমাধুর্য্যের কোনও ধারণাও তাঁর বীণাবাদন হ'তে পাওয়া সম্ভবপর ছিল না। অথচ দক্ষিণে আজকাল এরূপ শ্রেণীর ভদ্রঘরের মেয়েরাই যা কিছু অল্প স্বল্প বীণার চর্চ্চা রেখেছেন।—কিন্তু শুধু চর্চ্চা রাখ্‌লেই ত বীণার উচ্চতম কলাকারু সৃজনের অধিকারী হওয়া যায় না! সে জন্য চাই জন্মগত প্রতিভা, শিক্ষার সুযোগ ও সাধনার ধৈর্য্য। রজনীবাবুর এ কয়টিই ছিল। তাই তাঁর তিরোধান আমাদের যন্ত্রসঙ্গীতের রাজ্যে একটা মস্ত দুর্ঘটনা ব'লে মনে না ক'রেই পারা যায় না। বিশেষতঃ উচ্চ সঙ্গীতের অদূর নবজন্মের যুগে ঠিক্ তাঁর মতন ঋত্বিকেরই একান্ত প্রয়োজন। কারণ, এখন থেকে শিক্ষিত ভদ্রলোকের দ্বারাই সঙ্গীতের উত্তরোত্তর বিকাশ হবে ব'লে মনে হয়। অশিক্ষিত ওস্তাদের যুগ গত। সেই জন্য রজনীবাবুর মতন শিক্ষিত

শিল্পীরই আজ সমূহ প্রয়োজন। নইলে আমাদের সঙ্গীতের পক্ষে অদূর ভবিষ্যতে শিক্ষিত সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা সম্ভব হবে না এবং এক এ সমাজের শ্রদ্ধার উপরই ভবিষ্যৎ সঙ্গীতের বিকাশের গোড়া-পত্তন হ'তে পারে। সেই জন্য আজ বীণার কথা মনে হ'লেই রজনীবাবুর অভাব শিক্ষিত সঙ্গীতানুরাগীর বেশি ক'রে বোধ করার কথা।

কাশীর বিখ্যাত দানবীর শিউপ্রসাদ গুপ্ত মহাশয়ের কৃপায় বর্ত্তমান সময়ে কাশীর একজন তথাকথিত শ্রেষ্ঠ ওস্তাদের গান শোনা গেল। এঁর নাম রামদাস কথক। লোকটি যেমন দাম্ভিক তেমনি অশিষ্ট। তাঁর দুই ঘণ্টাব্যাপী আর্ত্তনাদের মধ্যে একটী মল্লার জাতীয় সুর মাত্র আমাদের ভাল লেগেছিল। সুরটির নাম জিজ্ঞাসা কর্‌তে তিনি বল্‌লেন নীলাম্বরী মল্লার। এ সুরটি ছাড়া তাঁর গানের মধ্যে অন্য কোনও সুরেই বিশেষ কিছু রস পাওয়া গেল না। কাশীর মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান ভগবান দাস মহাশয় সে দিন গান শুন্‌তে এসেছিলেন। তিনি খানিক বাদে শিরঃপীড়ায় উঠে চ'লে গেলেন। মন্দ লোকে নাকি সেদিন সন্দেহ ক'রেছিলেন যে রামদাস প্রভুর প্রাণারাম তারস্বরই তাঁর শিরঃপীড়ার কারণ হ'য়েছিল। কিম্বা হয়ত (কেউ কেউ বলে) রামদাস মহোদয়ের গানের শিরঃপীড়া সঞ্চার করার একটা প্রধান কারণ তাঁর অতি তীব্রস্বরে হার্ম্মোনিয়াম বাজানো। এ দুটো অভিযোগই সম্ভবতঃ অসত্য। কারণ আসল ব্যাপারটা কি হয়েছিল আমরা কেউই জানি না। তবে যেটা জানি সেটা এই যে, রামদাস কথক মহোদয়ের হার্ম্মোনিয়ামের কেকারব সহ্য করা সাধারণ মানুষের কর্ম্ম নয়। খুব জোরে হার্ম্মোনিয়াম বাজানোর বিপক্ষে এই সূত্রে দু'একটা কথা বলা দরকার মনে কর্‌ছি। যেহেতু এ ব্যাধিটি আমাদের আধুনিক ওস্তাদদের মধ্যে প্রায় সংক্রামক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে বল্‌লেই হয়। অনেকে আবার একে রামে সন্তুষ্ট না হ'য়ে সুগ্রীব

দোসরের সাহায্য নেন—অর্থাৎ যুগল হার্ম্মোনিয়ামের পক্ষপাতী হ'য়ে উঠেছেন। বস্তুতঃ হার্ম্মোনিয়াম আমাদের উচ্চ সঙ্গীতের পক্ষে উপযোগী আনুষঙ্গিক নয়। তাই তা'কে সর্ব্বেসর্ব্বা ক'রে ভারতীয় সঙ্গীতের চর্চ্চা করলে তা' না হয় ভারতীয়, না থাকে সঙ্গীত। হার্ম্মোনিয়াম সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত ভাবে দু'চারটি কথা লেখার ইচ্ছা আছে ব'লে আজ শুধু এইটুকু মাত্র ব'লেই ক্ষান্ত হওয়া ভাল যে হার্ম্মোনিয়াম বাজানো অনেক সময় দরকার হ'য়ে পড়ে—সারঙ্গী বাদকের অভাবের দরুণ। কারণ, সারঙ্গীই হচ্ছে আমাদের উচ্চসঙ্গীতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গত। কিন্তু যেহেতু কার্য্যক্ষেত্রে তা' প্রায়ই সম্ভব হয় না সেহেতু সাধারণতঃ হার্ম্মোনিয়ামকে স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু যদি তাকে স্বীকার করাও যায় তা' হ'লেও তার কুফলকে গাঢ় না ক'রে কমাইবারই চেষ্টা করা উচিত; অর্থাৎ কিনা মৃদু স্বরের হার্ম্মোনিয়াম যথাসম্ভব আস্তে বাজানো উচিত, বিকট হার্ম্মোনিয়ামের রবে গানকে ঢেকে ফেলা উচিত নয়। হার্ম্মোনিয়ামকে অসম্ভব প্রাধান্য দিলে তা'তে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত যে কি অপরূপ শোভায় তরঙ্গিত হ'য়ে ওঠে সে সম্বন্ধে যদি কেউ অকাট্য প্রমাণ চান তবে যেন তিনি একবার কাশীধামের এই রাঘবসেবক পুঙ্গবের গান শুনে আসেন। যেহেতু এ সংশয়বহুল জগতে সংশয় ভঞ্জন করার এরূপ প্রকৃষ্ট উপায় বড় বেশি মেলে না।

সে আজ বৎসর দুয়ের কথা। রবীন্দ্রনাথ তখন কাশীতে ৺রাজা কিশোরীলাল গোস্বামীর বাড়ীতে অতিথি। সেখানে কাশীর বিখ্যাত বাই হুশ্‌নাজান তাঁকে গান শোনাতে এসেছিলেন। কবীন্দ্রের কৃপায় সেদিন প্রাতে হুশ্‌নার অপূর্ব্ব মনোহর তোড়ি, আশাবরী, ভৈরবী প্রভৃতি প্রভাতী রাগিণী শোনা গেল। সে সকালের স্মৃতি, সে দিনের শ্রোতৃবৃন্দের মন হ'তে বোধ হয় সহজে বিলুপ্ত হবে না। সেদিন বৃদ্ধা হুশ্‌না তার দুর্ব্বল জরাজীর্ণ কণ্ঠেও যে অপূর্ব্ব সুরের জাল বুনেছিল, ক্ষণে ক্ষণে

ঠুংরির নানা ছোট ছোট বোলের মধ্য দিয়ে যে ভাবে হৃদয়ের পরিবর্ত্তনশীল অনুভূতিগুলিকে সুরের মুকুরে প্রতিবিম্বিত ক'রে ধ'রেছিল, ও মিড়-গমক-মূর্চ্ছনার করুণ আবেদনের মধ্য দিয়ে কেন্দ্রগত সুরের ব্যঞ্জনাটি যে রূপে মূর্ত্ত ক'রে তুলেছিল তা বাস্তবিকই এক শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর গুণীর পক্ষেই সম্ভব। এমন উচ্চ শ্রেণীর বাইজীর গান শোনার ভাগ্য মানুষের কমই হয়। এইটেই যা দুঃখের বিষয়। কারণ এক এরূপ শ্রেণীর গানের সঙ্গে সংস্পর্শে এলেই সঙ্গীতানুরাগীর আসল সঙ্গীত সম্বন্ধে চোখ ফুট্‌তে পারে। নইলে সুরের উদ্‌ভ্রান্তকারী আলোড়নের আস্ফালন শুন্‌তে শুন্‌তে অনভিজ্ঞ শ্রোতার ত্রস্ত মনে প্রায়ই এরূপ ধারণা জন্মে যায় যে সেইটেই বুঝি সঙ্গীতের চরম আবেদন! অধুনাতন সুরতালের মল্লযুদ্ধের উন্মত্ত অনুরাগীদের প্রশংসমান দৃষ্টিবিভ্রম দেখলে বোধ হয় একথা বেশি ক'রে মনে না হ'য়েই পারে না।

বিদ্যাধরী বাই কাশীর আর একটী শ্রেষ্ঠ গায়িকা। এঁর গান আমি প্রথমবার শুনেছিলেম—কাশীতে, ও দ্বিতীয়বার লক্ষ্ণৌয়ের এক হৃতরাজ্য, সদা বোল-চাল-মুখর, স্থিতপ্রজ্ঞ নবাব সাহেবের বাড়ীতে। বিদ্যাধরী "দুর্গা" রাগ বড় সুন্দর গাইতে পারেন। এক আব্দুল করিমের মুখে ছাড়া আমি 'দুর্গা' রাগ এত সুন্দর ভাবে কাউকে গাইতে শুনিনি। বিদ্যাধরী সত্যই একজন উচ্চ শ্রেণীর গায়িকা। তাঁর সুরের সূক্ষ্ম কাজ, মিড়, তাল, মূর্চ্ছনা, কণ্ঠস্বরের মিষ্টত্ব সবই মনোহর। কেবল তাঁর স্বরটি একটু ভেঙে গিয়েছে—বোধহয় বেশি গাওয়ার দরুণ। যদি তাঁর কণ্ঠস্বরের এই দোষটুকু মাত্র না থাক্‌তো তা হ'লে বোধহয় আজ তিনি অচ্ছন বাই বা জানকী বাইয়ের সমকক্ষ গায়িকা ব'লে গণ্য হ'বার স্পর্দ্ধা করতে পারতেন।

কাশীর রাজরাজেশ্বরী বাইয়েরও সুগায়িকা ব'লে প্রসিদ্ধি আছে।

কিন্তু তাঁর গানের মধ্যে ক্ষণিক আনন্দ সময়ে সময়ে মিল্‌লেও সে গভীর তৃপ্তি মেলা সম্ভব নয়, যে তৃপ্তি হুশনাজান ও বিদ্যাধরীর গানে পাওয়া যায়। কারণ প্রথমতঃ এঁর গানের মধ্যে বিশুদ্ধ গতানুগতিকতাই পনর আনা; ও দ্বিতীয়তঃ এঁর কণ্ঠস্বরের মধ্যে একটা থন্‌থনে ভাবের আমেজ আছে যাকে ইংরাজীতে বলে **metallic voice**. কলিকাতার বিখ্যাত গায়িকা গহরজানের গলা এই ধরণের। এরূপ গলা কর্কশ বোধ না হলেও বেশিক্ষণ তৃপ্তি দিতে পারে না, অল্পক্ষণ পরেই কেমন যেন একঘেয়ে বোধ হয়। গহরজানের গান যাঁরা শুনেছেন তাঁরা এ কথার সত্যতা বোধহয় উপলব্ধি কর্‌বেন।

কাশীর শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদী বোধহয় হরিনারায়ণ বাবু। তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা বোধ না ক'রেই পারা যায় না, তাঁর কণ্ঠস্বরও মিষ্ট। কিন্তু তাঁর মধ্যে গোঁড়া ধ্রুপদীর অসহিষ্ণুতা উদারপন্থী সঙ্গীত-রসিককে বোধহয় আঘাত না ক'রেই পারে না। তাঁর ধারণা অনেকটা বিখ্যাত তাজখাঁ প্রমুখ ক্রোধন ধ্রুপদীদের মতন যাঁদের নিহিত মনোভাব এই যে ধ্রুপদ যে শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর হিন্দুস্থানী সঙ্গীত তাই নয়, ধ্রুপদের আসরে খেয়াল গুন্ গুন্ করে গাইলেও প্রত্যবায়গ্রস্ত হ'তে হয়। আমাদের মতন যাঁরা খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরির ভক্ত, তাঁরা হরিনারায়ণ বাবুর সঙ্গে বোধহয় একমত হ'তে পারবেন না। ইনি লক্ষ্ণৌ সঙ্গীত সম্মেলনের কার্য্যকারিতার বিরুদ্ধে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তার মোট মর্ম্ম এই যে এরূপ সম্মেলন হ'লেই বা কি লোপ পেলেই বা কি, যদি তাতে সঙ্গীতের নিয়ম-কানুন অনড় অচলভাবে ধারাবদ্ধ করা না হয়। হরিনারায়ণবাবুর মতাবলম্বী অনেক লোক আছেন যাঁরা বৎসর বৎসর অর্থব্যয় ক'রে সঙ্গীত-সম্মেলন আহূত করাকে অবজ্ঞেয় মনে করেন। তাই এঁদের মতের বিরুদ্ধে দু'একটী কথা লেখা দরকার মনে করছি। বার্ট্রাণ্ড রাসেল তাঁর **Prospects of**

Industrial Civilization নামক বইখানিতে বেশ সস্মিত বিস্ময়ে লিখেছেন যে অর্থনীতিক ও যৌথ সওদাগরদের মধ্যে অনেকে অজ্ঞাতে একটা কথা ধ্রুবসত্য ব'লে মনে ক'রে ভুল ক'রে বসে থাকেন; সেটা এই যে, আসল বস্তুটা হচ্ছে ট্রেণ তৈরী করা ও মাল প্রস্তুত করা—ট্রেণে চড়া বা দ্রব্যাদি ভোগ করা নয়। কিন্তু আসল জিনিষটা হচ্চে ঠিক উল্টো। অর্থাৎ মানুষের আসল দরকার—ভোগ, ভোগের উপকরণ তৈরী করার জন্য দেহপাত ক'রে চলা নয়। হরিনারায়ণবাবুর মতাবলম্বীগণ অনেকটা এই রকমই ভুল ক'রে বসেন, যখন তাঁরা অম্লানবদনে বলেন যে, রাগ-রাগিণীর শ্রেণীভুক্তই যদি না হ'ল তবে বৎসর বৎসর সঙ্গীত-সম্মেলনে বেফয়দা গান গেয়ে হবে কি? রাগরাগিণী শ্রেণীভুক্ত হওয়াটা যে বাঞ্ছনীয় একথা সকলেই স্বীকার করেন; কিন্তু সেটাকেই আসল বস্তু ব'লে মনে ক'রে বসলে মানুষের রসবোধের লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনাই কি পনের আনা হ'য়ে ওঠে না? অর্থাৎ সঙ্গীতের মধ্যে আমরা চাই কি? না, চাই—হৃদয়ের বিকাশ, আনন্দ, তৃপ্তি, উল্লাস, স্ফূর্ত্তি, সান্ত্বনা। কাজে কাজেই বৎসর বৎসর সঙ্গীত সম্মেলনের ফলে যদি রাগরাগিণীর একটা পরমা গতি না-ও হয় ত'হলেও বিশেষ কিছু আসে যায় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ করার যথেষ্ট হেতু আছে। রাগরাগিণীকে সূত্রবদ্ধ করা বৈয়াকরণের কাজ, শিল্পীর নয়; তাঁর কাজ—সৃষ্টি। একথা বলতে আমাকে যেন কেউ ভুল না বোঝেন। শিল্পীর সৃষ্টিই মুখ্য বস্তু হলেও বৈয়াকরণের সূত্রগ্রন্থন পণ্ডশ্রম একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। শিল্পীর সৃষ্টির ধারা বংশানুক্রমে বজায় রাখতে হ'লে বৈয়াকরণেরও দরকার। প্রতি সমৃদ্ধ সভ্যতায় সব শ্রেণীর কর্ম্মীরই দরকার থাকে। তবে তাই ব'লে বলা চলে না যে বৈয়াকরণকে যদি সঙ্গীত সম্মেলনে উচ্চতম মঞ্চে আরূঢ় করা না হয়, তা হ'লে সে সব সঙ্গীত-উৎসবই মায়ামাত্র। বৎসর বৎসর

সঙ্গীত সম্মেলন আহূত করার জন্য অনেক রকম উপকারিতা আছে। যথা,—

(১) তাতে ক'রে সঙ্গীত রসিকের সামনে সঙ্গীত রসের উপকরণের প্রদর্শনী বিছানো-রূপ একটা মস্ত কাজ করা হয়। (২) নানা স্থানের শিল্পী বৎসরে একবার ক'রে পরস্পরের সংশ্রবে আস্‌তে পারেন, যাতে অদূর ভবিষ্যতে লাভের সম্ভাবনা যথেষ্ট হ'তেই হবে। (৩) উদীয়মান গায়কদের উৎসাহ বাড়ে। (৪) গান শোনার নিয়মানুগত্য শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে গঠিত হ'তে থাকে। (৫) উচ্চ সঙ্গীত সম্বন্ধে ধীরে ধীরে একটা প্রবুদ্ধ লোকমত গ'ড়ে উঠ্‌তে থাকে, যার অভাবে সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হ'তে পারে না। এবং শেষতঃ (৬) আমাদের সঙ্গীত কলারূপ উচ্চ সম্পদের প্রতি উদাসীনের মনেও একটা শ্রদ্ধার ভাব আকার ধারণ করতে আরম্ভ করে। এ সব নানাবিধ উপকারিত্বের জন্য সঙ্গীতানুরাগী মাত্রেরই সঙ্গীত সম্মেলনের উদ্যোগকর্ত্তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। হরিনারায়ণবাবুর সম্প্রদায়ভুক্ত ক্রোধন, বৈয়াকরণ ওস্তাদগণ কি সদয় হ'য়ে এ কথাগুলির প্রতি একটু মনোযোগ দেবেন ?

২

জয়পুর। দুশো বৎসর আগে বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য নামক একজন বাঙালী নাকি বর্ত্তমান জয়পুরে রাস্তাঘাট ইত্যাদির পত্তন করেন। সুদূর রাজপুতানার একটি বিখ্যাত সুরম্য সহর যে বাঙালীর নির্ম্মিত, এ কথা মনে হ'লে বাঙালী-মাত্রেরই আনন্দ হ'বার কথা। জয়পুরের রাস্তাগুলি প্রশস্ত, পরিচ্ছন্ন ও শুভ্র, মথুরা বৃন্দাবনের সঙ্কীর্ণ মলিন অলিগলিতে

পর্য্যটন ক'রে জয়পুর এলে মনটি একটি গভীর তৃপ্তির নিঃশ্বাস না ফেলেই পারে না। ভূতযুগে বোধ হয় বিলাসের সঙ্গে খোলা নির্ম্মুক্ত স্থানের দুশ্ছেদ্য যোগাযোগ সম্বন্ধে মানুষের কোনও স্ফুট ধারণা ছিল না। কাশী, পুরী, মথুরা, বৃন্দাবন, গয়া প্রভৃতি তীর্থস্থানের সঙ্কীর্ণ রাস্তাঘাটের সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের উদার প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাটের ব্যবস্থার তুলনা কর্‌লে এ কথা বোধ হয় সহজেই প্রতীয়মান হয়। বিলাসের দিক্ দিয়ে য়ুরোপ এ সব স্থলে আমাদের অনেক আগে যথার্থ উপভোগের গুহ্য তত্ত্বটি আবিষ্কার ক'রেছিল মনে হয়। কারণ বড় **avenue, road, walk, promenade** প্রভৃতি য়ুরোপে বহুদিন হ'তে আদৃত। প্যারিসে **Avenue de Champs Elysee,** বার্লিনে **Bismarcke Strasse Kurfurstendamm** প্রভৃতি রাস্তার বিরাট প্রশস্ততা দেখে দেখে আমাদের দেশের রাস্তাগুলি সচরাচর অত্যন্ত ছোট ব'লে মনে না হ'য়েই পারে না। তবে সুখের বিষয় এই যে বর্ত্তমান সময়ে বড় বড় সহরেও প্রশস্ত রাস্তার উপযোগিতা সম্বন্ধে **Improvement Trust** সচেতন হ'তে আরম্ভ ক'রেছেন। তবে এ চেতনা নিতান্ত আধুনিক। সেই জন্য জয়পুরের সমস্ত রাস্তাগুলিই যে দুশো বৎসর আগে এমন প্রশস্ত ক'রে নির্ম্মাণ করা হ'য়েছিল এ চিন্তায় মনটা বিশেষ ক'রে একটা বিমল খুসিতে ভ'রে ওঠে।

জয়পুর প্রাসাদটি সহরের এক অষ্টমাংশ স্থান অধিকার ক'রে অবস্থিত। সুতরাং সহজেই অনুমেয় প্রাসাদ ও সংলগ্ন উদ্যানাদি একটা কি প্রকাণ্ড ব্যাপার। প্রাসাদটির স্থাপত্যও ভারতীয়, যেটা মনকে তৃপ্তি দেয়—যদিও এ যুগে এ শ্রেণীর স্থাপত্যের আংশিক পরিবর্ত্তন দরকার মনে হয়। তবে সে যাই হোক্ আমাদের দেশের সর্ব্বত্রই এক রকম "ন-যযৌ-ন-তস্থৌ' প্ল্যানে অধিকাংশ গৃহ গঠিত হ'তে দেখে দেখে এরূপ ভারতীয় স্থাপত্য চোখকে বোধ হয় একটু বৈচিত্র্যের আরাম দেয়; আগেকার যুগের

সাধারণ গৃহের ক্ষেত্রে যে দেয়, তা' বলা যায় না—কেননা আমাদের স্বাচ্ছন্দ্যের ধারণা ও রুচি আজ বদ্‌লে গেছে—কিন্তু অট্টালিকা প্রাসাদাদির ক্ষেত্রে যে দেয় একথা বোধ হয় বলা চলে। কেবল এক এ সব স্থলে অনেক সময়ে নানারূপ বিসদৃশ রঙের ব্যবহারটা প্রায়ই ভাল লাগে না। রং জিনিষটির যথেচ্ছ ব্যবহার সুরুচির দ্বারা অনুমোদিত না হ'লে সভ্য মানুষের মনকে যেমন পীড়া দেয় তেমন পীড়া বোধ হয় কম সভ্যতানুকারী অসভ্যতাই দিতে পারে। দৃষ্টান্ত—বড়বাজারের ও অন্য নানাস্থলে হঠাৎ-সভ্য মাড়োয়ারি ধনীর অপরূপ রং-বাহার দিয়ে দেয়ালাদি চিত্রবিচিত্র করার দৃশ্য।

জয়পুরে মোটরে চড়ে অম্বর প্রাসাদ দেখ্‌তে যাওয়া গিয়েছিল। প্রাসাদের পুরাতন ভগ্নাবশেষ অংশে রাজপুত বিভীষণ কুলাঙ্গার মানসিংহ বাস করতেন। সেখানে দ্রষ্টব্যও কিছু নেই প্রেরণার উপাদানেরও একান্ত অভাব। নূতন অংশ এক ভূতপূর্ব্ব রাজা রামসিংহের নির্ম্মিত। এর স্থাপত্য দিল্লী, আগ্রার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের মাছিমারা নকল এবং তাতেও শিল্প নৈপুণ্যও বিশেষ কিছু নেই। কেন যে অম্বর প্রাসাদের এত নাম তা জানি না। যা কিছু ঐতিহাসিক তা-ই যে দ্রষ্টব্য একথায় অন্ততঃ আমাদের প্রাচ্য মন ত তেমন সাড়া দেয় না। মার্ক টোয়েন কোথায় একস্থানে আমেরিকান টুরিষ্টদের বিদ্রূপ ক'রে লিখেছেন যে, তাঁদের একবার শুধু বল্‌লেই হ'ল যে অমুক গাছে ওয়েলিংটনের দশম রেজিমেণ্টের এক পদাতিকের একটি গুলির দাগ আছে বা অমুক সোফায় ব'সে পঞ্চদশ লুইর প্রধানা প্রণয়িনী দাতুরীর তরকারী খেতেন; তৎক্ষণাৎ তাঁরা এ সব অবশ্য জ্ঞাতব্য তথ্যে রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠেন ও তাঁদের নোটবুকে এ সব লোমহর্ষক ঐতিহাসিক সত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ লিপিবদ্ধ ক'রে নেন।

আমি আজ আর তাঁদের অনুকরণে অম্বর প্রাসাদের নানান নীরস তথ্য নিয়ে সহৃদয় পাঠক পাঠিকার ধৈর্য্যের গভীরতার তলস্পর্শ করতে প্রয়াস পাব না। বিশেষতঃ যখন সে সব বিবরণ নিশ্চয়ই অনেক বাঙ্গালী-আমেরিকানই ইতিপূর্ব্বে লিখে ফেলেছেন।

অম্বর প্রাসাদটিতে পৌঁছবার রাস্তাটি কিন্তু বাস্তবিকই মনোরম। পাহাড়ের গা দিয়ে শুভ্র সুন্দর রাজপথ বঙ্কিম ছন্দে চলেছে। দুধারে পাহাড় মালা, সবুজের অভিরাম দৃশ্য ও ময়ূর ময়ূরীর যথেচ্ছ বিহার। (জয়পুরে পথে ঘাটে ময়ূরের এত প্রাচুর্য্য বড়ই সুন্দর লাগে; এত ময়ূর আমি কখনও কোনও সহরে দেখি নি।) মোটরে ক'রে এই পথটুকুই বাস্তবিক উপ-ভোগ্য। পাহাড়ের উপর থেকে নীচের নীল হ্রদের, হরিত উপত্যকার ও মালাকার পাহাড় শ্রেণীর শোভা এবং নীচের অম্বর নাগরিকদের ধ্বংসোন্মুখ সৌধরাজির দৃশ্য মনের মধ্যে কেমন একটা উদাস ভাব আনে। মনে হয় এক সময়ে এখানেও কত মানুষই না তাদের বিচিত্র ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখের ও হাসিকান্নার মেলা পেতে বসেছিল। কোথায় তারা সব আজ?—সভ্যতার দৃশ্যের কেনই বা এ দ্রুত পরিবর্ত্তন ও ক্ষণে ক্ষণে যবনিকা পতন? পুরাতন দর্শনীয় স্থানগুলি দেখ্‌লে কেমন যেন শত চেষ্টা সত্ত্বেও এরূপ একটা বিষাদের ও জগতের অনিত্যতার ভাবকে ঠেকানো যায় না। সিকান্দ্রায় আকবরের সমাধি দেখেও এরূপ একটা করুণ মধুর ভাব মনের মধ্যে জেগেছিল। মনে হয়েছিল আজ কোথায় সে মনীষী, দার্শনিক, প্রজাবৎসল নররাজ, যাঁর মধ্যে উচ্চাশা কেবল সাম্রাজ্য স্থাপনের দিকে পরিণতি নেয় নি—বিশ্বজনীন ধর্ম্মের দিকেও নিয়েছিল। সারনাথেও অশোক স্তম্ভ দেখে সেই ঋষি, প্রেমিক, অহিংসার পুরোহিতের কথা মনে হয়েছিল, যিনি জগতের ইতিহাসে একমাত্র মানুষ বলে গণ্য হ'য়েছেন, যাঁকে যুদ্ধ জয়ও দৃপ্ততা এনে দেয় নি—দিয়াছিল বৈরাগ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও

আশ্চর্য্য এই যে সব রকম পুরাতন স্মৃতিচিহ্নই আমাদের মনে প্রায় একই রকমের উদাস ভাব আনে—তা সে পম্পিয়ার নষ্ট পল্লীই হোক্, ফরাসী বিপ্লবের ঋত্বিক্ দান্তনের সমাধির গর্ব্ব বাণীই হোক্, দিল্লী আগ্রার বিচিত্র স্নানহর্ম্ম্যই হোক্ বা সৌন্দর্য্যের রাণী তাজমহলের মানুষী কীর্ত্তির অনুপম চরম নিদর্শনই হোক্। এসব ভূত গৌরবের স্মৃতিই মনে একটা বৈরাগ্যের ভাব এনে দেয় যে **the paths of glory lead but to the grave.** অবশ্য এরূপ প্রতি দৃশ্য থেকেই আমরা বিভিন্ন রকমের প্রেরণা পাই সত্য, কিন্তু সে সবরকম প্রেরণার মধ্যেই কেন সর্ব্বদা এমন একটা বিষাদের, একটা করুণ ঔদাস্যের সুগম্ভীর অনুরণন বাজেই বাজে?—কে জানে?

জয়পুরে অতিথি হয়েছিলাম সেখানকার এক বনিয়াদী জায়গীরদার বাঙ্গালী পরিবারে। এঁদের জয়পুরে বাস তিন পুরুষ ধ'রে। বিদেশে এরূপ সম্মানিত বর্দ্ধিষ্ণু বাঙালী ঘর দেখ্‌লে মনটা কেমন যেন একটা গভীর তৃপ্তি বোধ করে। এঁদের সাদর আতিথ্যে আমার জয়পুরে অনেকগুলি গুণীর গানবাজনা শোনার সুযোগ হয়েছিল, কারণ তাঁরা আমার প্রতি কৃপাপরবশ হ'য়ে তাঁদের বাটীতে জয়পুরের কয়েকটি ওস্তাদ ও বাইজীকে ডেকেছিলেন।

তন্মধ্যে প্রথম শোনা গেল—কুতবালি খাঁ ব'লে একজন বীণকারের বীণা। এ বিংশ শতাব্দীতে বীণার রেয়াজ বোধ হয় উঠে গেছে বল্‌লেই হয়—অন্ততঃ উত্তর ভারতে বটেই। (যে হেতু দাক্ষিণাত্যে ভদ্র মেয়েরা এখনও বীণার চর্চ্চা করেন।) তাই অনেকদিন পরে সুদূর জয়পুরে যন্ত্রের রাণী বীণা উপভোগ করা যাবে এ কল্পনায় মনটা ভারি খুসি হ'ল। কিন্তু হায়, যে বীণা শুন্‌লাম তাতে মনটা কল্পিত খুসির সে তীব্র নিখাদ হ'তে সটাং বাস্তবের কোমল ঋষভে নেমে এল। কুতবালি খাঁ দুঃখ ক'রে জানালেন, যে "সরকারের" কাছে আছেন তাঁর জীবনের মূল সূত্রই হচ্ছে তাঁর তাঁবেদারগণকে লাট্টুর মতন ঘোরানো। "সরকার" প্রভুর এরূপ

বেখাপ্পা জীবনব্রতের কারণ কি জিজ্ঞাসা করাতে কুতবালি খাঁ ভগ্ন কণ্ঠে উত্তর দিলেন "হায়, কারণ আর কি ? তাঁর না আছে 'শওক্', না আছে 'দিল্'।" ব'লে নিজের দীনহীন বেশের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন ও বল্লেন যে তাঁকে তাঁর হুজুর 'বেফায়দা' ফকীর বানিয়ে দিয়েছেন। খ্রীষ্টদেবের দারিদ্র্যের আশীর্ব্বাদ সম্বন্ধে এ ক্লিষ্ট বৃদ্ধকে লেকচার দিয়ে ফল হবে না বুঝে তার সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ ক'রেই মানুষের সঙ্গে মানুষের সামাজিক বাধ্যবাধকতার দাবী দাওয়ার মর্য্যাদা রাখা ছাড়া আর উপায় দেখলাম না। কিন্তু মনে সত্যই দুঃখ হ'ল যে এরূপ অব্যবস্থিতচিত্ত অভিজাতগণের কৃপার উপরেই আমাদের সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা নির্ভর করতে পারে একথা এখনও অনেকে বিশ্বাস করেন! ভবিষ্যৎ পৃষ্ঠপোষকতা করতে পারে এক শিক্ষিত লোকমত, আগেকার যুগের মতন অলস ও বিলাসী রাজারাজড়ার কৃপাকটাক্ষ নয়। এ সম্বন্ধে আমি ইতিপূর্ব্বে বিশদ ভাবে লিখেছি * তাই আজ এ সম্পর্কে শুধু এইটুকু মাত্র ব'লেই ক্ষান্ত হব, যে যাঁরা আগেকার যুগের রাজারাজড়াদের সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতাকে বড় ক'রে দেখতেন তাঁরা জানেন না সে পৃষ্ঠপোষকতা প্রায়ই কি মূল্যে ক্রয় করা হ'ত। শিল্পীর আত্মসম্মানকে নষ্ট ক'রে তার কলাকারুকে বড় করা যায় না।

তার পর দিন জয়পুরের শ্রেষ্ঠ গায়িকা গহর বাইয়ের গান শোনা গেল। গহর বাইয়ের বাড়ীতেই গান হ'য়েছিল। সাধারণতঃ বাইজীদের বাড়ী অত্যন্ত অপরিষ্কার থাকে। যারা কোনও একটা শিল্পকলার মধ্য দিয়ে সৌন্দর্য্য খোঁজে তাদের বহির্জীবনে অপরিচ্ছন্নতা বোধ হয় একটু বেশি আশ্চর্য্য হ'য়ে

* Modern Review, November, 1924.........Patronage of Music প্রবন্ধে।

ওঠে। কেননা, মানুষের মন সব দিক্ দিয়ে একটা সামঞ্জস্য না পেলে দুঃখবোধ করে ব'লে, এরূপ শিল্পীর শিল্পে মুগ্ধ হ'লে আমরা তাদের জীবন-যাপনের সব দিকের অভিব্যক্তির মধ্যেই তার সৌকুমার্য্য ও সৌন্দর্য্যবোধের নিদর্শন খুঁজতে ব'সে যাই। এই জন্য বোধ হয় বড় গায়ক গায়িকাদের বাসভবনটা বেশি মনোজ্ঞ না হ'লে সঙ্গীতানুরাগী একটু বেশি ক'রে অস্বস্তি বোধ না ক'রেই পারেন না। অন্ততঃ আমার নিজের ত এরূপ অস্বস্তি প্রায়ই হ'ত। এক বম্বের বিখ্যাতা গায়িকা তারাবাইয়ের বাড়ীটির পরিচ্ছন্নতা আমাকে তৃপ্তি দিয়েছিল মনে আছে। এবং জীবনে এই দ্বিতীয়বার বাইজীর বাড়ী পরিষ্কার দেখ্‌লাম। গহরবাইয়ের বাড়ীটি শুধু পরিষ্কার নয়, বড় সুন্দর জায়গায় অবস্থিত। তিন দিকে জয়পুরের শ্রেণীবদ্ধ পাহাড়মালা। নীচে একটি ছোট বাগান। এরূপ স্থানে প্রভাতী রাগিণীগুলি শুন্‌তে পাওয়া যাবে ভেবে মনটি বিমল খুসিতে ভ'রে উঠ্‌ল। তবে ভয় ছিল, পাছে বিখ্যাত গহরবাই মুজরা না ক'রে গাইতে রাজী না হন। কিন্তু গহরবাই বোধ হয় গানের আন্তরিক অনুরাগ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হ'লে উদার হ'তে অসম্মত হন না। শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর বাইজীদের মধ্যে এরূপ উদারতা আমি দেখেছি, যদিও নিম্নশ্রেণীর বাইজীদের গান শোনানর জন্য দরদস্তর করার দৃষ্টান্তও যথেষ্ট দেখা যায়।

যাই হোক্ গহরবাই একটি আশাবরী ধামার (ধ্রুপদ), একটি আশাবরী মধ্যমান (খেয়াল), একটি ভৈরবী টপ্পা ও একটি ভৈরবী ঠুংরি গাইলেন। তাঁকে দেখে প্রথমে আমি একটু নিরাশ হ'য়েছিলাম। কারণ, একে তাঁর বয়স কম (৩০।৩২ হবে) ও দ্বিতীয়তঃ তাঁর চেহারা সুশ্রী। এরূপ বাইজীরা সহজেই খাঁ বাহাদুর ও রাজাবাহাদুর প্রমুখ হোম্‌রাও চোম্‌রাওগণের প্রিয়পাত্রী হ'য়ে পড়েন ব'লে তাঁদের উচ্চসঙ্গীত শেখার না থাকে সময়, না হয় সুযোগ। সে জন্য অল্পবয়স্কা সুশ্রী বাইজী ভাল গাইতে পারে শুন্‌লেও

আমি অনেক সময়ে তাঁদের গান শুন্‌তে যেতে মনকে রাজী কর্‌তে পারি না। লক্ষ্ণৌয়ের অচ্ছনবাই, গোয়ালিয়রের মঙ্গুবাই ও এলাহাবাদের জানকীবাই যে এত ভাল গান তার একটা প্রধান কারণ মনে হয় তাঁদের সৌন্দর্য্যের অভাব। যেন এই অভাব পূরণ কর্‌তেই তাঁদের চেষ্টা ক'রে উচ্চসঙ্গীত শেখার সময় ও সুযোগ ক'রে নিতে হয়েছে।

যাই হোক্ সুখের বিষয় গহরবাইয়ের একটি গান শুন্‌তে না শুন্‌তে বোঝা গেল যে তিনি উপরোক্ত সাধারণ নিয়মের একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। তিনি শুধু যে ভাল গান তাই নয়, এরূপ সুললিত উচ্চশ্রেণীর গান শোনার সৌভাগ্য জীবনে খুব কমই হয়।

সেদিন সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ীতে তিনি এলেন ও তিন চার ঘণ্টা গেয়েও এক পয়সা 'ইনাম' নিলেন না। বল্‌লেন যে কদরদানের (গুণগ্রাহী) কাছে গান গাইতে পাওয়াটাই তাঁর কাছে যথেষ্ট ইনাম। (সেদিন সভায় অনেকগুলি সমজদার হিন্দুস্থানী ও বাঙালী শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।) এরূপ সত্য শিল্পীর মর্য্যাদালাভের আন্তরিক স্বীকারোক্তি আমাদের সকলেরই বড় ভাল লাগ্‌ল।

যাই হোক্, গহরবাই সন্ধ্যা ৮টা থেকে আরম্ভ ক'রে রাত্রি প্রায় বারটা অবধি গেয়ে গেলেন। কি সে গান! কি সে সুরলালিত্য! কি সে মিড়ের তৃপ্তি ও কি সে নানাবিধ তানের জম্‌কালো আবেদন! গাইতে গাইতে তাঁর গানও যেন এক অপরূপ প্রেরণায় মণ্ডিত হ'য়ে উঠ্‌ল। কেদারা, কামোদ, বাগেশ্রী, বেহাগ প্রভৃতি খেয়াল তিনি যে অপূর্ব্ব ঢঙে গাইলেন, সেরূপ বিচিত্র ও উৎকৃষ্ট ঢং নারীকণ্ঠে কখনও শুনিনি। এরূপ উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীত শুনে, মনটা অবর্ণনীয় আনন্দে ভ'রে উঠ্‌ল। জীবনে তিন চার বার মাত্র নারীকণ্ঠের গান ভাল লেগেছিল। কিন্তু গহরবাইয়ের গানের তৃপ্তির তুলনায় সে-সব বাইয়ের গানের-আনন্দের স্মৃতি এক মুহূর্ত্তে

পাণ্ডুর হ'য়ে গেল। গহরবাইয়ের একটা মস্ত কৃতিত্ব এই যে, তাঁর গানে শুধু যে নারীসুলভ সুষমা ও সৌকুমার্য্য আছে তাই নয়, তাঁর গানে পুরুষোচিত গাম্ভীর্য্যেরও অভাব নেই ; বিশেষতঃ তাঁর হলক্ তানে, সার্গম আলাপে ও তালের বাঁটে। আমার আশৈশব-শ্রুত বহু গানের আসরের মধ্যে এ আসরটি একটি স্মরণীয় দিন।

গহরবাই গজলও গাইলেন—কিন্তু বেশীর ভাগ পারস্য ভাষায়। পারস্য ভাষাটিকে বোধ হয় এশিয়ার ইতালীয়ান ভাষা বলা যেতে পারে—অর্থাৎ গানের পক্ষে ভারি উপযোগী সুললিত ভাষা। গজলের নানা সুরের বৈচিত্র্য ও মূর্চ্ছনার সঙ্গে পারস্য ভাষার শ্রুতিমধুর পদবিন্যাস, অর্থ বোধগম্য না হওয়া সত্ত্বেও, বড় মনোহর হ'য়ে ওঠে, যদি গহরবাইয়ের মতন প্রথম শ্রেণীর গায়িকার মুখে তা শোনা যায়। এস্থলে গজলের স্বপক্ষে দু'একটি কথা বলা দরকার মনে করছি, কারণ বিজ্ঞস্মন্য সমজদার মহলে গজল্ সাধারণতঃ বড়ই অবজ্ঞাত হ'য়ে থাকে।

সকলেই জানেন যে গজল হচ্ছে পারস্য দেশের প্রেমের সঙ্গীত। তবে সাধারণতঃ ভাল গজলের বৈশিষ্ট্য এই যে তা যেমন একদিকে প্রেমাস্পদের জন্য উদ্দিষ্ট ব'লে গৃহীত হ'তে পারে, তেমনি অপরদিকে ভগবানের উদ্দেশে গীত বলে মনে করা যেতে পারে। কাজেই গজলের ভাব নিতান্ত গ্রাম্য হবে একথা কেবল তাঁরাই মনে করতে পারেন যাঁরা কেবল অশিক্ষিত-পটুত্বেরই দাবী রাখেন।*

সুরের দিক দিয়ে বিচার কর্‌তে গেলে অবশ্য একথা মান্‌তেই হবে যে সাধারণতঃ গজল যে ভাবে গাওয়া হ'য়ে থাকে, তাতে তার মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে পীড়া না দিয়েই পারে না। কিন্তু এ অভিযোগের উত্তরে বলা যেতে পারে যে, তাই ব'লে বলা চলে না যে গজলে উচ্চ সঙ্গীতের সুষমা গ্রথিত করা অসম্ভব। কারণ বস্তুতঃ গজলে খেয়ালের তান, ধ্রুপদের গমক ও ঠুংরির ছোট ছোট বোল প্রবর্ত্তন করার কোনই বাধা নেই বা থাক্‌তে পারে না। এটা নিছক থিওরি নয়। গজল কিরূপ সুন্দরভাবে গীত হ'তে পারে সে সম্বন্ধে আমাদের দেশের অনেক উচ্চশ্রেণীর বাই এখনও একটা বিশদ ধারণা দিতে পারেন। অবশ্য গজলের পর গজল তেমন ভাল লাগে না, কারণ গজলের পদের ব্যবহার অনেকটা সংস্কৃত শ্লোকের মতন ব'লে তার মধ্যে খেয়ালের বা ঠুংরির বৈচিত্র্যও সম্পূর্ণ আনা যায় না, বা আন্‌তে গেলে তাতে গজলের বৈশিষ্ট্যও বজায় রাখা যায় না। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। গজলের যা প্রাপ্য মূল্য, তাকে সেটুকুও যদি দেওয়া যায়, তবে, তা থেকে যথেষ্ট আনন্দের খোরাক সংগ্রহ করা যেতে পারে। আমি নিজে লক্ষ্ণৌয়ে ইন্দর বাই ব'লে একজন সুগায়িকার গান শুনে, প্রথম গজলের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে পূর্ণভাবে সচেতন হই। এখানে গহর বাইও আমার গজল সম্বন্ধে উচ্চ ধারণার পরিপোষকতাই ক'রেছিলেন। তাঁর পারস্থ ভাষায় গীত গজলগুলির মধ্যে গজলের বৈশিষ্ট্য ও ঠুংরির সূক্ষ্ম কাজ ও খেয়ালের গম্ভীর তান সবই ছিল। তা ছাড়া গজলের ধ্বনিলাবণ্যও তার মধ্যে গরীয়ান হ'য়ে ফুটে ওঠবার সুযোগ পেয়েছিল। ফলে তাঁর গজলের মধ্যে এক বিচিত্র সমন্বয়ের মুগ্ধকরী গরিমা আমাদের সকলকেই কম-বেশী তৃপ্তি দিয়েছিল। যাঁরা বলেন যে গজলের সৌন্দর্য্য সুরের নয়, কথার, তাঁদেরও ভ্রান্ত ব'লে মনে করার কারণ আছে। কেননা এটা দেখা গিয়ে থাকে যে গজলের কথা

না বুঝলেও, অনেক সঙ্গীতানুরাগী গজল হ'তে যথেষ্ট রস সঞ্চয় করতে পেরে থাকেন। (যেমন গহরের মুখে হাফেজের ও অন্যান্য পারস্য কবির রচিত গজল গানে আমরা পেয়েছিলাম)। এই সব কারণে গজলকে বস্তুতঃ সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর সঙ্গীত বলা না চললেও, নিম্নশ্রেণীর সঙ্গীত বলাও উচিত ব'লে মনে হয় না। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে গজলের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে, ও সেটা মোটের উপর আনন্দের বিষয় বলেই মনে করা চলে, যদি সঙ্গীত জগতে গজলকে ঠিক তার যথাযথ **Perspective**এ দেখা যায়। গহর বাইয়ের গজলগুলি শুনতে শুনতে আমরা যে যথেষ্ট সত্য আনন্দ পেয়েছিলাম, বিজ্ঞতার খাতিরে তাকে অস্বীকার করাটা কি মূঢ়তা নয়? সঙ্গীত-সমজদারের গজলকে অবজ্ঞা করার মনোভাবটি অনেকটা ধ্রুপদীর খেয়াল-বিরাগ বা খেয়ালীর টপ্পা-ঠুংরীর বিরাগের সমান। জীবনে দুঃখ কষ্টের ত' অবধি নেই। তাই এ দুঃখবহুল জীবনে শিল্পকলার যেটুকু সত্য নিবিড় আনন্দ পাওয়া যায় সেটুকু হ'তে নিরর্থক বিজ্ঞম্মন্যতার প্ররোচনায় বঞ্চিত না থাকাই কি সুবিবেচনার কাজ নয়?

গহর বাই যে সব জড়িয়ে অচ্ছন বাই বা জানকী বাইয়ের চেয়ে উচ্চদরের গায়িকা এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর তানের বৈচিত্র্য, সুরের সূক্ষ্মতা, গানের শ্রী, সুরের ব্যঞ্জনা, আলাপের জমকালোত্ব সবই অতি উচ্চ অঙ্গের। তাঁর কণ্ঠস্বর অতি মধুর, কেবল তাঁর একটি মাত্র ত্রুটি আছে। ত্রুটিটি এই যে তাঁর কণ্ঠের পরিসর (**range**) কম। বস্তুতঃ তাঁর একমাত্র ত্রুটীই এই যে তাঁর স্বর তারার রেখাবের বেশি চড়ে না বা চড়লেও **falsetto** হ'য়ে যায়। প্রতি গানে অন্ততঃ তারার গান্ধার মধ্যম অবধি বিস্তার করতে না পেলে গায়কের মনটাও সম্পূর্ণ খুসি হয় না, শ্রোতার মনও সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করে না। এ ছাড়া গহর বাইয়ের স্বরের অন্য কোনও ত্রুটী আমি ত অন্ততঃ খুঁজে পাই নি। তাঁর গলায় বিশুদ্ধ নিক্তির ওজনের

সুর, প্রাণস্পর্শী মিড়, মনোজ্ঞ তান, এমন কি সুন্দর সার্গম সবই অতি সুন্দর। তা ছাড়া তিনি সুন্দরী না হলেও তাঁর চেহারার মধ্যে একটা শ্রী আছে যেটা সঙ্গীতের সুষমা-বর্দ্ধন না ক'রেই পারে না। এক কথায় গহর বাইয়ের গান অতি উচ্চ শ্রেণীর গান এবং প্রত্যেক সঙ্গীতানুরাগীরই শ্রোতব্য। তাঁর মতন গায়িকার গান শুন্‌তে শুন্‌তে কেবল এই দুঃখ হয় যে বাইজীর গান ব'লে এরূপ গান আমাদের শিক্ষিত সমাজের কত লোকেই শোনেন না বা শুন্‌তে চান না। আমাদের নারীকণ্ঠের সঙ্গীত যে কত উচ্চ শ্রেণীর হ'তে পারে সে সম্বন্ধে আমাদের শিক্ষিত সমাজের অজ্ঞতা আক্ষেপের বিষয় মনে না ক'রেই গত্যন্তর নেই। কারণ যাঁরাই শ্রেষ্ঠশ্রেণীর কলাকুশল বাইজীর গান শুনেছেন, তাঁরাই জানেন যে তাঁদের সুরব্যঞ্জনা, স্বরলালিত্য, ভাবদ্যোতনা ও নারীসুলভ বিচিত্র শ্রীতে আমাদের উচ্চ সঙ্গীত কি এক মনোজ্ঞ বৈশিষ্ট্যে ভূষিত হ'য়ে ওঠে।

জয়পুরের সবচেয়ে বড় ওস্তাদ বোধ হয় কেরামৎ খাঁ। এঁর গান আমি গত বৎসর লক্ষ্ণৌ সঙ্গীত সম্মেলনে শুনেছিলাম। এঁর সম্বন্ধে শুধু এইটুকু মাত্র বলেই ক্ষান্ত হব যে এঁর ধ্রুপদ বাস্তবিকই উচ্চশ্রেণীর, যার মধ্যে তালের মল্লযুদ্ধের চেয়ে সুরের স্থায়িত্বের তৃপ্তিই যথাযথভাবে ফুটে উঠে থাকে। ইনি একদিন জয়পুর কলেজে আমাকে কামোদ, কেদারা, তিলককামোদ প্রভৃতি অতি আগ্রহের সঙ্গে শোনালেন। কারণ বোধ হয় আজকাল এ অশীতিপর ভগ্নকণ্ঠ বৃদ্ধের গান শুনতে অপরে আগ্রহ প্রকাশ করে না। সেদিন তাঁর রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে যখন তারার রেখাবও তিনি প্রাণপণ চেষ্টায় বাহির কর্‌তে পার্‌ছিলেন না, তখন দু'একটী ছাত্র হাস্‌তে আরম্ভ ক'রে দিল। তাতে ক্ষুব্ধ বৃদ্ধ বল্‌লেন, "যো নেহি সম্‌ঝায়েগা ও তো হাসেগা।" তাতে তারা একটু লজ্জিত হ'য়ে চুপ করল। বৃদ্ধ কেরামতের গান কর্‌বার উৎসাহ ও বিফল প্রযত্ন দেখে রবীন্দ্রনাথের বৃদ্ধ

কাশীনাথ গায়কের সম্বন্ধে হৃদয়স্পর্শী কবিতাটি মনে পড়ল। বস্তুতঃ সংসারে ট্রাজিডির হয় ত সীমা নেই। কিন্তু বোধ হয় খুব কম মনোদুঃখের ট্রাজিডিই জরাজীর্ণ গায়কের অবসন্ন প্রতিভার পুনরুজ্জীবনের বিফল চেষ্টার মতন ব্যথাদায়ক।

জয়পুরের "গুণিজনখানার" (রাজসভাগায়কসঙ্ঘের) অধ্যক্ষ পিয়ারিলাল মহোদয়ের কৃপায় তাঁর বাড়ীতে তিনি আমাকে শোনাবার জন্য ফিরদৌসি বাই ও দুর্গা বাইকে নিমন্ত্রণ করেন। ফিরদৌসি বাইয়ের গানের যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারণ করা একটু কঠিন। তাঁর বয়স অল্প ব'লে গলাও সতেজ, সুরের লাগডাঁটও ক্ষীণ নয় মিড়ও বেশ সুষ্ঠু, স্বরও চাপা বা অমিষ্ট নয় রাগজ্ঞানও মন্দ নয়, এবং তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম ক'রে গেয়েছিলেন এ কথাও অস্বীকার করার উপায় ছিল না। অথচ তাঁর গান সেদিন তাঁর শত চেষ্টা সত্ত্বেও কেমন যেন যাকে বলে "জম্‌ল না"।

তার একটা কারণ বোধ হয় এই যে তাঁর তান ও মূর্চ্ছনা মিষ্ট নয়। যাঁরা অনেক গায়ক গায়িকার গান শুনেছেন তাঁ'রাই জানেন যে এমন প্রায়ই হয় যে কোনও গায়ক বা গায়িকার হয়ত তান ভাল কিন্তু মিড় ভাল নয় কিম্বা মিড় ভাল, কিন্তু তান মিষ্ট নয়; অথবা হয় ত তান ও মিড় দুইই ভাল কিন্তু গলা যাকে বলে সুরেলা—তা নয়। ভাগলপুরে মুস্তরি বাই ব'লে একটি বাইজী আছেন; তাঁর গলাও বেশ ও মিড়ও বেশ সুন্দর, কিন্তু তান বড় হীনশ্রী ব'লে তাঁর গানের প্রথম দিকের অর্থাৎ মিড় ও সুর বিস্তারের—রসটি জলদ মূর্চ্ছনার সময় বড় অকস্মাৎ নষ্ট হ'য়ে যায়। বিখ্যাত চন্দন চৌবে সুরের ও মিড়ের রাজা হ'লেও তানে তাঁর গলা খেলে না। কাজেই তাঁর ধ্রুপদখেয়ালই ভাল, কিন্তু বিশুদ্ধ খেয়াল তেমন সৌষ্ঠবসম্পন্ন নয়।

ফিরদৌসি বাইয়ের সঙ্গে অবশ্য চন্দন চৌবের মত অভ্রভেদী শিল্পীর তুলনা করা আমার উদ্দেশ্য হ'তেই পারে না। তবে তাঁর গানের

সমালোচনা করার সময় এরকম একটা কথা স্বতঃই মনে হয় ব'লেই এ প্রসঙ্গে চৌবেজীর গানের অবতারণা করলাম। প্রসঙ্গতঃ একটা কথা বড় বেশি ক'রে মনে হয়। সেটা এই যে বড় খেয়ালী বা ঠুংরি গায়ক বড় ধ্রুপদী হওয়ার চেয়ে বোধ হয় অনেক বেশি কঠিন। কারণ বড় ধ্রুপদী হ'তে হ'লে গায়কের যে সব গুণ থাকা দরকার, খেয়ালী বা টপ্পাঠুংরি গায়ক হ'তে হ'লে তার উপরেও আরও অনেকগুলি গুণ অর্জ্জন করা দরকার হ'য়ে ওঠে। এই জন্যই গুণীশিরোমণি আবদুল করিম বা স্রষ্টা শিল্পী রায় বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়ের খেয়ালে যে তৃপ্তির সম্পূর্ণতা পাওয়া যায় সে রকম সমৃদ্ধ পূর্ণতা অন্য অনেক ভাল খেয়ালী বা ঠুংরি গায়কের মধ্যে পাওয়া যায় না। কারণ খুব কম গায়কই আছেন যাঁদের গান কণ্ঠস্বর, গানের ভঙ্গী, মিড়, গমক, মূর্চ্ছনা, রাগের বিস্তার-পদ্ধতি প্রভৃতির সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্যে বিকশিত হ'তে পেরেছে। সেইজন্যই প্রকৃত সঙ্গীতানুরাগীর পক্ষে আজকাল হিন্দুস্থানী উচ্চসঙ্গীত হ'তে এত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কমবেশি নিরাশ হ'য়ে ফিরতে হয়। এ সত্যটি অবশ্য সেই একটি চিরন্তন স্বতঃসিদ্ধ সত্যেরই অন্যতম উদাহরণ মাত্র, যে সংসারে সব মানুষী কীর্ত্তিরই একটা বহুমুখী সমৃদ্ধ মহিমায় মণ্ডিত হয়ে ওঠার দৃষ্টান্ত জগতে বড় বিরল। এবং রসগ্রাহীর আনন্দের বা রসমূল্যের মাপকাটি যত উচ্চ হ'তে থাকে তার সে আনন্দের আদর্শ লাভ করাও তত বিরল হ'য়ে না উঠেই পারে না।

সেদিন দেবী সিং ব'লে জয়পুরের এক মস্ত জায়গীরদার জয়পুরের ভূতপূর্ব্ব শ্রেষ্ঠ গায়িকা দুর্গাবাইকে ডেকে পাঠালেন। দুর্গাবাইয়ের নাম আমি অনেকদিন থেকে শুনেছিলাম। জয়পুরে তাঁর জীবনের ইতিহাসটি সেখানকার অনেকগুলি বড় জায়গীরদারের কাছে শোনা গেল। বড় করুণ ইতিহাস, অথচ তার মধ্যে সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্বের উপাদানেরও

অভাব নেই। দুর্গা বাই বহুদিন এক মস্ত নবাবের রাজপ্রাসাদে ছিলেন ও তাঁর খুব প্রিয়পাত্রী ও সভা-গায়িকা ছিলেন। সেখানেই তাঁর উচ্চ সঙ্গীত শিক্ষা। কোনও কারণে নবাব সাহেবের সঙ্গে তাঁর বনিবনাও না-হওয়াতে তিনি জয়পুরে চ'লে আসেন। তখন তাঁর সম্পত্তি প্রায় দুই লক্ষ টাকারও অধিক ছিল। কিন্তু জয়পুরের এক অসৎ রাজকর্ম্মচারীর প্রণয়ে প'ড়ে দুর্গাবাই তাঁর যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে পথের ভিখারিণী হন। (সে রাজকর্ম্মচারীটিও এখন জেলে।) কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি নাকি তাঁর দুঃস্থ কপট প্রণয়ীর জন্য অন্য অনেক অর্থবান প্রসাদ-প্রার্থীদের প্রত্যাখ্যান করতে দ্বিধা করেন নি। বাইজীদের জীবনে এরূপ দুএকটি আত্মহারা প্রণয়ের চিরন্তন বেদনার কাহিনী যে শোনা না যায় এমন নয়, কিন্তু সেরূপ কোনও হতাশ প্রণয়িনীর গান শোন্‌বার সুযোগ বোধ হয় খুব কম সঙ্গীতানুরাগীর ভাগ্যেই ঘটে। তাই যিনি প্রেমের জন্য দুতিন লক্ষ টাকার সম্পত্তিকেও এভাবে তুচ্ছ করতে পেরেছেন, তাঁর বিগতগৌরব নষ্টসৌরভ গানও সেদিন আমার কাণে যেন কেমন এক অনির্দ্দেশ্য বিষাদমাধুর্য্যে পরিপ্লুত হয়ে বেজে উঠেছিল।

দুর্গা বাই যখন এলেন তখন তাঁর দীনহীন বেশ দেখে সকলেরই বোধ হয় দুঃখ হ'য়েছিল। বাইজীরা সচরাচর যে মহার্ঘ্য বেশভূষা না ক'রে আসেন না, একথা বোধ হয় সকলেই জানেন। কিন্তু দুর্গা বাইয়ের বেশভূষার মধ্যে ছিল মাত্র একটি রাঙা পায়জামা ও মলিন ওড়না। হাতে ছিল তাঁর কেবল দু গাছি কাঁচের চুড়ি। তাঁর চালচলন, কথাবার্ত্তা, চাহনি সবের মধ্যেই যেন এক মূর্ত্তিমতী হতাশা বিরাজ করছিল।…শুন্‌লাম আজকাল তাঁর দিন গুজরান হয় না এরূপ অবস্থা হ'য়েছে। তাঁকে দেখ্‌লে মনে হয় যে বয়স ৫৫।৫৬র কম হবে না, কিন্তু শুন্‌লাম যে তাঁর বয়স বস্তুতঃ বেশি নয় ৪২।৪৩শের কাছাকাছি হবে।

অথচ···একদিন ছিল যখন এই দীনহীনবেশা ধূলিধূসরিতা দুর্গাবাই পেশোয়াজ প'রে গাইতে উঠে দাঁড়ালে পশুপক্ষীও তাঁর সে রূপলাবণ্যে মোহিত হ'ত, মানুষ ত কোন্ ছার। *

সে রূপযৌবনেরও এখন কিছুই নেই, সে মিষ্ট কণ্ঠস্বর ও সঙ্গীত-কুশলতাও ধ্বংসোন্মুখ বল্লেই হয়। তবু তিনি সেদিন যা গাইলেন তার মধ্যে একটা অপূর্ব্ব গানের ঢং, মিড়, মূর্চ্ছনা ও মনোজ্ঞ বিস্তারভঙ্গী স্থানে স্থানে দীপ্ত হ'য়ে ধরা দিচ্ছিল। দুর্গাবাইয়ের কণ্ঠস্বর এখনও মিষ্ট, তানালাপ এখনও মধুর ও রাগরাগিণীর বিস্তারপদ্ধতি এখনও উপভোগ্য। কেবল আজকাল তিনি একেবারেই প্রাণ দিয়ে গাইতে পারেন না। কাজেই তাঁর গান সেদিন জম্‌ল না যদিও তিনি কেদারা, ছায়ানট, বেহাগ, তিলক-কামোদ, সুরট, বাগেশ্রী প্রভৃতি অনেকগুলি রাগ গাইলেন। বিশেষতঃ "পিয়া কর ধর দেখো ধরকত হয় মোরি ছড়িয়া" ব'লে একটি দেশ ভারি সুন্দর একতালার ছন্দে গাইলেন। তাঁর অনেক গানের মধ্যেই এই রকম বেশ একটা মৌলিক দানের গরিমা আছে। কিন্তু দুঃখ হ'ল যখন শুন্‌লাম যে, তিনি আজকাল গাইতে বড় একটা চান না, ও কোথাও যান না। আমাকে বল্‌লেন যে তাঁর "আওয়াজ বৈঠ গয়ি থি"। কাজেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে ঘণ্টাখানেক গাওয়ার পরই অবসর দিতে হ'ল।

পরে দু'চার জন জয়পুরের গণ্যমান্য লোককে আমি আক্ষেপ জানালাম যে দুর্গাবাইকে যে জয়পুররাজ এক পয়সাও দেন না, এটা বড়ই অন্যায়; এরূপ গুণী গায়িকার শেষ বয়সে অনাহারে মরণ হওয়া জয়পুরের সঙ্গীত-পৃষ্ঠপোষকতার উপর কলঙ্কসূচক, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাতে তাঁদের কাছে

---

* শেষ কথাটি জয়পুরের একজন বনিয়াদি গায়কের মুখে শুনেছিলাম যিনি দুর্গাবাইকে প্রথম থেকেই জানতেন।

শুন্‌লাম যে দুর্গা সত্য সত্য পাগল হয়ে গেছে, কিছু টাকা পেলেই জুয়া খেলে, ভিক্ষা করে ইত্যাদি। একজন প্রথম শ্রেণীর গায়িকার জীবনের কি শোকাবহ পরিণতি !

একথাটা আরও বেশি ক'রে আমার মনে হ'য়েছিল আল্লাবন্দে-জাকর উদ্দীনের ভ্রাতুস্পুত্র রিয়াজউদ্দীনের গান শোন্‌বার সময়ে। রিয়াজউদ্দীন পিতৃব্যদ্বয়ের সঙ্গীতের অবিসংবাদিত প্রতিভা পাননি ব'লে তাঁর গানের সঙ্গে ফুলজী ভটের গানের তুলনায় আধুনিক ও পুরাতন-পন্থীদের বৈষম্যটি আরও বেশি ক'রে প্রতীয়মান হয়। কারণ জাকর উদ্দীন-আল্লাবন্দে পুরাতনপন্থী হ'লেও তাঁদের সময়ে তাঁদের ঢঙের গানের যুগ ততটা অতীত হ'য়ে যায়নি যতটা হ'য়ে পড়েছে—রিয়াজউদ্দীন নাসিরউদ্দীন প্রমুখ তাঁদের পুত্রগণের আমলে। এঁদের গলাও মিষ্ট, ধ্রুপদ জ্ঞানও যথেষ্ট। কিন্তু তবু এঁদের ধ্রুপদ বড়-একটা কেউ শোনে না; শোনে—ঠুংরি টপ্পা। (এ আক্ষেপ রিয়াজ উদ্দীন একদিন নিজেই আমার কাছে ক'রেছিলেন) অন্ততঃ যুগধর্ম্মকে অস্বীকার ক'রে যে কোনও শিল্পেরই প্রাণশক্তির উত্তরোত্তর বিকাশ হ'তে পারে না এ কথা উপলব্ধি না কর্‌লে আমাদের সঙ্গীতের মুক্তি নেই। রিয়াজ উদ্দীন খাঁ যদি একথা উপলব্ধি কর্‌তেন তাহ'লে হয়ত তাঁর আজ ফুলজী ভটের বা গহরের লোকপ্রিয়তার জন্য অনুযোগ করার দরকার হ'ত না। জয়পুরে একটা আসরে রিয়াজউদ্দীন খাঁ একদিন ঘণ্টাখানেক কেদারা, হাম্বির, ছায়ানট, হিণ্ডোল প্রভৃতি নানারাগের আলাপ শুনিয়েছিলেন সেই মামুলি ঢঙে। তাঁর গানের বিশেষ কোনও দোষও ছিল না—কারণ তাঁর গলাও অমিষ্ট ছিল না, মুদ্রাদোষ প্রভৃতির আড়ম্বর আস্ফালনও ছিল না। কিন্তু তথাপি তাঁর গান যে সেদিন কাউকেই আনন্দ দিতে পারে নি, একথা তাঁর আত্ম-প্রসাদলোলুপতা সত্ত্বেও বোধ হয় তাঁর সহজানুভূতির চোখ এড়ায় নি।

কারণ তিনি নিরুৎসাহ হ'য়ে যাবার সময় বিদায়বাণী না ব'লেই পলায়ন কর্‌লেন—যেটা মুসলমান ওস্তাদেরা নিতান্ত ভগ্নহৃদয় না হ'লে করে না। হ'লে করে না। তার পর দিন তিনি আমার কাছে এসে চন্দন চৌবে ও ফৈয়াস খাঁ প্রমুখ লোকপ্রিয় গায়কদের নিন্দায় রোমাঞ্চিত ও অশ্রুপূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌লেন, ও নানা ছন্দে নিজের ও নিজের 'ঘরওয়ানা চালের' শ্রেষ্ঠতা নিয়ে আস্ফালনে ঘরকে মুখর ক'রে তুল্‌লেন। অথচ দুঃখ এই যে আমার তাঁকে বলার উপায় ছিল না "খাঁ সাহেব তুমি যে 'টি না না না, তোম্ না রা না'—রূপ শুষ্ক স্বর বৈচিত্র্যের অনুকরণকেই জপমালা ক'রে ব'সে আছ তাতে তোমার দুঃখ ঘুচবে না,—তা তুমি যতই কেন না ফৈয়াস খাঁ ও ফুলজী ভটের নিন্দায় পুলকিত হ'য়ে ওঠ।

তোমরা যতদিন না বুঝবে যে বর্ত্তমান যুগে এ সব 'অল্লাবন্দেয়ামির' ভূতপূর্ব্ব রূপমোহ যাদুঘরের লুপ্তরত্ন সংগ্রহের সঙ্কীর্ণ আবেদনের সঙ্গে সমশ্রেণীর হ'য়ে গেছে ততদিন তোমাদের এক পরনিন্দায়ই গায়ের ঝাল মিটিয়ে সন্তুষ্ট থাক্‌তে হবে।"

বম্বেতে এবার এক বেগম সাহেবা কথায় কথায় বল্‌লেন, "বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে! তিনি ভারতীয় সঙ্গীতে মহাত্মা গান্ধি।"

কথাটা শুন্‌তে প্রথম থেকেই একটু আশ্চর্য্য ঠেকে। কারণ সন্দিগ্ধ মনটি এ কথায় স্বতঃই প্রশ্ন করে বস্‌তে চায়—গানে মহাত্মা গান্ধি বল্‌তে খুব স্পষ্ট কিছু বোঝায় কি না? কিন্তু তবু এ তুলনামূলক উচ্ছ্বাসটির

মধ্য দিয়ে মহাজনের প্রতি হৃদয়ের সম্মানের একটা স্বতঃপ্রণোদিত অর্ঘ্য বড় সুন্দর নিবেদিত হয় ব'লে এ কথাটা মোটের উপর আমার বড় ভাল লেগেছিল।

পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের সঙ্গে বৎসরাধিক আগে যখন প্রথমে সংস্পর্শে আসি তখন যেটা সবচেয়ে বেশি চিত্তাকর্ষী ঠেকেছিল সেটা হচ্ছে তাঁর সদাপ্রসন্ন হাস্যমুখ, নিরভিমান পাণ্ডিত্য ও সঙ্গীতে ঐকান্তিক আনুরক্তি। কিন্তু তারপর থেকে তাঁর সঙ্গে বারবার সংস্পর্শে আসার পরম সৌভাগ্য আমার হ'য়েছিল যার নিবিড় পরিচয়ের ফলে চমৎকৃত হৃদয় বেগম সাহেবার কথার প্রতিধ্বনি ক'রে পণ্ডিত ভাতখণ্ডকে উপকৃতের ও সংস্পর্শ-পরিশুদ্ধের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করতে ব্যগ্র হ'য়ে না উঠেই পারে না। এরূপ মহাপ্রাণ লোকের সংসর্গ সত্যই সজ্জনসংসর্গ, সাধুসঙ্গ। নিঃস্বার্থতায়, জ্ঞাননিষ্ঠায়, সঙ্গীতপাণ্ডিত্যে, বিবেচকতায়, তীক্ষ্ণ বিচার-ক্ষমতায়, একনিষ্ঠতায় ও সর্ব্বোপরি সরল বিনয়ে এমন একটা সুন্দর চরিত্রের পরিণতি একটা দ্রষ্টব্য বস্তু। অথচ বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডের নাম আজ ক'টা লোকে জানে! মনে পড়ে দুঃখবাদী কবির সেই চিরন্তন আক্ষেপবাণী—"The world does not know its greatest men."

এক অতি দরিদ্র মারাঠী ব্রাহ্মণ পরিবারে বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হ'তেই এঁর সঙ্গীতানুরাগ প্রকাশ পায়। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্রাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর থেকে বালক ভাতখণ্ডে একাদিক্রমে সাত আট বৎসর ওস্তাদের কাছে নিয়মিত-ভাবে সেতার শিক্ষা করেন। অসামান্য ধীশক্তি স্বরজ্ঞান ও অধ্যবসায় গুণে সাত আট বৎসরের মধ্যেই আমাদের সঙ্গীতের অনেক সূক্ষ্মতম গঠন-পদ্ধতি (technique) আয়ত্ত করেন। কিন্তু শিক্ষার আগ্রহ তাতে এঁর আরও বর্দ্ধিত হয়। ফলে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁরা কয়জন

সঙ্গীতোৎসাহী একটি ক্লাব গঠন করেন—যার নাম দেওয়া হয় "গায়ন-উত্তেজক-মণ্ডলী।" এ মণ্ডলীর সভ্যগণের চাঁদার টাকায় যুবক ভাতখণ্ডে অগ্রণী হ'য়ে বম্বেতে গায়ক বাদকদের আসরের উদ্‌যোগ করতেন। এবার আমাকে একদিন ব'লেছিলেন:—"কখনও কোনও বড় ওস্তাদ বম্বেতে এলে তাঁকে আমাদের ক্লাবে গান না গাইয়ে নিয়ে আমরা ছাড়তাম না।" "গায়ন-উত্তেজক-মণ্ডলী"তে জয়পুরের বিখ্যাত গায়ক ৺মহম্মদ আলী খাঁ, তৎপুত্র আশফ আলী খাঁ, * ধ্রুপদী বেলবাগকর, বিলায়ত হুসেন, আলি হোসেন, হায়দর খাঁ, † তানরাজ খাঁ, মৌলাবক্স, ফৈজমহম্মদ খাঁ ‡ প্রমুখ মহামহারথী আস্‌তেন। আজকাল সঙ্গীত রসিকেরা অবশ্য এ সব নাম শুনে সবিস্ময়ে স্তম্ভিত ছাড়া আর কিছু হ'তে পারবেন না, যেহেতু এঁদের শুধু নাম ও তারিফ ছাড়া অন্য কিছুই আমাদের শোনার সৌভাগ্য কখনও হয় নি। তবে তা সত্ত্বেও এ সব নামের তালিকা দেওয়ার একটা সার্থকতা আছে ও সেটা এই যে পণ্ডিত ভাতখণ্ডের যৌবন আবাল্য যে প্রথম শ্রেণীর গুণীদের গানবাজনার আবহাওয়ায়ই বিকশিত হ'য়ে উঠে-ছিল এ তালিকা অন্ততঃ সেটা সপ্রমাণ করে—বিশেষতঃ যখন আগেকার যুগে গায়কবাদকদের মধ্যে প্রকৃত শিল্পী আজকালকার মতন বিরল ছিল না।

"মণ্ডলী"র নিয়মিত অধিবেশন চল্‌তে লাগ্‌ল। এদিকে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে অতিকষ্টে ছাত্র পড়িয়ে কোনও রকমে অন্নসংস্থান ক'রে বি-এ, বি-এল পাশ কর্‌লেন। কিন্তু পাশ ক'রেই বম্বেতে হাইকোর্টে প্রবেশ করা

---

* এঁরা বিখ্যাত খেয়াল রচয়িতা মনরঙ্গের বংশের গায়ক। সদারঙ্গ, আধারঙ্গ ও ও মনরঙ্গ খেয়ালের রচয়িতা হিসাবে প্রসিদ্ধ।

† বৈরম খাঁর বংশ।

‡ বিখ্যাত ভাস্কর রাওয়ের গুরু।

ব্যয়সাধ্য হওয়ার দরুণ তিনি করাচিতে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে পসারের জন্য যেতে বাধ্য হ'ন। এই সময়ে বম্বের একজন বড় সরকারী উকীল শান্তারাম নারায়ণ তাঁর নিজের পৃষ্ঠপোষকতায় পণ্ডিত ভাতখণ্ডেকে বম্বেতে পুনরায় ডেকে আনেন। কিন্তু দরিদ্র পণ্ডিতের দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে বম্বেতে আস্‌তে না আস্‌তে দুমাসের মধ্যে শান্তারাম মৃত্যু মুখে পতিত হন। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যুবক এবার স্থির করলেন যে বম্বেতে যখন এসেই পড়েছেন তখন সাহায্যদাতার অভাবসত্ত্বেও সেখানেই প্র্যাক্‌টিস্‌ করেন। অতিকষ্টে কোনও রকম ক'রে গ্রাসাচ্ছাদন সংস্থান করতে না করতে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র সন্তান একটি কন্যা অজানার উদ্দেশে যাত্রা করেন। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে দারিদ্র্যের উপর এ বিপদে প্রথমটায় মুহ্যমান হ'য়ে পড়লেও এ পরীক্ষায় শেষে তাঁর মনুষ্যত্বই জয়ী হ'ল। তিনি স্থির করলেন যে যখন সংসারে তাঁর এক ভাই ছাড়া আর কেউ রইল না, তখন আর দশবৎসর মাত্র প্র্যাক্‌টিস ক'রে ভ্রাতার ও নিজের জন্য যৎকিঞ্চিৎ সংস্থান ক'রে ঠিক্‌ পঞ্চাশোর্দ্ধে অর্থকরী বিদ্যার চেষ্টা পরিত্যাগ ক'রে বাকী জীবন সঙ্গীত-চর্চ্চায় নিয়োজিত করবেন। অবশ্য প্র্যাক্‌টিসের সময়েও তিনি "গায়ন-উত্তেজক-মণ্ডলী"কে কখনও অবহেলা করেন নি ও বড় বড় গায়ক বাদক এলে তাদের কাছে নানা প্রশ্ন উত্থাপিত করতেন ও সে সব প্রশ্নোত্তর মালা বিস্তারিত ভাবে দিনপঞ্জিকায় লিখে রাখতেন। পরে তাঁর সুবৃহৎ "হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি" নামক অসামান্য গবেষণাপূর্ণ পুস্তকে এ সব প্রশ্নোত্তর তিনি গুরুশিষ্যসংবাদরূপে প্রকাশ করেন। এই পুস্তকখানি পণ্ডিত ভাতখণ্ডের গভীর সঙ্গীতপাণ্ডিত্য ও দুর্দ্দম্য জ্ঞানানুসন্ধিৎসার স্তম্ভ স্বরূপ বিরাজ করবে—ভবিষ্যৎ সঙ্গীতানুরাগীদের চোখের সাম্‌নে জ্ঞানীর আদর্শ উজ্জ্বল ক'রে তুলে ধ'রতে।

কিন্তু এ পুস্তকখানি তিনখণ্ডে প্রকাশ করেন তিনি ১৯১০ হ'তে

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। তাঁকে অনেকে বহুপূর্ব্বেই এ সব আলোচনা প্রকাশ করতে ব'লেছিল; কিন্তু পণ্ডিত ভাতখণ্ডে তাদের বলতেন যে পুস্তক প্রকাশ করবার আগে একবার তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ পর্য্যটন ক'রে সব বড় বড় সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করতে চান। পরে এ সব আলোচনাও তিনি তাঁর "হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতি"তে সন্নিবিষ্ট করেন।

এতদর্থে তিনি ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বৎসরাধিক কাল এক শাস্ত্রী নিযুক্ত ক'রে সঙ্গীত শাস্ত্রগুলি অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়ন শেষ হ'লে তিনি ভারতভ্রমণে বাহির হ'ন—নিজের প্র্যাকটিসের প্রতি ভ্রূক্ষেপও না ক'রে। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর কর্ণাটী সঙ্গীতকার ভেঙ্কটমখীর "চতুর্দ্দণ্ডী প্রবেশিকা"র পাণ্ডুলিপি তাঁর হস্তগত হয়। তাতে ভেঙ্কটমখী এক স্থলে লিখেছেন যে সপ্তকে ১২টি পর্দ্দার বিন্যাসে সর্ব্বশুদ্ধ যে ৭২টি মাত্র ঠাটের (বা মেলকর্ত্তা) বিন্যাস তিনি নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিলেন—স্বয়ং ব্রহ্মাও তার চেয়ে একটি বেশি ঠাট উদ্ভাবন করতে পারবেন না। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে আমাকে হেসে ব'লেছিলেন—"আমার মনে আছে, রায় মহাশয়, যে প্রথম যেদিন এরূপ একটা পদ্ধতির অস্তিত্বের কথা 'চতুর্দ্দণ্ডী প্রবেশিকা'য় পড়লাম সেদিন হতে তিন রাত্রি আমার ভাল ঘুম হয় নি। আমার কেবলই মনে হ'তে লাগল যে দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত এ অপূর্ব্ব বিধিবদ্ধ সঙ্গীতের সম্বন্ধে সে অঞ্চলের সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গে আলাপ করতেই হবে।"

কি জ্ঞানের উৎসাহ! কি সুন্দর হৃদয়ের তারুণ্য যে, যে সামান্য খবরে শতকরা নিরানব্বই জন লোকে রোমাঞ্চিত হওয়া দূরে থাক ভ্রূক্ষেপও করত না সে খবরের মধ্যে একটা গভীর সামঞ্জস্যের পূর্ব্বভাষ এ নিঃসঙ্গ ব্রাহ্মণের নিদ্রাটুকুও হরণ ক'রে নিল। মনে পড়ে বিখ্যাত **Stevenson**-এর কোন্ এক পবিত্র মুহূর্ত্তে কেট্‌লির ঢাকার নৃত্য দেখে বাষ্পের তত্ত্ব পর্য্যালোচনায় আত্মহারা হওয়ার কথা, ও **Newton** এর আপেল পড়ার

দৃশ্য দেখে মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব নিয়ে গভীর আলোচনায় রত হওয়ার বিশ্ববিখ্যাত কাহিনী। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, -এই-ই মহত্ত্বের কষ্টিপাথর।' একজন বড় ফরাসী লেখক বলেছেন বীরত্বের অফুরন্ত প্রেরণায় ত বহির্জগৎ ওতঃপ্রোত ; কেবল সে প্রেরণা গ্রহণ করতে জানা চাই (Maeterlinck)। সত্য কথা। কবিই **finds tongues in trees and books in running brooks.** অকবি মেঘকে মেঘই দেখে, কালো চুলের রাশি দূরে থাকুক একগাছিও তার মধ্যে দেখতে পায় না। নিউটন নিউটন ছিলেন ব'লেই আপেলটি পড়বামাত্র সেটিকে উদরসাৎ না করে তার মধ্যে সৃষ্টির নিয়মশৃঙ্খলা খুঁজেছিলেন। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে ওস্তাদ বকায়তুল্লা খাঁ মাত্র ছিলেন না ব'লেই চতুর্দ্দণ্ডী-প্রবেশিকা হ'তে প্রথম সঙ্গীত পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করার মহৎ প্রেরণা পান। আমাদের উচ্চ সঙ্গীতের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব শৃঙ্খলাবদ্ধ বিধিনিয়ম আপনা হতেই বিকাশ পেয়েছে এটা তাঁর সজাগ প্রতিভা ও অনুভূতির অন্তর্দৃষ্টি সেদিন ধরতে পেরেছিল বলেই তিনি আজ ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গীতধারাবদ্ধকারী বলে গণ্য হয়েছেন। *

এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণে বাহির হ'ন ও মান্দ্রাজ, তাঞ্জোর, রামনাথ, রামেশ্বর, ত্রিচিনপল্লী, মহীশূর, বাঙ্গালোর প্রভৃতি নানা স্থলে দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিতদের সঙ্গে আলাপ করেন। সে সব আলাপের তিনি ডায়ারি বরাবর রেখে এসেছেন—এতই তাঁর জ্বলন্ত উৎসাহ ছিল !

---

* কর্ণাটী সঙ্গীত অভিজ্ঞমাত্রেই জানেন যে কর্ণাটী গায়কগণ আজও এই ৭২টি ঠাট বা মেলকর্ত্তা বিশুদ্ধভাবে তাঁদের রাগাদিতে গেয়ে দেখিয়ে থাকেন। উত্তর ভারতের সঙ্গীতে রাগাদি সম্বন্ধে এরূপ সুসম্বদ্ধ পদ্ধতিতে ঠাট নির্দ্দিষ্টও হয় নি—বা এ বিষয়ে মতৈক্যও পাওয়া যায় না। এ বিষয়েও পণ্ডিত ভাতখণ্ডেই প্রথম রাগাদি মূলতঃ দশটি মূল ঠাটে ভাগ ক'রে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতকে ধারাবদ্ধ করতে চেষ্টা পেয়েছেন।

এই সময়ে তিনি বঙ্গদেশের একমাত্র সঙ্গীতগ্রথক ও গবেষক গীতসূত্রসার, সেতারশিক্ষা প্রভৃতি প্রণেতা মনীষী ৺কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লেখার সঙ্গে সংস্পর্শে আসেন। তাঁর "গীত সূত্রসার" পড়বার পণ্ডিতজীর এতই উৎসাহ হ'য়েছিল যে তিনি হাইকোর্টে এক বাঙালী কেরাণীর কাছে প্রতিদিন অবসর মত এক ঘণ্টা করে বাংলা পড়তে আরম্ভ করেন। শুধু তাই নয় এই রূপে বাংলা শেখার পর তিনি সমগ্র "গীতসূত্রসার" মারাঠী ভাষায় অনুবাদ ক'রে প্রকাশ করেন। পণ্ডিতজী এখনও কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়েব গুণাবলী, পাণ্ডিত্য ও সৌজন্যের কথা বল্‌তে বল্‌তে উৎসাহে প্রদীপ্ত হ'য়ে ওঠেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁকে কত পত্র লিখেছিলেন ও তাতে কত জ্ঞানগর্ভ কথার আলোচনা করেছিলেন সে সবের অনেক তথ্য তিনি তাঁর হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে নিবদ্ধ করেছেন।

৺কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুস্তকাদি হতেই পণ্ডিতজী প্রথম ৺রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীত পুস্তকাদি প্রকাশ করার কথা অবগত হ'ন ও তৎক্ষণাৎ সে বইগুলি আনিয়ে পাঠ শেষ করেন। তৎপরে তিনি স্থির করেন যে, এরূপ সঙ্গীতোৎসাহী রাজার সঙ্গে দেখা করতেই হবে ও বাংলাদেশের গায়কদের সঙ্গেও দেখা করা দরকার। তাছাড়া ইতিমধ্যে পণ্ডিতজী বেলবাগকর, বিলায়ত হুসেন, আলি হুসেন, মহম্মদ আলি খাঁ, আশফ আলি, হায়দর খাঁ প্রভৃতির কাছ থেকে হাজার বারশ ধ্রুপদ ও খেয়াল স্বরলিপি ক'রে শিখে নিয়েছিলেন ব'লে এখন গানের পুঁজিও তাঁর যথেষ্ট স্ফীত হ'য়ে উঠেছিল। তাই এখন তিনি স্থির করেন যে, অন্যান্য দেশের গায়কদের সঙ্গেও গিয়ে দেখা-সাক্ষাৎ ও আলোচনা করবেন।

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে দ্বিতীয়বার ভারত পর্য্যটনে বাহির হ'ন ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে। তিনি প্রথমে নাগপুর হ'য়ে কলিকাতা যান। কলিকাতায়

৺রাজা সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুরকে তিনি দেখিয়ে দেন যে, অনেক রাগের ঠাট সম্বন্ধে তিনি সংস্কৃত গ্রন্থাদি হ'তে ভুল উদ্ধৃত ক'রেছেন।

বাংলা দেশের গায়কদের মধ্যে পণ্ডিতজী ৺অঘোরনাথ চক্রবর্ত্তী ও ৺রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয়ের অত্যন্ত অনুরাগী। এঁদের দুজনের কথা বল্‌তে বল্‌তে পণ্ডিতজীর উৎসাহ ভারি হৃদয়স্পর্শী হ'য়ে ওঠে। এবারেও তিনি আমার কাছে কত দুঃখ করছিলেন যে, ৺রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর কাছ থেকে অনেকগুলি ধ্রুপদ সংগ্রহ ক'রে প্রকাশ করার ইচ্ছা তাঁর পূর্ণ হ'ল না। বিনয়ী পণ্ডিতজী বল্‌ছিলেন, গোঁসাইজী তাঁকে দয়া করে অনেক গুলি ধ্রুপদ শেখাবেন ব'লে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, তিনি কত আশা ক'রেছিলেন অগাধ পাণ্ডিত্যশালী গোঁসাইজীর কাছ থেকে নানা রত্ন আহরণ করবেন, এরূপ শিক্ষা দিতে উৎসাহী ওস্তাদ আজকাল কত বিরল ইত্যাদি।

কলিকাতায় তাঁর ৺বিশ্বনাথ রাওয়ের সঙ্গে দেখা হয়। রাওসাহেব তাঁকে বলেন যে, এলাহাবাদে তাঁর গুরু প্রিতমলাল গোস্বামীকে দেখলে পণ্ডিতজীর আক্কেল গুড়ুম হ'য়ে যাবে। এ আশঙ্কায় স্তম্ভিত হ'য়ে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে রাওসাহেব তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলেন যে গোস্বামী প্রভু রাগের কুণ্ডলী তৈয়ারী করে প্রশান্তভাবে তার ওপরে বসে থাকেন। ভাতখণ্ডে আমাকে হেসে বল্‌লেন :—"কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না বটে রায়মহাশয়, কিন্তু আমার কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। আমি এলাহাবাদ গেলাম শুধু এই কুণ্ডলীকর্ত্তার সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু গিয়ে যা দেখ্‌লাম, তাতে—"বল্‌তে বল্‌তে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ প্রাণখোলা হাসি হেসে বল্‌লেন :—"প্রিতমলাল গোস্বামী প্রভু প্রথমে নানারকম লম্বা লম্বা চাল দিতে আরম্ভ করার পর আমি বল্‌লাম যে কুণ্ডলীটি দেখতে চাই। তিনি একটি chart মতন আন্‌তেই আমি দেখ্‌লাম যে সেটি আর কিছুই নয় সৌরীন্দ্র মোহন

ঠাকুরের পুস্তক থেকে ছাঁকা রাগরাগিণীর নকল। গোস্বামীপ্রভু এ নক্সাটির গোলোক ধাঁধা দেখিয়ে ৺বিশ্বনাথ কেরামতুল্লা প্রমুখ তাঁর নিরক্ষর শিষ্য ও ভক্তবৃন্দকে এই ব'লে আতঙ্কে স্তম্ভিত ক'রে রাখ্‌তেন যে তিনি রাগরাগিণীর আদি জন্মতত্ত্ব বা 'কুণ্ডলীর' শীর্ষাধিরূঢ় হ'য়ে বিরাজমান।" ব'লে তিনি আবার হো হো করে হাস্‌তে লাগলেন। সে হাসি আর থামে না। শেষে আমি সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করলাম :—"তারপর" ? ভাতখণ্ডে বল্‌লেন ; "আমার হাতবাক্সে সংস্কৃত গ্রন্থাদি ও সৌরীন্দ্রমোহনের বইও ছিল। আমি সে সব বাহির ক'রে গোস্বামীকে দেখালাম যে তিনিও কুণ্ডলী কোথা হ'তে সংগ্রহ ক'রেছেন আমি অবাঙালী হয়েও সে খবর রাখি।" ব'লে আবার হাসি।—"তারপর ?"—"তারপর আর কি ? দেখলাম লোকটা কিছুই জানে না। ও শেষটা আমার সংস্কৃত গ্রন্থাদির ভিতর পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি দেখে ও রাগালোচনা শুনে নিজের ভণ্ডামির মুখোস ছেড়ে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন।" পণ্ডিত ভাতখণ্ডের আলোচনায় প্রায়ই এরূপ সরস পরিহাস বড় সুন্দর ভাবে মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। তবে তাঁর হাসির মধ্যে বিশুদ্ধ কৌতুকই প্রকট হয়ে ওঠে। ঈর্ষাদ্বেষের লেশমাত্রও থাকেনা ব'লে সে হাসি সকলের কাছেই এত মিষ্ট বোধ হয়। ষষ্টিবর্ষবয়স্ক ভাতখণ্ডের আজও বালকের ন্যায় বিমল ও প্রাণখোলা হাসি বোধ হয় যে একবার দেখেছে সে সহজে ভুলতে পারবে না।

এই সময়ে তিনি কাশীতে শোনেন যে বিকানীরে অনেক গুলি সংস্কৃত সঙ্গীত-গ্রন্থ আছে। শোন্‌বামাত্র এ উৎসাহী চিরতরুণ সঙ্গীতছাত্র ঠিক্ করেন যে বিকানীরে একবার তাঁকে যেতেই হবে। দিল্লীতে ওমরাও খাঁর গান শুনে, লক্ষ্ণৌয়ে কালকাবিন্দার সঙ্গে দেখা করে, মথুরায় গণেশিলাল চৌবের সঙ্গে তর্কালোচনা ক'রে তিনি বিকানীর লাইব্রেরীতে অনেকগুলি সংস্কৃত সঙ্গীতগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেন। সেখান থেকে

উদয়পুরে ৺জাকরুদ্দীন ও আল্লাবন্দে খাঁর সঙ্গে দেখা করে তাদের গান শুনে বম্বে ফেরেন।

ভারতবর্ষে এই ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতজী বিস্তর অপ্রকাশিত সংস্কৃত সঙ্গীত পাণ্ডুলিপিও সংগ্রহ করেন। এজন্য তাঁর কতবার যে কত শ্রমস্বীকার পরিভ্রমণ ও বৃথা প্রয়াস করতে হয়েছে সে সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লেখা এ প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তাই এবিষয়ে দুই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দিয়েই ক্ষান্ত হব। তিনি একবার দাক্ষিণাত্যে শোনেন যে সুদূর কাথিওয়াড়ে কোন এক রাজবাড়ীর পুরোহিতের কাছে একটি মূল্যবান সংস্কৃত সঙ্গীত-পাণ্ডুলিপি আছে। পণ্ডিতজী ছুটলেন সেই সুদূর দক্ষিণ থেকে পশ্চিম ভারতে। কিন্তু হায়, এত শ্রমের পর সে পুরোহিতপুঙ্গব বল্‌লেন যে, সে পাণ্ডুলিপি তিনি দেখাতে পারেন যদি পণ্ডিতজী সেটি প্রকাশ না করেন। পণ্ডিতজী বল্‌লেন :—"আমি সাধারণের লাভের জন্যইত প্রকাশ করি, সেই জন্যইত সংগ্রহ করে থাকি।" তাতে পুরোহিত প্রভু বল্‌লেন :—"তবে আমি সে পাণ্ডুলিপি দেব না।" পণ্ডিতজী শেষটা রাজাকে দিয়ে অনুরোধ করালেন। তখন পুরোহিত ভার্গব বল্‌লেন সেটা তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। অগত্যা পণ্ডিতজী রাজাকে পুরোহিতের নষ্টামির কথা খুলে বল্‌লেন, তখন রাজার তর্জ্জন গর্জ্জনে পুরোহিত প্রভু বইটি পণ্ডিতজীকে দিলেন কিন্তু এই সর্ত্তে যে তাঁর সপরিবারে কাশী যাওয়া আসার খরচ তাঁকে দিতে হবে। পণ্ডিতজী ১৫০৷২০০৲ খরচ করে তাঁকে সপরিবারে কাশী পাঠিয়ে তবে পাণ্ডুলিপিটি পান ও প্রকাশ করেন, যদিও সে পাণ্ডুলিপির বাজারদর কিছুই ছিল না।

আর একবার পণ্ডিতজী কচ্ছ দেশে এক শেখের কাছে একটি তথ্য পূর্ণ পাণ্ডুলিপির জন্য গিয়েছিলেন। কিন্তু শেখ প্রভু তাঁকে দূর থেকে দেখেই বইখানি দেখিয়ে ধূলোপায়ে বিদায় দিলেন, একবার বইটি ছুঁতেও দিলেন না, প্রকাশ করা ত দূরের কথা। পণ্ডিতজীকে বড় কমবার এরূপ

নিরাশ হতে হয়'নি। তবে তাতে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। আমার সামনে সেদিন পূর্ব্বোক্ত বেগম সাহেবা, পণ্ডিতজীকে বল্‌লেন যে সে শেখ তাঁর অনুরোধে পণ্ডিতজীকে সেই গ্রন্থটি দিতে রাজি হয়েছে। তাতে পণ্ডিতজী উৎসাহিত হ'য়ে বল্‌লেন :—"বটে ? তবে একদিন আপনার সঙ্গে আবার একবার শেখজীর ওখানে যাওয়া যাবে, কি বলেন ?" এমনিই নিরভিমান, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু এই বৃদ্ধ মারাঠী ব্রাহ্মণ।

আর একবার ইনি বরোদার মহারাণীর সঙ্গে জম্মু (কাশ্মীর) নগরের লাইব্রেরীতে "রাগদর্পণ" নামক একটি গ্রন্থের সন্ধানে গিয়াছিলেন। কিন্তু বইটি পারস্য ভাষায় লিখিত হওয়ার দরুণ পণ্ডিতজীকে নিরাশ হয়ে ফিরে আসতে হয়। আমাকে সেদিন এখানে (বম্বেতে) কথাচ্ছলে বলছিলেন যে তিনি লক্ষ্ণৌয়ের ঠাকুর নবাবালিকে লিখেছেন, সে বই খানি কোনও পারস্য ভাষাভিজ্ঞ লোককে দিয়ে হিন্দীতে অনুবাদ করাতে।

লুপ্ত সংস্কৃত গ্রন্থাদি হ'তে প্রাচীন হিন্দু-সঙ্গীতের সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান্ তথ্য সংগ্রহ করা যাবে ব'লে পণ্ডিত ভাতখণ্ডের এ বিষয়ে উৎসাহের সীমা নেই। কাজেই সমগ্র ভারতভ্রমণ ও নানা স্থানের নানা শাস্ত্রীর সঙ্গে আলোচনাদি ক'রে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর তিনি স্থির করেন, এবার অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিগুলি প্রকাশ করার সময় হ'য়েছে।

এতদর্থে তিনি প্রথমে প্রায় ১৫০।২০০ গানের সম্বন্ধে শ্লোক লিখে "লক্ষ সঙ্গীত" ব'লে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা ক'রে ১৯১০ সালে প্রকাশ করেন। শ্লোকগুলিতে তিনি প্রতি রাগের ঠাট, বাদী, আরোহ, অবরোহ প্রভৃতি লক্ষণ সংক্ষেপে নির্ণীত ক'রে দেন। পরে নানা স্বরলিপি পুস্তকে প্রতি রাগের সূচনায় যথাক্রমে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত করেন। ঐ বৎসরে তিনি মারাঠী ভাষায় তাঁর অক্ষয় কীর্ত্তি "হিন্দুস্থানী-সঙ্গীত-পদ্ধতি ১ম ভাগ" (৪০০ পৃষ্ঠার উপর) প্রকাশ করেন। এই বইখানিতে পণ্ডিতজী তাঁর

অগাধ জ্ঞান গুরুশিষ্য-সংবাদ ধারায় প্রকাশ ক'রেছেন। তা'তে সব জানিত সঙ্গীত ও রচয়িতারই নামোল্লেখ ও তাঁদের যথাযথ বিচার আছে। এ বইখানি জয়পুরের এক পণ্ডিত হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করছেন। কোনও বাঙালী বাংলা ভাষায় অনুবাদ করলে তা'তে বাংলা সঙ্গীতশিক্ষার্থীর মহা উপকার হবে। কেন না, এ বইখানি শিক্ষার্থী ও জ্ঞানান্বেষী উভয়েরই জন্য লেখা ও নানা দুর্ব্বোধ্য বিষয়ই শিক্ষার্থীর মুখে প্রশ্ন হিসাবে দেওয়া হ'য়েছে। তাছাড়া ঐ বৎসরে পণ্ডিতজী "স্বরমেলকলানিধি" নামক একখানি সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করেন।

১৯১১ সালে পণ্ডিতজী "সঙ্গীতসারোদ্ধার," "অষ্টোত্তরশততাললক্ষণম্" ও "রাগকল্পদ্রুমাঙ্কুর" নামক তিনটী সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৯১২ সালে "সদ্রাগচন্দ্রোদয়" ও "সঙ্গীতপারিজাত প্রবেশিকা" প্রকাশ করেন। ১৯১৪ সালে "অভিনব তালমঞ্জরী," "চত্বারিংশৎরাগ-নিরূপণম্," "লক্ষণ-গীতসংগ্রহ" ও "হিন্দুস্থানী সঙ্গীতপদ্ধতি ২য় ও ৩য় ভাগ" প্রকাশ করেন। "লক্ষণগীত সংগ্রহে" পণ্ডিত ভাতখণ্ডে স্বয়ং প্রায় দুই শত লক্ষণগীত প্রকাশ করেন। * ১৯১৭ সালে "সঙ্গীতসুধাকর", ১৯১৮য় "সুগমরাগমালা", "রাগতরঙ্গিনী", "চতুর্দ্দণ্ডীপ্রবেশিকা" ও "হৃদয়কৌতুকপ্রকাশ" প্রকাশিত হয়। ১৯২১ সালে "অভিনবরাগমঞ্জরী" ও "অনুপসঙ্গীতবিলাস" প্রকাশিত হয়। তা' ছাড়া বম্বেতে "গীতমালিকা" নামক একটি ত্রৈমাসিকীতে পণ্ডিতজী পাঁচ বৎসরে প্রায় একশত গানের স্বরলিপি প্রকাশ করেন।

---

* লক্ষণগীতগুলি রাগনির্ণয়ার্থক কথাসম্বলিত গান। অর্থাৎ প্রতি রাগের লক্ষণ-গীতের কথা হচ্ছে সেই রাগের আরোহ অবরোহ বাদী সম্বাদীর বর্ণনা। কাজেই একটি লক্ষণগীত শিখলে শুধু সে রাগটি শেখা হয় না রাগটির বিস্তার সম্বন্ধে অনেক তথ্যই সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ ক'রে রাখা হয়। যেমন "গাও বাগেসরী মৃদু লগত সুর গ নি কর হর প্রিয়া ঠাট তীবর করত ধ রি।

অতঃপর তিনি গোয়ালিয়র স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন যে স্কুলটি সম্বন্ধে আগেই লিখেছি। সে স্কুলের ছাত্রেরা বাস্তবিকই চমৎকার গাইতে পারে এবং সে জন্য পণ্ডিতজীর নিজের পদ্ধতিই দায়ী। পণ্ডিতজী নিজে গোয়ালিয়রেরই জনকয়েক রাজকর্ম্মচারীদের শিক্ষা দিয়ে সিন্ধিয়ার রাজ অর্থে তাঁর বিখ্যাত গোয়ালিয়র স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। আজ সমগ্র ভারতবর্ষে এ স্কুল অদ্বিতীয় এবং এ স্কুলের পাঁচ বৎসর অধীত ছাত্রগণ প্রত্যেকে প্রায় পাঁচ শত ধ্রুপদ খেয়াল শিক্ষা ক'রে থাকে। লক্ষ্ণৌয়ে ১৯২৪ ও ১৯২৬ সালে নিখিল-ভারত-সঙ্গীত-সম্মেলনে এই স্কুলের কয়েকজন ছাত্র অতি বিশুদ্ধ তানমানলয়ে গান করেছিল। মহারাজ সিন্ধিয়া এ স্কুলের জন্য পণ্ডিতজীকে ৬০০৲ টাকা মাসিক বেতনে গোয়ালিয়রের স্কুলের প্রিন্সিপাল হ'তে অনুরোধ করেন। তা'তে পণ্ডিতজী হেসে বলেন ঃ—"মহারাজ, আমি অর্থের জন্য এ কাজ করিনি। তাই বেতন আমি নিতে পারি না। তবে আমি প্রতিশ্রুত হচ্ছি যে বৎসরে তিন চারবার আমি বম্বে থেকে গোয়ালিয়রে এসে স্কুলের কার্য্য পরিদর্শন ক'রে যাব—কেবল তজ্জন্য আমাকে যেন ট্রেণভাড়াটি দেওয়া হয়, কারণ আমি দরিদ্র।" সে প্রতিশ্রুতি তিনি অদ্যাবধি রেখে এসেছেন।

এরূপ লোক যে কোনও দেশের গৌরব! মহারাষ্ট্রে অন্ততঃ ব্যক্তিগত মহত্ত্বের দিক্ দিয়ে পণ্ডিত ভাতখণ্ডেকে ত কারুর চেয়েই কম মনে করা যায় না—গবেষক ব'লে নয়, মানুষ ব'লে। এ খাঁটি মানুষটির আত্মমর্য্যাদা ও নিঃস্বার্থতার তেজোগর্ভ বাণী শুন্‌লে জগদ্‌বিখ্যাত জার্ম্মাণ সঙ্গীত রচয়িতা **Beethoven**এর অনুপম গর্ব্ববাণী মনে পড়ে। তিনি কবি Goetheকে ব'লেছিলেন ঃ—"রাজা মহারাজার কাছে তুমি মাথা হেঁট কর্‌লে কি ব'লে? যখন তুমি ও আমি একত্রে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলি, রাজারাজড়ারই বরং বোঝা উচিত কারা চলেছে! তারা কি কর্‌তে

পারে? পুরস্কার, অর্থ, জায়গীর, রাজসম্মান প্রভৃতি দিতে পারে—কিন্তু মনুষ্যত্ব দিতে ত পারে না।" *

গোয়ালিয়র স্কুলের জন্য পণ্ডিতজীকে বড় কম পরিশ্রম করতে হয়নি। শুধু শিক্ষকদের গড়ে তোলা নয় ও ক্লাসে ব্যাখ্যা করতে হয় কি ক'রে রোজ নিজে লেকচার দিয়ে শেখানো নয়, এ জন্য তাঁকে "ক্রমিক স্বরলিপি পুস্তক" রচনা কর্‌তে হ'য়েছিল। ১৯২১ থেকে ১৯২৩ সালের মধ্যে পণ্ডিতজী তাঁর অন্যতম কীর্ত্তি চার ভাগ "হিন্দুস্থানী ক্রমিক পদ্ধতি" প্রকাশ করেন। এই চারভাগে তিনি অন্যূন তিন শত ধ্রুপদ খেয়াল প্রকাশ করেন। সে সব গানগুলির অধিকাংশই পুরানো বনিয়াদি ঘরের গান। তা ছাড়া প্রতি রাগের প্রথমেই তার রূপ, আরোহ অবরোহ, বাদী, পকড় প্রভৃতি নির্ণীত ক'রে দেওয়া হ'য়েছে। তাছাড়া প্রতি রাগে দুই একটী ক'রে লক্ষণগীতের স্বরলিপি দেওয়া হ'য়েছে। সর্ব্বোপরি এ স্বরলিপি খুবই সহজ। পণ্ডিতজী আমাকে দেখালেন যে এ পদ্ধতি তিনি প্রায় হুবহু "সঙ্গীত-রত্নাকর" থেকে গ্রহণ ক'রেছেন। সব রকম স্বরলিপির পদ্ধতির মধ্যে বোধ হয় পণ্ডিতজীর স্বরলিপিই শ্রেষ্ঠ। পণ্ডিতজীর ক্রমিক পদ্ধতির ৩য় ভাগ পুনর্মুদ্রিত হচ্ছে ও তা'তে আরও শতাধিক নূতন গান সন্নিবিষ্ট হ'য়েছে। তা' ছাড়া তাঁর পঞ্চম ভাগে প্রায় আরও তিন শত গানের স্বরলিপি প্রকাশ হ'বে। আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানি গানগুলির ঢং কি উচ্চ অঙ্গের ও এতে ভবিষ্যতে আমাদের দেশের শিক্ষার্থীর কি উপকার হবে। প্রত্যেক সঙ্গীতশিক্ষার্থীর (শুধু শিক্ষার্থীর নয়, প্রতি সঙ্গীত অধ্যাপকের) এ চার ভাগ স্বরলিপি কাছে রাখা উচিত।

মুসলমান ওস্তাদগণ প্রায়ই পণ্ডিত ভাতখণ্ডের স্বরলিপি পুস্তকের দ্রুত প্রচারে ঈর্ষান্বিত ও ত্রস্ত হ'য়ে তাঁর স্বরলিপিকে নিন্দা ক'রে থাকেন।

* রোমাঁ রোলাঁ প্রণীত **Beethoven**এর জীবনী।

তাঁরা বলেন যে স্বরলিপি দেখে শিক্ষার্থীর উচ্চ সঙ্গীত শেখা অসম্ভব। কথাটা সত্য। কিন্তু স্বরলিপির মূল উদ্দেশ্যই এঁরা ভুল বোঝেন বা বোঝাবার চেষ্টা করেন। কারণ স্বরলিপি সম্পূর্ণ অশিক্ষিত শিক্ষার্থীর গুরুপদে উপস্থাপিত হ'তে পারে না, স্বরলিপি এক কমবেশি গীতাভিজ্ঞ ছাত্রের পক্ষেই অমূল্য সাহায্যকারী হ'তে পারে। এই কথাটা না বুঝেই স্বরলিপি বিরাগী অনর্থক উষ্মা প্রকাশ ক'রে থাকেন। তবে স্বরলিপির উপকারিতা সম্বন্ধে পরে একটী প্রবন্ধে বিস্তারিতভাবে লেখার ইচ্ছা আছে ব'লে আপাততঃ এই মাত্র ব'লেই ক্ষান্ত হওয়া যাক যে আমাদের সঙ্গীতে স্বরলিপির উপকারিতা য়ুরোপীয় সঙ্গীতের অনুরূপ হবার সম্ভাবনা না থাক্‌লেও গানশিক্ষার পদ্ধতির জন্যও বটে, ও শিক্ষিত গায়কের স্মৃতিশক্তির সাহায্যার্থেও বটে,—সঙ্গীতে স্বরলিপির একটা মস্ত স্থান আছে। † তবে কেন সে স্থানকে খুব বড় ক'রে দেখা উচিত নয়, সে সম্বন্ধে পরে লেখার ইচ্ছে রইল।

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে ১৯১২ সালে **Philharmonic Society** প্রতিষ্ঠা করেন ও ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে লেখক **Mr. Clements**কে সভাপতি করেন। তার পর নানা কারণে **Mr. Clements** পণ্ডিত ভাতখণ্ডের শত্রুতাচরণ করতে আরম্ভ করেন। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে কি উপায়ে বরোদায় ১৯১৬ সালে প্রথম নিখিলভারতসঙ্গীতসম্মেলন আহূত ক'রে উদয়পুরের সভাগায়ক বিখ্যাত ৺জাকরুদ্দীন খাঁর সাহায্যে **Mr. Clements** এর মতামত খণ্ডন করেন সে সব বিবরণ বাহুল্যভয়ে লিখলাম না। ‡ কেবল এইটুকু মাত্র বলা দরকার মনে করি যে, **Mr.**

† আমাদের সঙ্গীতে স্বরলিপির সঙ্কেতবাহুল্য কি কি কারণে নিরর্থক সে সম্বন্ধে ১৯২৪ সালের বোধ হয় নভেম্বর কিম্বা ডিসেম্বর মাসের Modern Reviewএ শ্রীযুক্ত ফাডকের উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

‡ ১৯১৬ সালের বরোদা সম্মেলনের রিপোর্টে পূর্ণ কাহিনী দ্রষ্টব্য।

Clementsকে সে সভায় পণ্ডিত ভাতখণ্ডে পরাস্ত না কর্‌লে আজ সম্ভবতঃ তিনি সঙ্গীতানভিজ্ঞ ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নানা স্কুল কলেজে তাঁর অসার শ্রুতি হার্মোনিয়াম প্রচলিত কর্‌তেন। তাতে কৃতকার্য্য হ'লে যে **Mr. Clements** আমাদের উচ্চ সঙ্গীতের এক মহাক্ষতি সাধন কর্‌তেন এ বিষয়ে সুধীজনের মধ্যে মতভেদ নেই। সুতরাং এ জন্যও উচ্চ সঙ্গীতানুরাগীদের সকলেরই পণ্ডিতজীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা কর্ত্তব্য। তা' ছাড়া বর্ত্তমান সময়ে সেই থেকে নিখিল-ভারত সম্মেলন একা পণ্ডিতজীই আহ্বত ক'রে আস্‌ছেন। তিনিই আমাদের দেশে প্রথম সঙ্গীত সম্মেলনের পুরোহিত ও তার পরে দিল্লীতে, কাশীতে ও লক্ষ্ণৌয়ের সম্মেলনের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা।

পণ্ডিতজী আজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে যেরূপ অক্লান্তভাবে ভারতীয় সঙ্গীতের সেবা ক'রে এসেছেন, সেজন্য তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সত্যই ভাষা নেই। একথা যে অতিরঞ্জিত নয় তা' পণ্ডিত ভাতখণ্ডের সঙ্গীতে নানামুখী সেবার কাজের যিনিই খবর রাখেন তিনিই স্বীকার কর্‌বেন। সঙ্গীতের এই একনিষ্ঠ ভক্তটি যৌবনেই সঙ্কল্প ক'রেছিলেন যে ৫০ বৎসর বয়সে ওকালতী হ'তে যৎসামান্য কিছু সঞ্চয় করে নিয়ে অবশিষ্ট জীবন একাগ্রচিত্তে সঙ্গীত সাধনায় অতিবাহিত কর্‌বেন। জীবনের প্রভাতে অনেক আদর্শপন্থী যুবকই মহৎ সঙ্কল্প নিয়ে যাত্রারম্ভ ক'রে থাকেন বটে, কিন্তু জীবনসন্ধ্যায় সংসারের রূঢ় আঘাতে ও নিয়তির পরিহাসে সে আদর্শবাদ ও উচ্চ সঙ্কল্পের যে বড় অবশিষ্ট থাকে না—এটা বিয়োগবহুল মানুষের জীবনের পাতায় অন্যতম বিয়োগ-গাথা ব'লে মনে না ক'রেই পারা যায় না। একজন বড় লেখক ব'লেছেন বহু অপচয়, বহু ব্যর্থতা ও বহু জীবনের লক্ষ্যভ্রষ্ট উদ্‌ভ্রান্ত গতির মধ্যে একটা মহৎ জীবন পুষ্পিত ও বিকশিত হ'য়ে উঠ্‌বার সুযোগ পায়। পণ্ডিত ভাতখণ্ডের জীবন যে এরূপ

মহনীয় পরিণতিতে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠেছে, তিনি যে ৫০ বৎসর বয়সে অর্থাগম-চিন্তা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ ক'রে সঙ্গীতসাধনরূপ যৌবনের সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত ক'রে নিঃস্বার্থভাবে একটা মহৎ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে জীবনপথে চল্‌তে পেরেছেন এ বিরল নিষ্ঠার দৃশ্যের মতন মন-ভ'রে-ওঠা নীরব বীরত্বের দৃষ্টান্ত বোধ হয় সংসারে কমই মেলে। জীবনের শত সহস্র দৈনন্দিন প্রতিকূলতার আবর্ত্তের মধ্যে একনিষ্ঠতার পূজারী হ'য়ে চলা যে কি মহিমময় ব্যাপার, সেটা একটু ভেবে দেখ্‌লে মনটা বোধ হয় শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে নত না হ'য়েই পারে না!

প্রকৃত বীরত্ব তা-ই যা মানুষের জীবনের দুর্ব্বহ বিয়োগ ও গভীর নিরাশাকেও পরিশুদ্ধির আগুনে পরিণত ক'রে গ্রহণ কর্‌তে পারে। পণ্ডিত ভাতখণ্ডের জীবন এই বীরত্বের জ্যোতিতে যে কিরূপ উদ্ভাসিত তা' তাঁর জ্যোতির্ম্ময় বদনমণ্ডল, নিরপেক্ষ গুণগ্রাহিতা, নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা, অপূর্ব্ব আলোচনা-ক্ষমতা ও প্রশান্ত হাসি দেখ্‌লে এক মুহূর্ত্তেই প্রতীয়মান হয়। এখনও তিনি লুপ্তপ্রায় সঙ্গীতাদির স্বরলিপি প্রকাশার্থে জয়পুর, রামপুর, গোয়ালিয়র প্রভৃতি পর্য্যটন ক'রে বেড়ান, যেন এ অদ্ভুত বৃদ্ধের জীবনে বিশ্রামের কোনও দাবী-দাওয়াই নেই। এখনও ইনি বম্বেতে বিনা পারিশ্রমিকে দু'টী স্কুলে সঙ্গীত অধ্যাপনা করেন ও নানা স্থানে তাঁর অপূর্ব্ব, সরস ও জ্ঞানগর্ভ লেক্‌চার আদি দিয়ে বেড়ান। তাঁর জীবনে জলঝড় যথেষ্ট ব'য়ে গেছে কিন্তু প্রতি বিপদ-আপদকেই তিনি বড় সুন্দর ভাবে গ্রহণ ক'রে তার দ্বারা জীবনকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছেন। দু'একটি ছোট দৃষ্টান্ত দেই। তিনি আজকাল কাণে একটু কম শোনেন। সঙ্গীতানু-রাগীর পক্ষে এ দুঃখ যে কি তীব্র, তা' বোধ হয় সহজেই অনুমেয়। কিন্তু পণ্ডিতজী একদিন আমায় হেসে বল্‌লেন:—"এতে এখন আমার আর তত দুঃখ নেই। জীবনের শেষ অধ্যায়ে ত পৌঁছন গেছে, ব্রতও প্রায় সারা

হ'য়েছে। এখন যে কয়টা বৎসর বাঁচি তার জন্য যেটুকু শুন্‌তে পাই তাই যথেষ্ট। আর বৎসর কয়েক বাদে যখন প্রকৃতির কোনও পরিচিত মধুর ধ্বনিই শুন্‌তে পাব না—তখন আশা করি আমার বাকী কাজের হিসেব নিকেশও এক রকম শেষ হ'য়ে যাবে। তাই এতে আমার দুঃখ নেই।" আর একদিন আমায় বল্‌ছিলেন :—"লক্ষ্ণৌয়ের গভর্ণর লক্ষ্ণৌয়ে অবিলম্বে সঙ্গীতের কলেজ স্থাপন কর্‌তে চান। আমি সেখানে লিখেছি, এ কলেজ শীঘ্র প্রতিষ্ঠা করা বড় প্রয়োজন। কারণ তা' না হ'লে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা ও গঠনমূলক কার্য্যে সাধনক্ষমতা জন্মেছে সেটুকু আমি দেশের সেবায় নিয়োজিত ক'রে যেতে পার্‌ব না। তাই আমি চাই যে এ কাজ তাড়াতাড়ি সুরু হ'য়ে যাক্‌। আমি লিখে দিয়েছি যে তাহ'লে আমি ছয় মাস লক্ষ্ণৌয়ে গিয়ে থেকে কলেজের পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষাপদ্ধতি, কন্সার্ট দেওয়ার রীতি, ওস্তাদ সংগ্রহ, তা'দের শিক্ষকরূপে পরিণত করা প্রভৃতি নানা কাজের ভার গ্রহণ কর্‌তে পারি। কিন্তু দেরি হ'লে আমার বড় আক্ষেপ থেকে যাবে যে আমার জীবনব্যাপী চেষ্টা ও সাধনার অর্ঘ্য আমি দেশ-সেবায় সম্পূর্ণ নিয়োজিত কর্‌তে পার্‌ব না।" এ কথায় আমি ম্লান হ'য়ে পণ্ডিতজীর দীর্ঘজীবন কামনা কর্‌তেই তিনি প্রশান্তভাবে মাথা নেড়ে হেসে বল্‌লেন :—"না না রায় মহাশয়, আমার আর ক'দিন? আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। আমাদের দেশে ৬৫ বৎসর বয়স অবধি আমি বাঁচতে পেরেছি, আর কতদিন বাঁচব তোমরা আশা কর? আর বড় জোর দু'তিন বৎসর। তাই তার আগে আমার শেষ কাজটুকু ক'রে যেতে চাই।"

মনে পড়ে বিখ্যাত জ্ঞানযোগী ও কর্ম্মবীর হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের যৌবনে বিরাট কর্ম্মতালিকা-প্রকাশ ও শেষ-জীবনে শত দুঃখ-কষ্ট ও ব্যাধির মধ্যেও সে কর্ম্ম সাঙ্গ ক'রে সমুদ্রতীরে গিয়ে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে শেষ দিনের প্রতীক্ষা করা!

একটি সামান্য ঘর মাত্র সম্বল, পরিবার-পরিজনহীন, বন্ধুছাত্রগতপ্রাণ, অর্থপ্রত্যাখ্যানকারী, একাহারী, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণের এ প্রশান্ত বচনে ও মালাবার পাহাড়ের উদাসকরা অশ্রান্ত বারিধিকল্লোলের মৃদুমন্দ মারুত-হিল্লোলের বীজনে সেদিন মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে এই সুরটিই হাওয়ার সঙ্গে ঘুরে ফিরে কাণের কাছে [illegible]চ্ছিল ঃ—

"The world does not know its greatest men."

আবু-পাহাড়

বাংলার বাইরে এলেই রেলের দুধারে মাঝে মাঝেই পাহাড়ের ছোট ছোট ঢেউয়ের দৃশ্য মনকে একটা বড় সুন্দর তৃপ্তি দিয়ে থাকে। সমতল ভূমির মধ্যে বোধ হয় একটা একটানা একঘেয়ে ভাব থাকে, যেজন্য পাহাড়, পর্ব্বত, উপত্যকা চোখকে এত বেশি আরাম দেয়। রাজপুতানার দুধারের বালুময় সবুজ-বিরল প্রান্তরের হরিতের মুগ্ধকর আবেদনের অভাবের খানিকটা ক্ষতিপূরণ মেলে—স্থানে স্থানে এই পাহাড়ের দৃশ্যের মধ্যে। কিন্তু তবু যেন মনটা সম্পূর্ণ খুসি হয় না—কারণ এ সব পাহাড়কে পাহাড় আখ্যা না দিয়ে মৃত্তিকা-প্রস্তরের ঢেউ বলাই বোধ হয় বেশি সঙ্গত মনে হয়।

তাই মনটা একটা নিবিড় খুসিতে ভরে ওঠে, যখন গাড়ী সোজাতা রোড় ষ্টেশন ছাড়ার পর আবার পর্ব্বতমালার শ্রেণীবদ্ধ-তরঙ্গ রেলযাত্রীর চোখে পড়ে। তখন মনে হয় রাস্কিনের সেই কথা যে ভূমি যে মূহুর্ত্তে সমতলতাকে পরিহার করে, সে মুহূর্ত্তে সে এই উচ্চনীচতার ঢেউয়ের মধ্যে

কি যেন এক রহস্যের আভাষ ইঙ্গিত ক'রে বসে। আবু পাহাড়ে মোটরে করে উঠ্তে মনটা খুসির চরম সীমায় পৌঁছিতে না পারলেও—(দার্জ্জিলিং শিলং ভ্রমণের পর বোধ হয় এ সব পাহাড় তেমনভাবে মুগ্ধ করিতে পারে না)—ব'লে না উঠেই পারে না যে, ঠিক্ ঠিক্ এই-ই বুঝি মনটা এতদিন রাজপুতানার বালুধূসর শুষ্কহরিত রাজ্যে অনুক্ষণ খুঁজছিল। সেই পরিচিত আঁকাবাঁকা পার্ব্বত্য পথ ঘোরানো সোপানশ্রেণীর মতন পর্ব্বতের গা বেয়ে উঠেছে ; সেই স্থলে স্থলে যাত্রীর বিবর্দ্ধমান উচ্চতারোহণের বিশেষ একটা তৃপ্তি ; সেই পরপারের উগ্র পাহাড়ের ঢালুর সযত্নপুষ্ট সবুজের নীলাভ কিরণ বিকীরণ করার শোভা ; সেই মাঝে মাঝে দুই পাহাড়ের একান্ত মিলনের মধ্যে গভীর খাদের ভীষণ রমণীয়তার সমাবেশ ও সেই পিছনে ছেড়ে-আসা শুভ্র রাজপথের দ্রুত নিম্নগমনের শোভা ;—সবই মনকে এক পরিচিত উপলব্ধ তৃপ্তির সৌরভে শিহরিত ক'রে না তুলেই পারে না। কেবল আবু পাহাড়ের মধ্যে নেই সে দার্জ্জিলিং পথের বিরাট গাম্ভীর্য্য ; নেই সে ধবল-তুষারমৌলি যোগিরাজের ধ্যানস্তিমিত উন্নত যোগাসনের শোভা ও নেই সে পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর শুভ্রহাস্য ও রূপালি কলধ্বনি। তা ছাড়া এর মধ্যে নেই সে শিলঙ পথের ঘন বিটপিশ্রেণীর অভিরাম সবুজের নয়ন-মনোহর আবেদন ; নেই সে ক্ষণে ক্ষণে শীকরসিক্ত বায়ুর মধুর শিহরণ ; নেই সে পর্ব্বতমালার উচ্চতা ও নেই সে স্থানে স্থানে গোচারণের গ্রাম্য ও সুন্দর শোভা। তাছাড়া আবু পাহাড়ের সৌন্দর্য্যের মধ্যেও একটু শুষ্কতা বিরাজ করছে বলেই হোক্ বা যে কারণেই হোক্ সেখানে দার্জ্জিলিং মসুরি বা শিলঙ্ পর্ব্বতের চূড়ায় চূড়ায় শুভ্রধূসরপাংশু রঞ্জিত মেঘের সে নয়নাভিরাম লুকোচুরি খেলার দৃশ্য ক্ষণে ক্ষণে মনকে রাঙিয়ে তোলে না। তবু আবু-পাহাড় সুন্দর, তৃপ্তিদ ও উপভোগ্য—বিশেষতঃ রাজপুতানার বালুময় সহরগুলির পরে।

আবুপাহাড়ের শোভা সত্য সত্য সমৃদ্ধ হ'য়ে ওঠে প্রায় উপত্যকার কাছাকাছি এলে—অর্থাৎ যেখান থেকে পর্ব্বতাবিহারিগণ বাসস্থান প্রভৃতি নির্ম্মাণ আরম্ভ ক'রেছেন। আবু-পাহাড়ের উপত্যকার কাছাকাছি আস্‌তে আস্‌তে সুন্দর সুন্দর কয়েকটি বাংলো ফ্যাশনের বাড়ী নির্দ্দেশ ক'রে দেয় যে গন্তব্য স্থানে পৌঁছেছি ;—দার্জ্জিলিঙের মতন হঠাৎ এক স্মরণীয় শুভলগ্নে নানা রঙের সযত্নখচিত হর্ম্ম্যরাজির রঙের মেলা এক মুহূর্ত্তে উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে না।

পর্ব্বতপথে অনেকক্ষণ প্রকৃতি দেবীর বনানী শোভা দেখ্‌তে দেখতে বোধ হয় আমাদের মতন সহুরে লোক একটু উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে—তার মধ্যে মানুষের দানের কোনও চিহ্নই না পেয়ে। নদীর শোভা বোধ হয় এই মানুষী কীর্ত্তির সঙ্গে বেশি নিবিড়ভাবে জড়িত ব'লে তাকে আমরা বেশি আপনার ব'লে মনে করতে পারি। নদীকে যেন পাওয়া যায়—তার পাল তুলে উধাও হওয়া তরণীমালার দৃশ্যের মধ্যে, তার অশ্রান্ত কুলুকুলু-ধ্বনির মনোমদ সঙ্গীত-তরঙ্গের মধ্যে, তার মধ্যে নেমে অবগাহন স্নানের মধ্যে ; গা ভাসিয়ে দিয়ে স্রোতের টানে নিরুদ্দেশ-যাত্রী হওয়ার এক বিচিত্র বিস্ময়ারামের অনুভূতির মধ্যে ও সর্ব্বোপরি গতিশীলতার আহ্বানের মধ্যে।

পার্ব্বত্য শোভাকে কিন্তু মানুষ যেন কেমন পর-পর ভাবে। তার মধ্যে সম্ভ্রমের উপাদান যথেষ্ট আছে, কিন্তু আপনকরা সে উপাদান নেই—যা নদীর গতিভঙ্গী ও লহরীলীলার মধ্যে পাওয়া যায়। পার্ব্বত্যসৌন্দর্য্যের মধ্যে থাকে যেন একটা দূর গাম্ভীর্য্য, একটা আত্মসমাহিত ভাব, একটা মানুষী সভ্যতাকে তুচ্ছ করার প্রবণতা। নদীর মধ্যে থাকে এক সুললিত সুষমা, এক আপ্‌না-বিলোনোর রূপ, একটা মানুষের সভ্যতার সঙ্গে নিবিড়ভাবে গড়ে ওঠার পুলক-পরশ। সব প্রাচীন সভ্যতাই গ'ড়ে

উঠেছে নদীর আশপাশের উপত্যকায়—মানুষ পর্ব্বতের মধ্যে বাস করতে আরম্ভ করেছে অনেক পরে ও অনেক বংশের চেষ্টায় অভ্যস্ত হ'য়ে। মানুষ আবাল্য পর্ব্বত-রাজ্যের মধ্যে মানুষ না হ'লে পর্ব্বতকে সে ভাবে ভালবাসতে পারে না—যেমন কলনাদিনী, শস্যদাত্রী, নৃত্যশীলা, অশ্রান্ত-গতি ও ক্ষণে ক্ষণে নূতন-ছন্দ-উদ্ভাবিনী নদীর মোহিনী মূর্ত্তিকে পারে।

তাই গন্তব্য-স্থানে পৌঁছবার ঠিক্ অব্যবহিত পূর্ব্বে যখন পার্ব্বত্য যাত্রী সে গুরুগম্ভীর দূরত্বস্রষ্টার গায়েও মানুষের সৃষ্ট হর্ম্ম্যরাজি দেখ্‌তে পায়, তখন বোধ হয় সে অজ্ঞাতে এক পরম আরামের তৃপ্তির নিঃশ্বাস না ফেলেই পারে না। মনটা যেন আশ্বস্ত হয়ে গভীর খুসিতে ভরে ওঠে—যেমন বিদেশে বিভূঁয়ে একটা চেনা মুখ দেখা গেলে হয়। কয়েক বৎসর বিদেশে কাটিয়ে যখন কোনও প্রবাসী জন্মভূমিতে ফিরে আসে, তখন জন্মভূমির প্রতি পরিচিত রাজপথ, গাছপালাই তার মনে এক অননুভূতপূর্ব্ব আবেদন তোলে। পার্ব্বত্য পথে কয়েক ঘণ্টা সেই একই শ্রেণীর জনবিরল বনানীশোভা ও সমাহিত গাম্ভীর্য্য দেখার পর ছোট ছোট লাল, সাদা, হল্‌দে রঙের বাড়ীগুলি সেই শ্রেণীর তৃপ্তি দেয়। মনটা ব'লে ওঠে "আচ্ছা এতক্ষণে বোঝা গেল।"

আবুপাহাড়ে একটি সুন্দর প্রাকৃতিক হ্রদ আছে। হ্রদটির চারদিকে পাহাড়। হ্রদটি একটু দূর থেকে বড় সুন্দর নীল-আভা বিকীরণ করে। বেশ বড় হ্রদ। পরিভ্রমণ করতে ১৫।২০ মিনিট সময় লাগে ও তাতে ভারি একটা তৃপ্তি পাওয়া যায়, যে তৃপ্তি অনেকটা প্রতি কাজ সম্পূর্ণ করলে পাওয়া যায়। মানুষ একটা পথে বেড়াতে গিয়ে ঠিক্ সেই পথ দিয়েই ফিরে আস্‌তে চায় না। অন্য পথ দিয়ে ফিরে এলে একটা সুসম্পূর্ণতার ও সমাপ্তির তৃপ্তি যেন তাকে বেশি ক'রে আনন্দ না দিয়েই পারেনা।

আবুপাহাড়ে আর একটি স্থান আছে যেখান থেকে সূর্য্যাস্ত বড় সুন্দর

দেখা যায়। এখানে বস্‌বার দু তিনটি সিমেণ্টের বেদী আছে। রমণীয় দৃশ্য। অস্তগামী সূর্য্যের রঞ্জিত আভা যখন আশেপাশের পর্ব্বতমালার নানা ছন্দের ঢেউয়ের উপর এসে পড়ে, তখন সাম্‌নের প্রসারিত সমতল ভূমির সঙ্গে তুলনা ক'রে সে সূর্য্যাস্তরাগিণীর গিরিগাত্রে অনুরণন তোলার উদাত্ত ধ্বনি বড় মনোহর হ'য়ে ওঠে। পর্ব্বত থেকে হঠাৎ পদমূলে এক বিরাট ধূ-ধু-প্রসারিত সমতল ভূমির দৃশ্যের মধ্যে একটা বিচিত্র উপভোগ্য উপাদান আছে যার মূল বোধ হয় "I am the monarch of all I survey" রূপ মনোভাবটি। তা ছাড়া অবশ্য পার্ব্বত্য শোভা ও সমতল উপত্যকার সৌন্দর্য্য পাশাপাশি বিরাজ করারও একটা বিশেষ আবেদন না থেকেই পারে না। শিলঙ পাহাড়ে চেরাপুঞ্জী থেকে সিলেটের দৃশ্য বা হিমালয়ে কার্সিয়াং থেকে বাংলার দৃশ্য-উপভোগের মধ্যে অনেকটা এই রকমই রস মেলে।

আবু-পাহাড়ের বিখ্যাত জৈন-মন্দির—দিলওয়ারা। আমার এক ঐতহাসিক বন্ধু আমাকে আগ্রাতে প্রায়ই দিলওয়ারা মন্দিরের কথা বল্‌তে বল্‌তে রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠতেন। বাল্যকাল হ'তেই আবু-পাহাড়ের দিলওয়ারা মন্দিরের অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্যের কথা শুনে আস্‌ছি। তা'ছাড়া আমার ঐতিহাসিক স্থাপত্য-বিশেষজ্ঞ বন্ধুটি আমাকে বার বার বলেছিলেন যে হিন্দু-সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য শিল্পবিকাশ—এই দিলওয়ারার অচিন্তনীয় কলাকারু।

বহুদিনের সযত্নলালিত ও কল্পিত আগ্রহ নিয়ে জৈন-মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করা গেল। কিন্তু কারুকাজ খুব অদ্ভুত রকমের কঠিন হলেও প্রথম থেকেই সেই দাক্ষিণাত্যের কারুকার্য্য-স্তূপাকৃতির পুরাতন কাহিনী অকস্মাৎ এখানেও নয়নকে আঘাত না ক'রেই পার্‌ল না। কিন্তু…… কিন্তু……হাঁ আশ্চর্য্য হ'তে হ'ল বটে।

বিস্ময়কর বটে এ অমানুষী শ্রমশীলতার স্মৃতিস্তম্ভ! অপূর্ব্ব সংগ্রহ

বটে এ শুভ্র মর্ম্মরের শ্রেণীবদ্ধ স্তম্ভ, মর্ম্মরের হস্তী-বাজী, মর্ম্মরের অগণ্য নৃত্যশীলা দেবীমূর্ত্তি, মর্ম্মরের ঝাড়, মর্ম্মরের নানাবিধ কারুকাজ! দেখ্‌লে মনটা সম্ভ্রমে নুয়ে আসে বটে যে মানুষ এক সময়ে এ অবিশ্বাস্য পরিশ্রম করতে পার্‌ত—শিল্পকলায় সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির জন্য। কল্পনা সহসা পাঁচ ছয়শ বৎসরের অতীত জগতে বিচরণ করবার জন্য পাখা মেলে উড়তে চায় বটে! কোথা হ'তে রাশি রাশি শুভ্র মর্ম্মর এনে কোন্ এক বিগত যুগের মানুষ কেমন ক'রে যে এ মর্ম্মর স্থাপত্যে কারুকার্য্যের আগুন লাগিয়ে দিয়েছে সে কথা ভাব্‌তে নয়ন বিস্মিত শ্রদ্ধায় সজল হ'য়ে ওঠে বটে। কিন্তু তবু—কেন যেন মনটা অনুক্ষণ বল্‌তে থাকে 'নহে নহে নহে'। যেন এ জিনিষ ঐতিহাসিকের গবেষণার বিষয়, স্থাপত্যবিশেষজ্ঞের শিক্ষা করবার বস্তু, পুরাতনে শ্রদ্ধা সঞ্চয় করবার প্রণোদনা মাত্র। কিন্তু এ ত সৌন্দর্য্যের সার বস্তুকে কবি-প্রতিভার যাদুতে বাস্তব জগতে ফুটিয়ে তোলা নয়! এ ত মানুষের যুগ-যুগ-সঞ্চারী সাধনার ফলে সরলতার সঙ্গে কলা কারুর মহিমময় উদ্বাহসাধনের অনুপম কীর্ত্তি নয়! এক কথায় এ একটা গ্রন্থন-বৈচিত্র্য,—সৃষ্টি নয়; স্তম্ভিত করবার প্রয়াস,—শিল্পীর প্রেরণালব্ধ মূর্ত্তি নয়; এ অলঙ্কারবাহুল্য,—সৌন্দর্য্যের মর্ম্মবাণীটি সহজানুভূতির আলোকে উপলব্ধি করার সাধনা নয়। এক কথায় এ দিলওয়ারা,—তাজমহল নয়।

দিলওয়ারা সম্বন্ধে শেষ বৈষম্য-তুলনার (antithesis) দ্বারা বোধ হয় আমার বক্তব্যটি তাঁর কাছে এক মুহূর্ত্তে স্বচ্ছ প্রতিভাত হ'য়ে উঠ্‌বে যাঁর জীবনে তাজমহল দেখবার পরম সৌভাগ্য হ'য়েছে! তাজমহল দেখ্‌তে দেখ্‌তে য়ুরোপের সৌন্দর্য্য-পিপাসুর কথার প্রতিধ্বনি ক'রে বল্‌তে ইচ্ছে করে—To see Tajmahal and then die. * দিলওয়ারা

* আসল কথাটি—To see Naples and then die. কিন্তু হওয়া উচিত ছিল To see Venice and then die.

দেখ্‌তে দেখ্‌তে সৌন্দর্য্যান্বেষুর মনপ্রাণ এ ভাবে ভ'রে ওঠে না। অথচ একথা স্বীকার করতেই হবে যে পরিশ্রম ও কারুকার্য্যের অসম্ভব দুরূহতার দিক্ দিয়ে দিলওয়ারা তাজমহলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

দিলওয়ারা ও তাজমহল দেখ্‌তে দেখ্‌তে মনে একটা কথা আবার নতুন করে আঘাত দেয়। সেটা এই যে শিল্পসৃষ্টি এক ও বাহাদুরি-দেখানো আর। দাক্ষিণাত্যের গোয়ালিয়রের ও ভুবনেশ্বরের মন্দিরগুলির কারুকার্য্য-বাহুল্যের সঙ্গে মোগলসভ্যতার শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের বিকাশের তুলনা করলে একথা এক মুহূর্ত্তে প্রতীয়মান হয়। হিন্দু মন্দিরগুলির নির্ম্মাতৃগণের যেন জীবনের একটি মাত্র উদ্দেশ্য ছিল—গঠিত সৃষ্টিতে পারত পক্ষে কোথাও কারুকার্য্য বাদ না দেওয়া। এ যেন নিম্ন শ্রেণীর ওস্তাদের অনবরত তান ও গমক দিয়ে রাগিণীর মূর্ত্তিটিকে ঢেকে দেওয়ার সাড়ম্বর প্রয়াস, যার উদ্দেশ্য—লোকের "তাক লাগিয়ে দেওয়া", দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে এক মনোজ্ঞ সহানুভূতির বিচিত্র আনন্দ-সেতু গ'ড়ে তোলা নয়।

মানুষী কীর্ত্তির রাণী তাজমহলের অনুপম শোভার চিরন্তন আবেদনের কথা ছেড়ে দিলেও সেলিমচিস্তির কবর, সিকান্দ্রার ও সিক্রির সিংহদ্বারের অনুপম কলাকারু, আগ্রার স্নানহর্ম্ম্যের প্রশস্ত উদার শিল্পচাতুর্য্য ও মতিমস্‌জিদের প্রসারিত নিরাভরণা মোহিনী ছবির সঙ্গে ভূত যুগের হিন্দু স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের অলঙ্কার-বাহুল্যের তুলনা করলে বোধ হয় একটু বেশি ক'রে চোখে পড়ে যে মানুষ কত যুগ যুগ সঞ্চিত সাধনার ফলে শিল্পকলায় সারল্যের মধ্যেকার সৌন্দর্য্যের গুহ্য সত্যটি আবিষ্কার ক'রেছে।

বোধ হয় সব শিল্পের সম্বন্ধেই একথা খাটে। উচ্চশ্রেণীর গায়ক গায়িকার গানের মধ্যে যে তানালাপের সংযম দেখা যায়, যে অলঙ্কারের প্রয়োগ-

নৈপুণ্য দেখা যায়, ও যে সুরের প্রশান্তি পাওয়া যায়,—তার সঙ্গে বাহাদুরি-লোলুপ নিম্নশ্রেণীর গায়কের তানবহুল অলঙ্কার-প্রপীড়িত সুরের হুহুঙ্কারের তুলনা করলে দেখা যায় যে গানের ক্ষেত্রেও মানুষ বহুদিনের সাধনার ফলে তবে সঙ্গীতের আবেদনে সারল্যের দাম দিতে শিখেছে।

চিত্রশিল্পেও তাই। য়ুরোপের Renaissance এর আগেকার চিত্রাদিতে প্রায়ই রঙের অতিচার, নরমূর্ত্তির বহুলতা, অসংখ্য দেবদেবীর আমদানী প্রভৃতির একঘেয়ে দৃশ্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে শ্রান্ত মন যেন স্পষ্ট বুঝতে আরম্ভ করে যে, কেন্দ্রগত মূর্ত্তিটি যে বাইরের উপলক্ষকে দিয়ে ঢেকে না ফেল্‌লেই বেশি ফুটে ওঠে সে সত্যটি ধরতে Vincy, Raphael, Angelo রূপ বিরাট শিল্পীত্রয়ীর কেন প্রয়োজন হ'য়েছিল।

য়ুরোপের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য সম্বন্ধেও তাই। Roman ও Gothic স্থাপত্যের মধ্যে প্রধান প্রভেদই এইখানে যে Gothic স্থপতিরা বুঝতে শিখেছিলেন প্রাসাদ, গির্জ্জাদিতে space এর আমদানীতে অলঙ্কারের সৌষ্ঠব কত বাড়ে। নইলে অলঙ্কারের গোলোকধাঁধায় চোখ সহজেই ক্লান্ত হ'য়ে ওঠে।

সাহিত্য সম্বন্ধে যে একথা আরও বেশি খাটে সেটাও বোধ হয় অনুরূপ স্বীকার্য্য। এক সময়ে সব সাহিত্যেই অনুপ্রাস, সালঙ্কার লিখনভঙ্গীকেই একান্তভাবে বড় ক'রে দেখা হ'ত। কিন্তু সময়ের সঙ্গে মানুষ সারল্য, ঋজুতা অনাড়ম্বর ভঙ্গীকেই বড় করে দেখ্‌তে শিখেছে। এ কথা বোধ হয় বেশি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিশদ ক'রে তোলা অনাবশ্যক।

বেশভূষায়ও তাই। আগেকার যুগের অভিজাত ও রাজারাজড়াদের পর্ব্বতপ্রমাণ বেশভূষা ও সম্মানপদক ব্যবহার করার রীতির সঙ্গে তুলনা করলে আজকালকার সরল সুন্দর বেশভূষার প্রচলন মোটের উপর শ্রেয়ঃ বলেই মনে হয় না কি? আজকাল এমন কি নারীজাতিও য়ুরোপে

(বিশেষ ক'রে বেশভূষার ফ্যাশান-প্রবর্ত্তক ফ্রান্স দেশে) ক্রমশঃ আগেকার সে তীব্র রঙের (**crying colour**) পোষাক পরিচ্ছদ বর্জ্জন করতে আরম্ভ করেছেন। এলিজাবেথের সময়ের বা তৎপূর্ব্বকালের নারীগণের বেশবাহুল্যের মধ্যে সাঁতার দিয়ে চলার দৃশ্যের সঙ্গে আধুনিক বেলাচারিণী ফরাসী নারীর সরল অথচ বিচিত্রশ্রী গ্রীষ্মবেশের তুলনা করলে বোধ হয় বর্ত্তমান জগতে বেশভূষার ক্ষেত্রেও এই সারল্যের বিবর্দ্ধমান প্রাধান্য বিশেষ ক'রে চোখে না প'ড়েই পারে না।

তর্ক উঠ্‌তে পারে যে দিলওয়ারা মন্দিরের অলঙ্কার-প্রাচুর্য্যকে সমালোচনা করতে গিয়ে হয়ত বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমাদের হিন্দুস্থাপত্যের প্রতি ঠিক্ সুবিচার করা হয় নি। কারণ পুরাতন শিল্পকে সব সময়ে আমাদের আধুনিক মানদণ্ডে ওজন করা উচিত নয়, একথা সময়ে সময়ে শোনা যায়। তাই এ সম্পর্কে আজ একটি কথা বলা উচিত মনে করি। কথাটি এই যে আর্টের বিচার করার সময়ে তার সময়ের বিচার করার কোনও দরকার নেই। কারণ সে বিচার ঠিক্ আর্টের বিচার নয়—তার ক্রমবিকাশের মূল্যদান মাত্র। আর্টের মুখ্য প্রয়োজনীয়তা এক তার চিরন্তন রস সঞ্চারের প্রেরণার মধ্যেই মিলতে পারে—সমর্থন বা **Justification**এর মধ্যে নয়। সেরূপ সমর্থন ঐতিহাসিকের ও গবেষকের কর্ত্তব্যের এলেকায় পড়ে—সৌন্দর্য্যপিপাসুর এলাকার মধ্যে নয়। কারণ ভূত বা আধুনিক শিল্পের যে দিক্ দিয়ে বিচার করতেই অগ্রসর হই না কেন, একটা কথা ভুল্‌লে চল্‌বে না যে প্রতি যুগের মানুষই শিল্প থেকে চেয়ে এসেছে প্রধানতঃ আনন্দ ও প্রেরণা, ভূতযুগ সম্বন্ধে আবশ্যকীয় তথ্য বা গবেষণার উপাদান নয়। কাজেই শিল্পানুরাগীর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে—কেবল শিল্প হতে তা'র প্রাপ্য মোটমাট আনন্দটুকু সঞ্চয় করা। তার উপরেও যদি কোনও সুধী বিশেষ শিল্প হ'তে বিশেষ দরকারী জ্ঞান বা তথ্য আহরণ করেন—

করুন, শিল্পপ্রেমিকের তাঁর সঙ্গে কোনও বিবাদ নেই, যেহেতু শিল্পানুরাগীর কাম্য বস্তু—ভিন্ন। কেন না শিল্পানুরাগী কামনা করেন শুধু সাধকের উপলব্ধ আনন্দটুকু মাত্র—সুধীর তথ্যপূর্ণ অফুরন্ত শুষ্ক ভাণ্ডার নয়। কাজেই প্রতি শিল্পের নানা দিক্ হ'তে বিচার বাঞ্ছনীয় হ'তে পারে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটি অনুক্ষণ মনে রাখা কর্ত্তব্য যে আসল বস্তুটি হচ্ছে—তার মধ্যে চিরন্তন সৌন্দর্য্যের আবেদনটি। অর্থাৎ এ আপত্তি তুল্লে হবে না যে "এখন যে হচ্ছে এখন, ও তখন যে ছিল তখন; অতএব দিলওয়ারার সঙ্গে তাজমহলের তুলনা করা ঠিক্ নয়।" শিল্পানুরাগী বল্‌বেন "হোক্ গে। আমি খুঁজি কেবল প্রেরণা ও আনন্দ, তাই সময়ের আমার কাছে অস্তিত্ব নেই। শকুন্তলা আমার কাছে ততখানি সত্য যতখানি রসবস্তু আমি এখনও তার পরিকল্পনাতে পাই। কালিদাসের সময়ে শকুন্তলার আবেদন কি প্রকৃতির ছিল, সে বিচারের ভার ঐতিহাসিকের বা প্রত্নতাত্ত্বিকের, আমার নয়।" যদি প্রত্নতাত্ত্বিক না হ'লে শকুন্তলা রসগ্রাহীর মনে সাড়া না তুল্‌ত, তা হ'লে সাত সমুদ্র তের নদী পারের জর্ম্মাণ কবি গেটে শকুন্তলা পড়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌বার আগে প্রত্নতাত্ত্বিকের পরামর্শ নিয়ে তবে শকুন্তলা-প্রশস্তি লিখ্‌তেন। তা ছাড়া শিল্পের একটা চিরন্তন আবেদন থাকেই থাকে যার ফলে classic চিরকালই classic থেকে যায়, আধুনিকের তুলনায় এক মুহূর্ত্তে খাটো হ'য়ে যায় না। তা যদি না হ'ত তা হ'লে আধুনিক যুগের শত শত শ্রেষ্ঠ মর্ম্মর প্রতিমার মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণ সমবেত হ'য়ে অন্ততঃ একটিও ভিনাস ডি মিলো বা আপলোর সমকক্ষ মূর্ত্তি গ'ড়ে তুল্‌তে অক্ষম হ'তেন না; তা যদি না হ'ত তা হ'লে হাজার হাজার চিত্রকরের লক্ষ লক্ষ সৃষ্টিও একটিমাত্র সিষ্টিন মাডোনার উদ্ভাসিত গরিমার কাছে পাণ্ডুর হ'য়ে যেত না; তা যদি না হ'ত তা হ'লে আধুনিক শত সহস্র মন্দকবিযশঃপ্রার্থিগণকে একা নাট্যগুরু

শেক্ষপীয়রের প্রতিভার সামনে মাথা হেঁট করতে হ'ত না ; ও তা যদি না হ'ত তা হ'লে শত শত **Victoria Memorial, St. Peter's Church, Cathedral** প্রভৃতিও কবির মানসী প্রতিমা ও স্বপ্নজগতের অতুলিত সৃষ্টি তাজমহলের কাছে নিষ্প্রভ হ'য়ে যেত না।

অজন্তা

বম্বে থেকে রওনা হ'য়ে জলগাঁওয়ে নেমে যখন মোটর ভাড়া ক'রে ৪০ মাইল দূরে অজন্তার জগৎপ্রসিদ্ধ চিত্রকলা ও শিলামন্দির দেখ্‌তে বাহির হওয়া গেল, তখন মনটা অনেক দিনের সাধ পূর্ণ হবে ভেবে যে কি একটা সানন্দ প্রতীক্ষার ভাবে ভ'রে উঠেছিল, সেটা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু অজন্তা-গুহায় পৌঁছবার শেষ ৪।৫ মাইল রাস্তা মোটরে চ'ড়ে অতিক্রম করার সময় সে সানন্দ প্রতীক্ষা যে এক কি 'সোৎকণ্ঠ' পরীক্ষায় রূপান্তরিত হ'য়েছিল সেটা যাঁরা নিজাম প্রভুর এ রাস্তাটুকুর বাহার চোখে না দেখেছেন তাঁদের পক্ষে কল্পনা করা বোধ হয় ঠিক্ ততটা সহজ হবে না।

রাস্তা বটে নিজাম বাদ্‌শার এই শেষ চার মাইল পার্ব্বত্য পথ! ও চালক বটে সেই সাহসী বীর যে এপথেও মোটর নিয়ে যেতে পশ্চাৎপদ হয় না! মনে আছে বায়স্কোপে একবার একটি **British tank**কে জলা, ডোবা, খাদ, খট্টা প্রভৃতি অতিক্রম করার অদ্ভুত দৃশ্য দেখা গিয়েছিল। অজন্তা যেতে যেতে হঠাৎ মনে হ'ল যে বোধ হয় বর্ত্তমান সময়ে **tank**এর দরকার নেই, যেহেতু মোটর গাড়ী একাই একশ।

কি সে রাস্তা! আহা! কথনও মনে হয় যে নিম্নগামী মোটরের

নিম্নগামিত্বের পরিমাপ কর্‌তে না গিয়ে চোখ বুজে থাকাই হৃদ্‌যন্ত্রের পক্ষে বেশি নিরাপদ, অথচ চোখ বুজেও স্বস্তি পাওয়া যায় না! কখনও মনে হয় উচ্চাশী মোটর চালকের উচ্চাশা বাতুলতা মাত্র এবং খানিকটা উঠেই মোটরযন্ত্র এ খাড়া পাহাড়ে আর অগ্রসর হ'তে গররাজি হ'য়ে শিরপা তুলে পশ্চাদ্গমন কর্‌তে আরম্ভ করবে! কখনও ছোটখাট জলাশয় অতিক্রম করার সময় সন্দিগ্ধ মন প্রশ্ন ক'রে বসে মোটরকার উভচর কি না, অর্থাৎ সাঁতার জানে কি না? কখনও পেট্রোল শকটকে আবার জলমগ্ন বৃহৎ প্রস্তর খণ্ডের মধ্য দিয়েই ধাবমান হ'তে হয়। অথচ আশ্চর্য্য এই যে এসব প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার আগে কোনও সাহসিক ভবিষ্যদ্বক্তাই জোর ক'রে বল্‌তে পারেন ব'লে মনে হয় না যে এসব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া মানুষসৃষ্ট কোনও যানবাহনের সাধ্যায়ত্ত হ'তে পারে। যাক্ একথা। নিজাম প্রভুর রাজকোষ অক্ষয় হ'য়ে থাকুক। কিন্তু যাত্রীরা যেন তাঁর রসগ্রাহিতা ও প্রজানুরাগ সম্বন্ধে কোনও উচ্চবাচ্য না করে!......

সারি সারি গুহাগুলিতে পৌঁছবার জন্য কিন্তু সিঁড়ি ক'রে দেওয়ার গুণে ঘাট নেই! নিজামের রাজত্বেও যে যাত্রীর সুবিধার জন্য রাজকোষ হ'তে অর্থব্যয় ক'রে সিঁড়ি তৈরী করার প্রেরণা কোনও মন্ত্রীকবির কল্পনায় মূর্ত্তিমতী হ'তে পারে, অজন্তা পৌঁছবার পথে সেটা অনুমান করা অসম্ভব। কিন্তু বোধ হয় মানুষ অসঙ্গতিতে ভরা ব'লেই নিজাম বাদ্‌শা ক্লিষ্ট ও ঝাঁকুনি-পীড়িত তীর্থযাত্রীর জন্য শেষটা কৃপাপরবশ হ'য়ে সিঁড়ি ক'রে দিয়েছেন। তাঁর জয় হোক্। একেই বোধ হয় শাস্ত্রে বলে—"জুতা মেরে গরু দান!"

আবু-মন্দিরের মতন এখানেও গুহাগুলির ভিতরে পৌঁছবার আগে মোটেই মনে হয় না যে এরূপ স্থলে এমন গোপনে এ হেন চমৎকার কলাকারু বিরাজ করতে পারে। কিন্তু ১ম গুহাটিতে প্রবেশ করা মাত্রই মনে হয়

সেই হিন্দু শিল্পীর অদ্ভুত অধ্যবসায় ও মন্দির করার অতুলনীয় উৎসাহের কথা—যার উত্তরোত্তর বিকাশ পরবর্ত্তী যুগে বোধ হয় আবুর দিলওয়ারা মন্দিরেই গৌরবের শিখরে উঠেছিল। ২৭টী গুহা, গুহার ভিতরে বাইরে অজস্র বৌদ্ধ মূর্ত্তি, গুহার ছাদে নানারূপ খোদাই-করা কাজ, মাঝে মাঝে স্তম্ভ। দিলওয়ারা মন্দিরের সঙ্গে অজন্তার গুহাগুলির একটা প্রধান প্রভেদ এই যে, দিলওয়ারা মন্দিরে মর্ম্মর প্রস্তর আনা হ'য়েছিল অন্যত্র হ'তে, অজন্তার সবই পাহাড়ের নিজস্ব। অর্থাৎ পাহাড়প্রমাণ পাথর প'ড়ে রয়েছে, সেটা কেটে শুধু তারই দ্বারা তার মধ্যে মন্দির, স্তম্ভ, মূর্ত্তি প্রভৃতি তৈরী কর—ভীমকর্ম্মা শিল্পীকে এই অসাধ্যসাধনের আদেশ দেওয়া হ'য়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে মনটা গর্ব্বে আনন্দে শ্রদ্ধায় ভ'রে ওঠে যে বার তেরশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদেরই দেশবাসী এমন অমানুষিক ফর্ম্মাসেও "অসম্ভব" বাক্যটী উচ্চারণ করেনি,—শুধু মানুষী অধ্যবসায়ের বলেই জড় প্রকৃতির দুস্তর বাধা অতিক্রম ক'রে মানবপ্রতিভার একটা চরম নিদর্শন রেখে গিয়েছিল। মনে পড়ে কবির তেজোগর্ভ শ্রদ্ধার অঞ্জলি!

Those sterner spirits let me prize,
Who, though the tendence of the whole
They less than us might recognise
Kept more than us their strength of soul.

আর সঙ্গে সঙ্গে মনটা উৎসাহে, তৃপ্তিতে পূর্ণ হ'য়ে ওঠে যে প্রতীচ্যেরও অনেক শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞ মানুষই অজন্তার শিল্পকলার পায়ে তাঁদের উচ্ছ্বসিত বিস্ময় ও শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করতে কুণ্ঠিত হননি;—বিশেষ ক'রে যখন এ শ্রেণীর লোকের পক্ষে প্রাচ্যকে ছোট ক'রে দেখার নিহিত প্রবণতাটি জয় করা এত কঠিন। †

† Mr. George Griffiths, Fergusson, Lady Herringham, Mr, Binyon, Rothenstein প্রভৃতির মতামত দ্রষ্টব্য।

তবে দুঃখ হয় যে অজন্তার মহিমা কল্পনার উপলব্ধিগোচর হ'লেও সৌন্দর্য্য আজ আর সে ভাবে রস-পিপাসুর তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে না। কারণ অজন্তার দেওয়াল প্রভৃতির চিত্রকলা প্রায় ভগ্ন ও ধ্বংসধূসরিত। কোনও ছবিই সম্পূর্ণ নেই এবং ২৭টি গুহার মধ্যে ২।১টি মাত্র গুহায় ছাড়া (এ দু' একটি গুহাতেও কোনও ছবিই অক্ষত নেই) অন্য গুলিতে সে অপূর্ব্ব চিত্রকলার কিছুই অবশিষ্ট নেই। এবিষয়ে ললিতকলার মধ্যে বোধহয় এক সাহিত্যের রসসম্পদই কালের ভ্রূভঙ্গীকে তুচ্ছ ক'রে যুগ যুগ ধ'রে হিমাদ্রির মতন অচল অটল ভাবে আপনার চিরন্তন গরিমাটি প্রচার করতে পেরেছে। অবশ্য একদিক দিয়ে ভেবে দেখ্‌তে গেলে দেখা যায় যে সব বড় শিল্পই এক হিসাবে প্রায় সাহিত্যের মতনই চিরস্থায়ী। কেবল সঙ্গীত, চিত্র, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য প্রভৃতির আবেদন নব নব যুগের আলোক-সম্পাতে নব নব রূপ পরিগ্রহ ক'রেছে এই মাত্র।

এটা যে শুধু কথার কথা নয়, সেটা ইতিহাসে বিভিন্ন সভ্যতার বিকাশ ও একের অপরের প্রতি প্রভাব বিস্তারের বহুল দৃষ্টান্ত একটু অনুধাবন করলেই বেশ বুঝা যায়। যেমন স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে গ্রীক শিল্প, রোমক সাম্রাজ্যের মধ্য দিয়ে কোনওমতে নিজের জের টেনে নিয়ে শেষে মধ্যযুগে ইতালীর **Renaissance**এর পর আবার এক নূতন সমৃদ্ধি নিয়ে নবজন্ম পরিগ্রহ করেছিল,—প্রাচীন গ্রীসের যে প্রভাব আজও য়ুরোপীয় সভ্যতার অস্থি মজ্জায় গাঁথা। চিত্রকলার ক্ষেত্রে দেখ্‌তে পাওয়া যায় চীন সভ্যতার বহুযুগ সঞ্চারী চিত্রকলানুরাগ যুগে যুগে চীন ও জাপানি চিত্রে নিত্য নব-পরিণতি লাভ ক'রেছে! সঙ্গীতের ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায়, প্রাচীন ভারতের রাগ-সঙ্গীত মুসলমান সভ্যতার সংস্পর্শে এসে কি বিচিত্র সামঞ্জস্যে গরীয়ান হ'য়ে উঠেছে! এবিষয়ে দৃষ্টান্ত-বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন। ইতিহাসে প্রতি পৃষ্ঠাই সভ্যতার অনুক্ষণ নব

নব রূপে বিকাশ পাওয়ার দৃষ্টান্তে ভরা। তাই কোনও গরীয়ান সভ্যতা বা সৌকুমার্য্যের পরম বিকাশই কালাতিপাতে ধ্বংস হ'তে পারে না—বড় জোর এক সভ্যতা হ'তে অন্য সভ্যতার প্রাণবীজে আরোপিত হয়। ধ্বংসোন্মুখ অজন্তাও যে বস্তুতঃ অমর, তার অন্যতম প্রমাণ—বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় চিত্রকলায় পুনরায় তার অনুপম ধারার পুনর্জ্জন্ম ও উত্তরোত্তর বিকাশলাভের মহিমময় দৃশ্য। কিন্তু তবু ভগ্নাবশিষ্ট ললিতকলার দৃশ্যের মধ্যে নিয়তির যেন একটা হৃদয়হীন শ্রদ্ধার অভাব থাকেই থাকে, যার কঠিন বাস্তবতা মানব-মনকে পীড়া না দিয়েই পারে না। মিলানোতে জগদ্বিখ্যাত কবিশিল্পী **Leoudardo da Vinci** প্রসিদ্ধ **Last Supper**এর নষ্টপ্রায় প্রাচীর-চিত্রটি (**mural paiuting**) দেখতে দেখতে এইরূপই একটা গভীর ক্ষোভ হৃদয় মথিত ক'রে ওঠে। অজন্তায় সেই পরিচিত অনুভূতিটিই যেন আসন্ন ধ্বংসের উপহাসের দৃশ্যে সেদিন সহসা ব্যথা-চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল ও মনে হয়েছিল, "হায়! যদি মানুষী কীর্ত্তির লুপ্ত বৈভবকে চিরতরুণ সুন্দরের পূজারীর জন্য চির নবীন রাখা সম্ভব হ'ত!"

অজন্তার অজস্র প্রাচীর-চিত্র দেখতে দেখতে একটা কথা বড় বেশি ক'রেই চোখে ঠেকে, যেটা অরবিন্দ তাঁর **Defence of Indian Culture**এ বড় সুন্দর প্রমাণ ক'রেছেন। তিনি ব'লেছেন যে প্রতীচ্য প্রায়ই বুদ্ধের দৃশ্যতঃ নাস্তিবাদ বা শঙ্করের মায়াবাদের উপরে জোর দিয়ে একটা ভুল সিদ্ধান্ত ক'রে বসে যে ভারতীয় সভ্যতা কোনও সময়েই মনের ও হৃদয়ের সৌন্দর্য্যানুভূতি বা নানামুখী চিন্তাধারার বিকাশের মূল্য দিতে শেখে নি। এ সিদ্ধান্ত যে ভুল (অরবিন্দ লিখ্‌ছেন) তা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার বহুমুখী সমৃদ্ধির মহান্ দৃশ্য দেখ্‌লে বড় সুন্দর বোঝা যায়; কারণ কেবল তখনই আমরা বুঝতে পারি যে প্রাচীন ভারত যে প্রাণশক্তির মূল্য ধার্য্য

কর্‌তে জান্‌ত সে সজাগ অনুভূতির অকাট্য প্রমাণ ভারতীয় চিন্তা, দর্শন, সঙ্গীত, শিল্প, ভাস্কর্য্য ও কাব্য জগতের অপূর্ব্ব বিকাশের জীবন্ত সাক্ষ্যের পরতে পরতে ওতপ্রোত। চিরদিনই আমরা এমন তমোভাবের জড়ত্বে আচ্ছন্ন ছিলাম না। *

বড় সত্য কথা। অজন্তার অজস্র চিত্র ও রেখা-সমৃদ্ধির স্বতঃস্ফূর্ত্তি দেখ্‌লে মনে হয় যে বস্তুতঃ ভারতীয় সভ্যতা যখন জীবন্ত ছিল তখন সে জীবনকে অবিশ্বাসের চোখে দেখে নি। কারণ তা যদি দেখ্‌ত তাহ'লে সে সভ্যতার প্রাণের দ্যোতনা ও অন্তর্নিহিত আনন্দ কখনই তার শিল্পের মধ্যে এমন বিচিত্র গরিমায় আত্মপ্রকাশ করতে উন্মুখ হ'য়ে উঠ্‌ত না। বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পজ্ঞও অজন্তার চিত্রসম্বন্ধে এই রকমই একটা কথা বলেছেন। † প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধ জীবনের এ স্বতোবিকাশের দৃশ্য হ'তে অন্ততঃ প্রেরণা পাবার জন্যও এ সব ভারতীয় কীর্ত্তির সঙ্গে আমাদের পরিচয় লাভ করা উচিত ব'লে মনে হয়। কারণ প্রাচীন ভারত "নাল্পে সুখমস্তি" শুধু যে মুখে ব'লেই ক্ষান্ত হয় নি, জীবনের নানা প্রণোদনার মধ্য দিয়ে এ সত্যটি উপলব্ধি করতে চেয়েছিল সে সত্যটি এ সব মানুষী কীর্ত্তিস্তম্ভের সাক্ষ্যে যেমন প্রত্যক্ষ-

---

* আর একস্থলে এই কথাই তিনি বিশের জোর দিয়ে ব'লেছেন যে "Indian painting sculpture and architecture did not refuse service of the aesthetic satisfaction and interpretation of the social civic and individual life of the human being ; these things as all evidences show, played a great part in their motives of creation (ibid)

† ইংলণ্ডের British Museumএ ভারতীয় চিত্রকলা বিভাগের অধ্যক্ষ Mr. Lawrence Binyon. তিনি লিখ্‌ছেন "This fresh vigour, the exuberance of life which contains with all its joyousness the capacity for deep melancholy and compassion is the dominant impression left on me by the contemplation of Lady Herringham's beautiful copies."

ভাবে উপলব্ধি করা যায়, তেমন বোধ হয় অন্য কোনও প্রমাণ প্রয়োগে যায় না।

অজন্তা থেকে ইন্দোর আস্‌তে পথে বিন্ধ্য-পর্ব্বত পড়ে। সে দৃশ্যটি বেশ সুন্দর যদিও তার মধ্যে অপরূপত্ব বিশেষ কিছু নেই। তবু অনেকক্ষণ ধ'রে সমতল জমিতে আসার পরে ট্রেণের দুপাশে বিন্ধ্য-পর্ব্বতমালার আরণ্য শোভা, খট্বা প্রভৃতির মনোজ্ঞ চমক ও পার্ব্বত্য পথে ট্রেণ চলার সেই পরিচিত মৃদু-গম্ভীর-ধ্বনি বড় তৃপ্তিকর মনে হ'ল। এবং সর্ব্বোপরি বিন্ধ্যপর্ব্বতের উচ্চতা বেশি না হ'লেও তার দরুণ প্রকৃতি-দেবীর স্নিগ্ধ-শীতলতা বম্বের অসহ্য আর্দ্র গরমের পর বড় আরামপ্রদ হ'য়ে উঠ্‌ল।

ইন্দোর সহরটি একটি উপত্যকা বল্‌লেই চলে—যার চারিধারে পাহাড়মালা বড় মনোরম ভাবে বিরাজমান। মহারাজ হোলকারের কলেজটী এই পাহাড়ের দৃশ্যের মধ্যে অবস্থিত ব'লে আরও রমণীয় হ'য়ে ওঠে। সহরের এই প্রান্তটিতে কলেজের কাছে তার বাঙালী Vice Principal মহাশয়ের সাদর আতিথ্যে সে খোলা আকাশ-বাতাসের মধ্যে ভারি আনন্দে কেটেছিল। বিশেষতঃ এই জন্য যে, ইন্দোর সহরের (অভ্যন্তরটি মধ্যপ্রদেশের অন্যান্য সহরের মতনই অপরিচ্ছন্ন হ'লেও) কলেজের দিক্‌টি বেশ খোলা ও সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে বিরাজমান।

ওস্তাদেরা যাঁদের "খাঁনদানী গাওয়াইয়া" অর্থাৎ "কুলীন গায়ক" বলেন, এখানে সেরূপ পরিবার দুটি আছেন। প্রথম বিখ্যাত বীণকার বন্দে আলি খাঁর সাক্‌রেদ ওয়াহিদ খাঁর ভ্রাতা, পুত্র, প্রপৌত্রাদি, ও দ্বিতীয়, প্রসিদ্ধ আলাপী বৈরম খাঁর বংশধর, আল্লাবন্দে খাঁর পুত্র সঙ্গীতরতন নাসিরুদ্দীন খাঁ। আলওয়ারের আল্লাবন্দে খাঁ এখনও জীবিত। তাঁর অন্য দুই ভাই উদয়পুরের জাকরুদ্দীন খাঁ ও রামপুরের এনায়েৎ খাঁ—মৃত। জাকরুদ্দীনের পুত্র জিয়াউদ্দীন এখন উদয়পুরে; মন্দ গান না, তবে গলা নেই। এনায়েৎ

খাঁর পুত্র রিয়াজউদ্দীন জয়পুরে—গলা মন্দ নয়, তবে মৌলিকতা নেই। একমাত্র আল্লাবন্দে খাঁর পুত্রই তাঁদের "খাঁনদানিত্বের" মুখ রেখেছেন।

"সঙ্গীতরতন" সত্যই একজন ভাল গায়ক। অদ্ভুত তাঁর সাধনা ও সুমিষ্ট তাঁর কণ্ঠ। তাঁর সুরের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য, মিড় গমক সবই উচ্চদরের। কেবল ইনি মাঝে মাঝেই গমক দিতে থাকেন বড় বেশিক্ষণ ধ'রে। সঙ্গীতে বিবিধ অলঙ্কার—মিড়, কম্পন, তান, গমক প্রভৃতি—সৃষ্ট হওয়ার সার্থকতাই এই যে, তাদের যথাযথভাবে কাজে লাগালে গানের সৌষ্ঠব বাড়ে। অপর পক্ষে শুধু একটি বা দুটি অলঙ্কার স্থানে অস্থানে অবিশ্রান্ত-ভাবে ব্যবহার করলে তাতে গান একঘেয়ে শোনাতে বাধ্য। নাসিরুদ্দীনের চেয়ে আল্লাবন্দে খাঁর গান বেশি একঘেয়ে এইজন্য যে, আল্লাবন্দে খাঁ গমক ব্যবহার করতে আরম্ভ করলে যতক্ষণ না শ্রোতার প্রাণবিহঙ্গম খাঁচা ছাড়বার উপক্রম করেন ততক্ষণ আর থাম্‌তে চান না। অনবরত তানেও যে গান এইরূপই একঘেয়ে লাগে তার জাজ্জ্বল্যমান পরিচয় পাওয়া যায় বম্বের বালগন্ধর্ব্বের গান শুন্‌লে। শুধু কম্পনে যে গান কত নিষ্প্রভ হ'য়ে ওঠে, তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ মেলে—আ-আ-আ-আ, ই-ই-ই-ই, উ-উ-উ-উ-উ কম্পনসম্বল য়ুরোপীয় গানে। য়ুরোপীয় কণ্ঠসঙ্গীতের এই "সবেধন নীলমণি" অলঙ্কারটির একান্ত বাহুল্যে যে সঙ্গীতরসিক ভারতীয়ের হৃদ্‌যন্ত্র কিরূপ শীঘ্র বিকল হ'য়ে পড়ে সেটা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। শুধু গমকে যদি কেউ অস্থির হ'তে চান, তবে যেন তিনি আল্লাবন্দে খাঁর "খাঁনদানী" আলাপে নিরন্তর গমকের ধমক একবার শুনে আসেন।...নাসিরুদ্দীন কিন্তু এখনও মন মুগ্ধ করতে পারেন, যেহেতু তিনি এখনও সম্পূর্ণ তাঁর পিতার পদাঙ্কানুসারী হ'য়ে ওঠেননি। তবে এ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে বিস্তারিত ভাবে লিখেছি * ব'লে আজ নাসিরুদ্দীনের গান সম্বন্ধে শুধু এইটুকুমাত্র

* দিনকয়েকের সঙ্গীতস্রোত...বিজলী গত বৎসরের।

ব'লেই ক্ষান্ত হব যে, তাঁর সাধনা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। নানারূপে তাঁর সার্গম ও দ্রুত আলাপ বাস্তবিকই বিস্ময়কর এবং গানকে ইচ্ছামত মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে যে কোনও সুরে স্থায়ী করার উদাহরণ ভারি মনোহর।

এবার নাসিরুদ্দীনের অনেক অনুযোগ ও হামবড়াই-ই শোনা গেল। আজকাল ওস্তাদদের মধ্যে শিক্ষিতদের বিরুদ্ধে—(বিশেষতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখপাত্র মহাপ্রাণ পণ্ডিত ভাতখণ্ডের বিরুদ্ধে) যে একটা তীব্র বিমুখতা ও বিদ্বেষ জেগে উঠ্ছে, তার একটা নিবিড় রস নাসিরুদ্দীনের ও অন্যান্য অনেক ওস্তাদদের 'ভাতখণ্ডে তর্পণে' প্রতীয়মান হয়। ক্রমে সকলে বুঝছে যে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে দেশে সঙ্গীতের প্রচার ও বহুল স্বরলিপি প্রকাশ ক'রে, তাদের যথেচ্ছাচার ও জ্ঞানপ্রচার-কার্পণ্যের এক মহা অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে সেদিন বম্বেতে আমায় বল্‌ছিলেন :— "এদের আমার প্রতি রাগের প্রধান কারণ এই যে, তাদের 'খাঁনদানী' গান আমি প্রকাশ্যভাবে সাধারণের কাছে নিবেদন করে দিয়েছি। এরা কেউ কেউ আমায় স্পষ্টই বলেছে যে, আমি তাদের অন্ন মেরেছি। এখন অনেক শিক্ষার্থী আমার বই দেখে তাদের ফর্ম্মাস করে, অমুক অমুক গান তাদের শেখানো হোক্—যে সব গান তারা সাতজন্মেও কখনও অপরকে শেখায় না।"

নাসিরুদ্দীন খাঁ আরও একটু বেশিদূর গিয়েছেন। তিনি আমায় বলেন যে পণ্ডিত ভাতখণ্ডের বইগুলি "দরিয়ামে ফেকনেকো কাবিল" অর্থাৎ নদীতে ফেলে দেওয়ার যোগ্য। তাঁর বইগুলির এরূপ সুভীষণ অন্তঃকৃত্য কামনা করার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি প্রশান্তভাবে বল্‌লেন বইগুলি লেখার সময় তাঁকে ও তাঁর খাঁনদানী ঘরের পরামর্শ নেওয়া হয়নি।

কথাটা একটু বিসদৃশ রকমের অহমিকাপূর্ণ হ'লেও একেবারে হেসে উড়িয়ে দেবার মতনও নয়। কারণ একথা স্বীকার করতেই হবে যে

খাঁনদানী ঘরে ভাল চালের গান ও উৎকৃষ্ট ঢঙের রাগাদি আছে। অর্থাৎ আমাদের এসব গান আদায় করতে হ'লে তাঁদের কাছে হাত পাততেই হবে যাঁরা খাঁনদানী ঘরের মুসলমান ওস্তাদ। কিন্তু পণ্ডিতজীর বিরুদ্ধে তাদের অবহেলা করার অভিযোগ আনার সময়ে এঁরা ভুলে যান যে, পণ্ডিতজী আজীবন ত এই সব গানের জন্য নানা ওস্তাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন এবং অতিকষ্টে নানারূপ ভাল গান ও রাগ সংগ্রহ করেছেন, শুধু দেশেরই উপকারার্থে। কিন্তু এঁরা শেখান কই। রামপুরের বিখ্যাত উজীর খাঁ একবার পণ্ডিতজীকে বলেছিলেন যে তিনি যে যে রাগ তাঁর কাছে চাইছেন সে সব রাগের তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কবরে যাওয়াই বিধাতার অভিপ্রেত। পণ্ডিতজী সেদিনও আমায় বল্‌ছিলেন যে সঙ্গীত-সম্মেলনে তিনি চান এই সব ভাল ভাল গান ও রাগের আলোচনা সংগ্রহ ও প্রচার। কিন্তু এঁরা বরাবর ভাল ভাল "ঘরওয়ানী চীজ" (বংশগত সম্পদ) আগলেই রেখে দিতে চান ও পরিশেষে বলেন যে এ সব "চীজ" যে বইয়ে নেই সে সব বই "দরিয়ামে ফেকনেকো কাবিল"! মন্দ অভিযোগ নয়!

কিন্তু এ নিন্দা বৃথা। কারণ পণ্ডিতজী যে অনেক এরূপ "ঘরওয়ানী চীজ" তাঁর বইয়ে ছাপিয়েছেন, একথা সব সঙ্গীত-অভিজ্ঞই জানেন। শুধু তাই নয়, পণ্ডিতজী অনেক রাগে ঘরওয়ানা গান না পেলেও সেই ঢঙেই নানা উৎকৃষ্ট গান রচনা ক'রে প্রকাশ ক'রেছেন। যিনি তাঁর স্বরলিপি দেখে গান শিখে লাভবান হ'য়েছেন তাঁকেই একথা স্বীকার ক'রতে হবে। কাজেই যদিও নাসিরুদ্দীনের গর্ব্বপূর্ণ অভিযোগ সত্য হ'লে আক্ষেপের বিষয় হ'তো কিন্তু সত্য নয় ব'লেই অবজ্ঞেয়। অর্থাৎ কেবল মুসলমান খাঁনদানী ওস্তাদদের কাছেই শ্রেষ্ঠ ঢঙের গান আছে, একথা যেমন সত্য, পণ্ডিতজী সে সব ওস্তাদের কাছ থেকে তাঁর পুঁজির ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করেন নি

এ অভিযোগও তেমনি অসত্য। পণ্ডিতজীর একাধিক মুসলমান ওস্তাদকে গুরুপদে বরণ করার কথা উল্লেখ আমি ইতিপূর্ব্বেই করেছি। তা হ'তে প্রমাণ হয় না কি যে নাসিরুদ্দীনের অভিযোগ মূলতঃ অসার ও বিদ্বেষপ্রসূত ?

নাসিরুদ্দীন কিন্তু অহঙ্কারী হ'লেও তেজস্বী লোক। তিনি একদিন আমায় বেশ সুন্দর ব'লেছিলেন "আপনারা বলেন আমরা গান শেখাই না। কিন্তু আপনারাও কি এজন্য অপরাধী নন? আগে আমাদের ইল্‌মের (জ্ঞানের) কদর করতে শিখুন ও আমাদের কাছে শিক্ষার্থীর মতন যথাযথ বিনয়ে ভূষিত হ'য়ে দাঁড়ান তারপর আমাদের নামে শেখাতে-কৃপণতার অভিযোগ আন্‌বেন।" খুব সত্য কথা। তেজস্বী আব্‌দুল করিম খাঁও একদিন আমাকে বলেছিলেন যে, আমাদের বোঝা উচিত যে, বড় ওস্তাদের অসম্মান করার অর্থ এই যে, আমরা তাঁদের জ্ঞানের মূল্য সম্বন্ধে এখনও অচেতন—কাজে কাজেই বর্ব্বর। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সত্যকার বড় ওস্তাদদের (যদিও দুঃখের বিষয় এরূপ ওস্তাদ আজ একান্ত বিরল হ'য়ে উঠেছে ব'লে এরূপ অভিযোগের ভিতরকার সত্যতার ভিত্তিও খুব দৃঢ় থাক্‌তে পারে না) এরূপ অভিযোগ মাথা পেতে নিতেই হবে। বস্তুতঃ যে সব ওস্তাদ সত্যকার জ্ঞানী ও সঙ্গীত-সাধক, তাঁদের মূল্য দিতে না-জানা আমাদের "কাল্‌চারের" অভিমানের পক্ষে একটা মস্ত বড় কলঙ্ক।

কিন্তু একটা কথা আছে। কয়টা ওস্তাদ নিজেদের সম্মান করেন? এবং যে নিজেকে সম্মান করে না, সে যে অপরের সম্মানও পায় না, জীবনের অভিজ্ঞতায় এ সাক্ষ্য কি তার প্রতি পৃষ্ঠায় মেলে না? কাজেকাজেই নাসিরুদ্দীনের অভিযোগের আংশিক সত্যতা স্বীকার ক'রে নিয়েও তাঁকে বলা চল্‌ত, "খাঁ সাহেব, যে দিন ওস্তাদেরা আব্‌দুল করিমের মতন নিজেকে সম্মান করতে শিখ্‌বে, সে দিন আপ্‌না হ'তেই তোমরা বাইরের লোকের

সম্মান পাবে—এজন্য আক্ষেপ ও অনুযোগে ভরপূর হ'য়ে উঠ্‌তে হবে না। কারণ সম্মান পাওয়ার পন্থা উচ্চৈঃস্বরে সেটা চাওয়া নয়, নীরবে সেটা পাবার যোগ্যতা অর্জ্জন করা।" পরমহংসদেব একটা বড় সত্যকথা বল্‌তেন যে, বিধাতা সত্যকার মানী লোকের কোথাও অসম্মান হ'তে দেন না। কারণ যার মান সত্যকার আত্মমর্য্যাদার বর্ম্মে আবৃত, হীনজনের নিক্ষিপ্ত হেয় অপমানের বাণ তার মানহানি করতে পারে না। তবে মুস্কিল এই যে, সত্যকার শিক্ষা ও সৌকুমার্য্য (refinement) না থাক্‌লে প্রায়ই বুঝতে পারা যায় না ঠিক কোন্‌খানে আত্মমর্য্যাদার মনোভাব আত্মশ্লাঘায় পরিণত হয়—যেমন নাসিরুদ্দীন খাঁর ক্ষেত্রে হ'য়েছে—এবং এ শ্লাঘার ভাব যে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পারে না সেটাও বলাই বেশি। তবে কথা এই যে, সত্যকার নিরভিমান আত্মমর্য্যাদার পরম আত্মসমাহিত তৃপ্তি, এক অনেক সাধনার দ্বারা উপলব্ধ হ'তে পারে। কাজেই "খাঁনদানী" নাসিরুদ্দীন খাঁর চরিত্র সে রূপ আত্মমর্য্যাদার যথাযথ বিকাশে গরীয়ান্ হ'য়ে ওঠেনি ব'লে বাড়াবাড়ি রকম দুঃখপ্রকাশ করারও বিপদ আছে। যেহেতু এরূপ অবজ্ঞা প্রকাশের ফলে আমরা তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেও যে এ গুণটীর পরম বিকাশ বিরল, সে সত্যটি একটু বেশি সহজে ভুলে' যেতে পারি।

আসল কথা—এটা একটা মস্ত বড় সমস্যা। কারণ একদিকে যেমন আমাদের মধ্যে সত্যকার শিক্ষিতদের কর্ত্তব্য—নির্ভীকভাবে ওস্তাদদের দোষ ত্রুটি দেখানো ও তাদের বৃথা আত্মম্ভরিতার প্রশ্রয় না দেওয়া, অপরদিকে তেমনি তাদের সংশোধন করতে গিয়ে গুণগ্রাহিতা হারানো বা নিজেদের সৌকুমার্য্য ও বিনয় খুইয়ে বসাও সমান অকর্ত্তব্য। মানব-মনে গুণগ্রাহিতার ও জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব যে বস্তুতঃ ছদ্মবেশে অসত্য অহমিকারই পরিচায়ক, সঙ্গীতের প্রতি অশ্রদ্ধাবান্ শিক্ষিত সমাজের এ

সত্যটি উপলব্ধি করার সময় এসেছে। পক্ষান্তরে ওস্তাদদেরও শিক্ষা, বিনয়, সঙ্গীতে যথার্থ আর্টের বিকাশ ও জ্ঞানের প্রচারের কাম্যতা সম্বন্ধে সচেতন হ'তে হবে। নৈলে তাদের কেবল আক্ষেপ ও অনুযোগই কণ্ঠমালা হ'য়ে উঠ্‌বে। এতদিন এ দুই সম্প্রদায় দুই দিকে চল্‌ছিল—ওস্তাদেরা রাজা-রাজড়ার কৃপাকটাক্ষকে ধ্রুবতারা ক'রে সঙ্গীতকারের জীবনকে হেয় ক'রে, ও শিক্ষিত-সম্প্রদায় সত্য শিক্ষায় সঙ্গীতকলার স্থান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন হ'য়ে জীবনের বিকাশ সঙ্গীতকে বর্জ্জন ক'রে। কিন্তু যে হেতু এখন থেকে আমাদের মধ্যবিত্ত সভ্যতাই সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক হবে বলে মনে হয়, সেহেতু বর্ত্তমান-ভারতে নিরক্ষর সঙ্গীতকলাবিৎ ও শিক্ষিত ভদ্রসম্প্রদায়ের মধ্যে একটা সহানুভূতি ও আদান-প্রদানের সেতু আশু গঠিত হওয়া দরকার হ'য়ে প'ড়েছে। তবে এ বাঞ্ছনীয় মিলন সাধন কি উপায়ে সংঘটিত হ'তে পারে, সেটা সকলে মিলে উৎসাহ ও সহানুভূতির সঙ্গে আলোচনা ও কাজ না করলে হবে না।

প্রবাসে

ইন্দোরের প্রসিদ্ধ ওয়াহিদ খাঁ—সত্যই খাঁনদানী। তার প্রমাণ,—তাঁর বাড়ীতে যেতে না যেতেই এ অশীতিপর বৃদ্ধ শুধু যে 'এলাইচি' দিয়ে আভূমি-প্রণত "তশ্‌রীফ রাখ্‌খিয়ে" (অর্থাৎ দেহ মাটিতে বসান) বল্‌লেন তাই নয়, বার বার জ্ঞাপন কর্‌লেন যে, তিনি মাদৃশ-জনকে "গানা শুনানেকো কাবিল" অর্থাৎ গান শোনাবার উপযুক্ত হ'তেই পারেন না। অপিচ তাঁর গরীবখানাতে মাদৃশ "কদরদানের" (অর্থাৎ গুণগ্রাহীর)

পদার্পণ করাই এক প্রচণ্ড "মেহেরবাণি"—আমরা দেবভূমি থেকে ছল্‌তেই এসেছি ইত্যাকার দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করারও তাঁর ক্রটি ছিল না। কিন্তু তাঁর এরূপ মামুলি বিনয়ে-ধূলোয়-মিশিয়ে যাওয়ার চূড়ান্ততেও সেদিন বোধ হয় কেউই প্রবঞ্চিত হন নি। কেউই সম্ভবত হয় না। কেন না "কদরদানও" জানেন, যে, খাঁ-সাহেব মনে মনে তাঁদের "বেওকুফ" ভেবে কি রকম অবজ্ঞা ক'রে থাকেন এবং খাঁ-সাহেবও জানেন যে, তাঁর নিজেকে অজ্ঞ ব'লে এত বড়গলা ক'রে প্রচার করাটা "কদরদান" অভ্যাগতের বিশ্বাস করবার কোনই আশঙ্কা নেই। তবু, এরূপ বিনয় প্রকাশের পরই যখন তাঁরা বলেন যে "সারে হিন্দুস্তানের গাওয়াইয়া" তাঁদের নাম শুন্‌লেই নিজের কান ধ'রে আল্লামন্ত্র জপ ক'রে থাকে * তখন তাঁরা একটু ভুল করেন ব'লে মনে হয়। কারণ উল্‌টো-পাল্‌টা কথা অবশ্য মানুষে বলে না তা নয়, কিন্তু সেটা নিতান্তই এক নিঃশ্বাসে বল্‌লে একটু শ্রুতিকটু না হ'য়ে প'ড়েই বোধ হয় পারে না।

বস্তুত শুধু ওস্তাদের এই প্রথা ব'লে নয়, বিনয়ের এই বাড়াবাড়িটা ভেবে দেখ্‌লে কোনও ক্ষেত্রেই বোধ হয় সমর্থন করা যায় না। কেন না, যে কথা মানুষে বিশ্বাস করতেই পারে না, সে-কথা এরূপ সাড়ম্বর বিনয়ের সঙ্গে উচ্চারণ করাটার মধ্যেই কেমন যেন একটা অস্বাভাবিকতা ও অসারতা বড় বেশি ক'রে চোখে ঠেকে। ধরুন, কোনও মস্ত কবি যদি একজন সামান্য সাক্ষাৎপ্রার্থীর কবিতা আবৃত্তি শোনাবার অনুরোধের উত্তরে ব'লে বসেন, "আপনার কাছে আমি হেয়, তুচ্ছাদপি তুচ্ছ, লেখকাধম, কোন্ মুখে নিজের কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনাতে পারি বলুন!"—তা

* ওস্তাদরা এক গুণিশ্রেষ্ঠদের নামে নিজের কাণ টেনে ধরে থাকেন—তাঁদের শ্রেষ্ঠতা স্বীকারের অভিব্যক্তি স্বরূপ।

হ'লে কি সে সাক্ষাৎপ্রার্থী বর্ত্তমানযুগে এ অলোকসামান্য বিনয়ের পরাকাষ্ঠা দেখে অভিভূত হ'য়ে পড়তে পারেন? এমন কি, ভেবে দেখ্‌লে বোধ হয় এ কথা বলাও অসমীচীন মনে হয় না যে অহমিকা-প্রকাশ আর এরূপ বিনয়ের অত্যুক্তি প্রায় একই জিনিষের দুই পিঠ মাত্র। কারণ এ দু'টি বস্তুই কি আসল নম্রতার লক্ষ্যটি থেকে ভ্রষ্ট হ'য়ে পড়ে না? কথা-বার্ত্তায় ও আদান-প্রদানে যথার্থ শীলতা বোধ হয় সেই স্বাভাবিকতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত—যে সহজতা অপরকে সর্ব্বদা নিজের সত্য বা কল্পিত শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে বার বার সচেতন করে দিতে উদ্যত হয় না। কাজেই শীলতার এ আদর্শ যদি মেনে নেওয়া যায় তা হ'লে আত্মম্ভরিতা ও বাড়াবাড়ি নম্রতা উভয়কেই পন্থা হিসেবে অস্বীকার করতেই হয়। তা ছাড়া যে অত্যধিক ও স্বচ্ছ বিনয়ের আসল স্বরূপটি কারুরই চিন্‌তে কষ্ট হবার কথা নয়, সে নম্রতার আড়ম্বরকে এত বড় ক'রে দেখাটা কি অনেকটা আবোল-তাবোল বকারূপ নিরর্থক শক্তিক্ষয়ের মতন দেখায় না? তবে হয়ত শিক্ষা ও সৌকুমার্য্যের প্রথম বিকাশের সময় এ-সব অতিচারকে (Overdoing) বর্জ্জন ক'রে সৌষ্ঠবজ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃত শীলতার মূর্ত্তিটি আবিষ্কার করা সহজ হ'তে পারে না। সত্য সুন্দর ভদ্রতা ও স্বাভাবিকতার প্রয়োগজ্ঞান জীবনে বিকশিত ক'রে তোলা বোধ হয় সভ্যতার মহৎ উপলব্ধিগুলির মধ্যে অন্যতম।

যাই হোক ওয়াহিদ খাঁ যে সত্যই গুণী, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁর পরিবারের অনেকের গান-বাজনা শুন্‌তে শুন্‌তে মনে হ'ল উচ্চাঙ্গের গান-বাজনা যেন ওদের কাছে ভারি সহজ হ'য়ে গেছে। ছেলেবেলা থেকে সুন্দর স্থানে, সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের মাঝখানে বাস করলে যেমন মানুষের নিহিত সৌন্দর্য্যবোধের বীজ সহজেই প্রস্ফুটিত হবার সুযোগ পায়, সত্যকার গুণিপরিবারে বোধ হয় তেমনি সহজে ভাল ঢঙের সঙ্গীত সম্বন্ধে একটি

অন্তর্দ্দৃষ্টি বিকশিত হবার প্রেরণা পায়। এ কথাটা ওয়াহিদ-খাঁরই বাড়ীতে তাঁর নয় বৎসরের পুত্র শ্রীমান্ আবদুল-রশীদের গান শোন্‌বার সময় যেন নতুন ক'রে উপলব্ধি করলাম। এ দুগ্ধপোষ্য অদ্ভুত বালক বসন্ত, তোড়ি, গান্ধারী প্রভৃতি কঠিন রাগও এমন সুন্দর ঢঙে ও সুললিত তান-লয়ে গাইল যে, মনটা সে অরুণোজ্জ্বল প্রভাতে যেন আরও আনন্দে সার্থক হ'য়ে উঠ্‌ল।

গুণী বটে ওয়াহিদ খাঁর পুত্র বীণকার লতিফ খাঁ। তাঁর ঝঙ্কার, গমক, মিড়, তান, ঝালা, লড়্‌গুথাও সবই অতি মিষ্ট। একদিন সমস্ত সকালটাই তাঁর নিপুণ হাতের বীণা শোনা গেল, কিন্তু শুন্‌লাম তাঁর এক পিতৃব্য মোরাদ খাঁ নাকি তাঁর চেয়েও ভাল বীণা বাজান। শুন্‌বামাত্র দলবল বেঁধে মোরাদখাঁর বাড়ীতে চড়াও হওয়া গেল।

মোরাদখাঁ সত্যি লতিফ খাঁর চেয়ে অতি শ্রেষ্ঠ বাজিয়ে। একই সহরে দুই জন এরূপ প্রথম শ্রেণীর বীণকারের বীণা শুনে মনটা খুসিতে ভরে উঠ্‌ল! তোড়ি, জৌনপুরী, দেশী ও ভৈরবী এই চারটি রাগ তিনি তাঁর নিপুণ হাতে যে কি অপূর্ব্ব বাজালেন, তার সম্যক্ তারিফ করা কঠিন! তাঁর বাজানর ঢং অনেকটা লতিফখাঁরই মতন, কেবল তিনি বীণায় গমকের কাজের চেয়ে মিড়ের কাজই বেশি দেখান। তাতে ক'রে তাঁর বীণাবাদন লতিফখাঁর চেয়ে সম্ভ্রমে (dignity) কম গরীয়ান হ'লেও ললিত সৌন্দর্য্যে বেশি মনোজ্ঞ হ'য়ে উঠে। তাঁর ও লতিফখাঁর বীণার মধ্যে "খাঁনদানীত্ব" একই ঘরের হওয়ার সাদৃশ্যও যেমন পাওয়া যায়, প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যটিও তেমনি পাওয়া যায়। দুই জন সত্য শিল্পীর মধ্যে খুব বেশি সাদৃশ্য থাক্‌লেও তাঁরা যে নিজের নিজের গুণপনার মধ্যে নিজের নিজের বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ না করেই পারেন না, এই সত্যটি খুড়ো-ভাইপোর বীণার তুলনায় যেন সেদিন বড় স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল।

মোরাদখাঁকে গত বৎসর লক্ষ্ণৌ সম্মেলনে যান নি কেন জিজ্ঞাসা করাতে,

তিনি গর্ব্বভরে উত্তর দিলেন আমাদের মধ্যে একটা কথা আছেঃ "কম্ খানা, মগর ইজ্জৎসে (আত্মসম্মান) রহনা।" এক মুহূর্ত্তে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইন্দোরের মহারাজার সভার প্রগল্ভ অসমজ্দার সভাসদদের মাঝখানে হুকুম মাত্র হুজুরে হাজির হ'য়ে আভূমি প্রণত সেলাম বাজিয়ে, চারদিকের হাসি-গল্পের মাঝে ফরমাস-মাফিক বীণাবাজানর নাম "ইজ্জৎসে রহনা"; আর লক্ষ্ণৌ-সম্মেলনের মতন আসরে ভারতবর্ষের নানা স্থানের গুণগ্রাহী ও রসবেত্তার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ তারিফ মুখরিত সভায় গাওয়ার নাম ইজ্জৎ হারানো। ধন্য গতানুগতিকতার প্রভাব! ও ধন্য অশিক্ষার গর্ব্বান্ধতা!

শান্তভাবে ভেবে দেখ্‌লে কিন্তু ওস্তাদদের এ শ্রেণীর সঙ্কীর্ণতার জন্য রাগ করা উচিত ব'লে মনে হয় না। কারণ বস্তুতঃ এরা হচ্ছে যাকে বর্ত্তমানযুগে ইংরাজীতে বলে **anachronism** অর্থাৎ কিনা সময় যে পরিমাণে এগিয়ে এসেছে বা বদ্‌লেছে, এরা সে পরিমাণে এগোনো দূরে থাকুক এক চতুর্থাংশও বদ্‌লায় নি; এদের মনোভাব অনেকটা বাদ্‌শাহের আমলের মনোভাবের সুরেই কায়েম হ'য়ে গেছে বল্‌লেই চলে। কাজেই, 'গান-বাজনা রাজ-রাজড়াদের জন্যই,' 'সেখানে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করার মধ্যে দূষ্য কিছুই নাই', 'সাধারণ লোক টিকিট ক'রে বিরাট সভা ক'রে আবার গান শুনবে কি?', 'কনফারেন্স জিনিষটা আগাগোড়াই সঙ্গীতের জাতমারা-রূপ এক গভীর কুটিল মনোভাব-সঞ্জাত', ওস্তাদদের এরূপ মনোভাবকে আধুনিক যুগের মন অনেক সময় বুঝতে পারে না। কিন্তু যদি আমাদের কল্পনার ভেলাকে দুশো তিনশো বৎসর উজান বইয়ে সেই নবাব বাদশার আমলের তীরে গিয়ে লাগাতে পার্‌তাম, তাহ'লে বোধ হয়, এ-সব ছোট-খাট রহস্যের যবনিকা আমাদের চোখের সাম্‌নে থেকে এক মুহূর্ত্তেই সরে যেত।

সকলেই বল্‌ল—'হাঁ, গাইয়ে যদি বলতে হয় তবে সে আর কেউ নয়,

কেশব রাও আপ্তে। বৃদ্ধ—মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ। আমরা তাঁর বাড়ীতে যেতে খুব আপ্যায়িত করলেন, কিন্তু গান করতে আর চান না, তাঁর বহুদিন সঞ্চিত আক্ষেপের ঝুলি ঝাড়তে আরম্ভ করলেন। "ধ্রুপদ ত উঠেই গেল; আমাদের সময়ের গান সে এক চীজ ছিল, আর আজকালকার বাজে গান এ এক অন্য জবর চীজ হয়ে দাঁড়িয়েছে; আমাদের গানে ছিল শুধু সুর ও লয়; আজকালকার গানে হয়েছে—সব বরবাদ; আমাদের সময় স্বরে ছিল শান্তিপর্ব্ব, আজকাল স্বরে এসেছে 'গদাপর্ব্ব' ইত্যাদি ইত্যাদি। বৃদ্ধ 'গদাপর্ব্ব' বলে খুব এক চোট হেসে নিলেন। আসরের অন্য সব শ্রোতাও হাস্‌লেন। অশীতিপর বৃদ্ধের কৌতুকোজ্জ্বল চোখ সংস্কৃত-মিশ্রিত ভাঙা হিন্দী, শিখা নেড়ে রসিকতা, সবই আমাদের ওস্তাদি-সঙ্গীতের অভিজ্ঞতায় এক নতুন জিনিষ হওয়াতেই বোধ হয় আমরা বৃদ্ধের অনর্গল গল্পে হৃষ্ট হয়ে উঠ্‌লাম! ওস্তাদ সম্প্রদায়ের মধ্যে রসিকতা! এ অভাবনীয় যোগাযোগে মনটা খুসি না হয়ে আর করে কি?

কিন্তু জরা যে অনেক সময়ে মানুষকে একটু বেশি রকম গল্পপ্রিয় করে তোলে সেটা হঠাৎ উজ্জ্বলভাবে উপলব্ধি করা গেল, যখন ঘড়ি খুলে দেখা গেল যে, এ ঘণ্টাখানেকের মধ্যে শুধু বৃদ্ধের পানসাজা ও ফোক্‌লা দাঁতের হাসি ছাড়া অন্য কোনও হৃদয়দ্রবকারী শিল্পকলারই জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাওয়া যায় নি। শুধু তাই নয়, নাসিরউদ্দীন-প্রমুখ ওস্তাদদের তাঁর চেয়ে বেশি মাহিনা দেওয়ার অসমীচীনতা, মহারাজার তাঁকে অবহেলা করার অনৌচিত্য, তাঁর গানের সমূহ অসুবিধা হবে বুঝে বিধাতার তাঁর দন্তগুলি অপহরণ করা রূপ অবিবেচকতা, তাঁর বহুদিন কারুর সঙ্গে আসরে ব'সে দুটো প্রাণের কথা বলার সুযোগাভাব প্রভৃতি নানান্ বিচিত্র অনুযোগ রূপ রসিকতায় তিনি শেষটায় এতই মুখর হ'য়ে উঠলেন যে, সত্যিই মনে হ'ল, তিনি বেমালুম ভুলে ভেবে বসেছেন যে, বাঞ্ছাকল্পতরু

আমাদের সেই অন্ধকার রাত্রে টাঙ্গা করে তাঁর বাড়ী পাঠিয়েছেন, শুধু জগতের অনিত্যতা ও ধনশালীর অব্যবস্থিততার সম্বন্ধে তাঁর দন্তহীন হাসির সঙ্গে স-টিপ্পনি লেক্চার শুন্‌তে। আমার এ বিবর্দ্ধমান ধারণা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কি না জানি না। তবে যেটা জানি সেটা এই যে ওস্তাদদের গান শুন্‌তে গেলে সময় বলে পদার্থটির দাম সম্বন্ধে বিস্মৃতিকে কণ্ঠমালা না করতে পারলে বাঞ্ছাকল্পতরু উচ্চসঙ্গীতানুরাগীর গান শোনার বাঞ্ছা পূর্ণ করার বিরোধী হয়ে বস্‌তে বড় ভালবাসেন। অথচ আমার একটি মান্দ্রাজী অধ্যাপক বন্ধু, তার আগের দিনই লতিফখাঁর বাড়ীর বহির্ব্বাটীতে একটি ঘড়ি থাকা রূপ অঘটনঘটার দেদীপ্যমান প্রমাণ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। এরই নাম বোধ হয় অঘটন-ঘটন-পটীয়সীর লীলাখেলা !

কেশব রাও নিতান্ত বৃদ্ধ। কাজেই তাঁর গানের বেশি সমালোচনা করবনা। কেবল এইটুকু বলি—তিনি ধ্রুপদের অত সুখ্যাতি ক'রে যখন অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও মাত্র একটি ধ্রুপদ চৌতাল অতি জলদ একতালার ছন্দে গাইলেন ও পরে নিজে থেকেই নৃত্যভঙ্গীতে বাজারে খেম্‌টা গান ধরলেন, তখন এক মুহূর্ত্তেই বোঝা গেল—কেন মহারাজা নাসিরউদ্দীনকে কেশবরাওয়ের তিনগুণ মাইনে দিয়ে রেখেছেন। লোলচর্ম্ম বৃদ্ধ কেশব রাওয়ের মুখে খেম্‌টাওয়ালীর গান যে আমাদের কি রকম লাগল তার অনেকটা ধারণা পাওয়া যায় যখন কোনও থিয়েটারে ঘোরতর বৃদ্ধা এক্‌ট্রেসকে ব্রীড়ানম্রা উদ্ভিন্নযৌবনা নববধূর ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা যায়।

শুন্‌লাম, অন্ধ দেবীদাস রাও খুব ভাল হারমোনিয়ম বাজান। উচ্চ হিন্দু যন্ত্র-সঙ্গীতে হার্মোনিয়মের স্থান যে খুবই নিম্নে, একথা সকলেই জানেন। কাজেই তাঁর হার্মোনিয়ম শুন্‌তে যেতে প্রথমটায় খুব আগ্রহ বোধ করি নি। কিন্তু যখন শুন্‌লাম তিনি অন্ধ, তখন গেলাম।

গিয়ে কিন্তু মনটা ভারি খুসি হ'ল ও মনে হ'ল এসে খুবই ভাল হয়েছে। হার্মোনিয়ম যন্ত্রটির মধ্যে যে কত রকম সৌন্দর্য্য বাহির করা যেতে পারে, অন্ধ দেবীদাসের বাজনা শোনা সে পক্ষে যথেষ্ট আলো দেয়। এর চেয়ে ভাল হার্মোনিয়ম আমি জীবনে একবার মাত্র শুনেছি ও সে বাদকটি হচ্ছেন গয়ার বিখ্যাত হার্মোনিয়ামী শোনি। কিন্তু এক শোনি ছাড়া আর কারুর হার্মোনিয়মে এরূপ কৃতিত্ব দেখেছি ব'লে মনে হয় না। ৺গণপৎ রাওয়ের বাজনা একবার অনেক বৎসর আগে শুনেছিলাম কিন্তু সে কথা ভাল স্মরণই নেই ব'লে গণপৎ রাও সাহেবকে এ তুলনার অন্তর্গত করতে চাই না। দেবীদাস রাও তাঁর কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে অনেকটা চিকারির মতন দ্রুত কাজ করেন ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠতে সুরটি বাজান। এ কৃতিত্ব খুবই বড় মনে হ'ল। তাঁর বাজানর ঢংটিও ভাল—যদিও শোনির মতন নয়। কিন্তু তবু তাঁর মুলতান, ভীমপলশ্রী, তিলক-কামোদ, কামোদ ও পুরবী খুবই উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল। তিনি হার্মোনিয়মে একটা বেশ মৌলিক রসস্থষ্টি করেছেন। অর্থাৎ তব্‌লার নানা জটিল বোলের অবিকল অনুরূপ সার্গম ঠিক্ সেই ছন্দে হার্মোনিয়ম বাজানো। এটা তিনি পর-পর মুখে আওড়ে ও বাজনায় বাজিয়ে দেখিয়ে দিলেন—যেটা সেজন্য আরও বিশদ হ'য়ে উঠ্‌ল।

চ'লে আস্‌বার সময় অন্ধ গুণী এত আদর ক'রে আমাদের তাঁর মাটির মেজেতে আসন পেতে বসিয়ে চা খাওয়ালেন যে মনটা ভারি তৃপ্ত হ'য়ে উঠ্‌ল। একে জন্মান্ধ, তাই বোধ হয় তাঁর এ সহৃদয় আপ্যায়ন আমাদের সকলকেই সেদিন বড় স্পর্শ ক'রেছিল। কেবল তাই নয়, অন্ধ দেবীদাস সেদিন যেরূপ উচ্ছ্বসিত ভাবে আমাদের তাঁর বাজনা শুন্‌তে আসার জন্য কৃতজ্ঞতা জানালেন, তাতে কেউই অবিচলিত থাকৃতে পারে নি! যে গুণী শ্রোতাকে, শুধু তাঁর শিল্পকলা দিয়ে তৃপ্ত ক'রে ক্ষান্ত না হ'য়ে এ তৃপ্ত-হ'তে আসার জন্যও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন, তাঁর হৃদয়ের সে

তারুণ্য ও সৌন্দর্য্যটিকে বোধ হয় একটু বড় ক'রে দেখা স্বাভাবিক। সেদিন তাঁর এত অল্পতেই এত উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের সুন্দর দৃষ্টান্তটি দেখে মনে হ'ল কবির সেই সুন্দর বাণীটি ঃ—

I have heard of hearts unkind kind deeds
With coldness still returning,
But alas ! the gratitude of men
Hath oftener left me mourning ! *

ইন্দোরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সারঙ্গিয়া বুন্দুখাঁকে ইন্দোরের প্রধান রাজমন্ত্রী দুদিন আমাদের এখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এরূপ প্রথম শ্রেণীর সারঙ্গিয়া আমি জীবনে একবার মাত্র শুনেছি। তিনি বুন্দুখাঁর মামা—পাতিয়ালার বিখ্যাত মম্মন খাঁ, যাঁর কথা আমি ইতিপূর্ব্বে লিখেছি। † তবে একত্র বাজালে "মাতুলক্রম" ভাগিনেয় যে অনেকগুলি বিষয়ে "মাতুল-অতিক্রমও" হ'তে পারেন না তা জোর ক'রে বল্‌তে পারি না।

বাস্তবিক অপূর্ব্ব বাজান—এই বুন্দুখাঁ ! একজন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী বটে ! শুধু তাই নয়, তাঁর বাজনা এত হৃদয়স্পর্শী যে প্রথম শ্রেণীর বীণার পরে শুন্‌লেও খারাপ লাগে না। কি তাঁর মিড় ! কি তাঁর গমক ! কি তাঁর দ্রুত মূর্চ্ছনা ! কি তাঁর সুললিত বিস্তার ! ও কি তাঁর লয়ের কাজ ! এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বাজনা শোনার সৌভাগ্য জীবনে কমই হয়। শেষণ বা মোরাদ খাঁর বীণা শুন্‌লে মনে হয় যে সংসার মায়া—এক বীণাই সত্য ! বুন্দুখাঁর সারঙ্গী শুন্‌লে মনে হয়, নাঃ, সংসার মায়া বটে, কিন্তু একা বীণাই যে সত্য তা নয়, সারঙ্গীও সত্য !

---

* Simon Lee ... Wordsworth.

† বিজলী, গতবৎসর, ... দিনকয়েকের সঙ্গীতস্রোত।

সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ হয় যে এমন যন্ত্র আজ ভদ্রসমাজে অনাদৃত! এস্রাজ ত কত লোকে বাজান, কিন্তু সারঙ্গীর সঙ্গে সত্যই তার তুলনা হয় না। সারঙ্গীর স্বর-লাবণ্য তার মিড়ের করুণ আবেদন, তার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে অপূর্ব্ব সাদৃশ্য, তার ঝঙ্কার সবই এস্রাজের চেয়ে অনেক শ্রুতিমধুর ও হৃদয়স্পর্শী। তবু সারঙ্গী আজ ওস্তাদ ও ভদ্রসমাজ বয়কট করেছেন শুধু এই অপরূপ যুক্তি বলে যে সারঙ্গী বাইজীদের সঙ্গতের যন্ত্র। তাহলে তবলাই বা কেন বর্জ্জিত হয় নি? বাইজীরা কি তব্‌লার সঙ্গে গায় না? এ puritan মনোভাবকে আরও উচ্চস্তরে নিয়ে গেলে খেয়াল-টপ্পাও বর্জ্জন করা না চল্‌বে কেন? এ কি অনেকটা সেই মুসলমান-বিদ্বেষী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মামুলি দাড়ি বৈরাগ্যের বিখ্যাত যুক্তিটির মতন নয়, যে দাড়িটা ম্লেচ্ছভাবাপন্ন ব'লেই মুণ্ডনীয়? তবে আশা হয় আমাদের সঙ্গীতের অদূর নবজন্ম ও পুনরুৎকর্ষের যুগে এরূপ সব বাজে যুক্তি ও কুসংস্কার বর্জ্জিত হ'য়ে আমরা একটু বেশি Æstheticsএর যুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হব। তবে সেজন্য শিক্ষিত যন্ত্রানুরাগীদের এখন থেকে সারঙ্গী শেখা একটা অন্যতম পন্থা ব'লে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।

ইন্দোরে শুন্‌লাম তিনজন বড় বাইজী আছেন। (১) শ্রীজান—গোয়ালিয়র হ'তে এসেছেন; (২) উজীর জান—কাশী হ'তে এসেছেন; ও (৩) কৃষ্ণা বাই—পর্টুগীজ গোয়া হ'তে এসেছেন। ইন্দোরের প্রধান মন্ত্রী আমাদের শোনাবার জন্য এঁদের আদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু ঠিক্ সেই সময়ে ইন্দোর-রাজের নবমবর্ষীয়া একটি কন্যা বাজী পোড়াতে গিয়ে পুড়ে মারা গেল বলে রাজ্যে হরতাল প্রভৃতি হ'তে আরম্ভ হ'ল। কাজেই তাঁদের গান শোনা ভবিষ্যৎ বারের জন্য রেখে দিয়ে উদয়পুর অভিমুখে রওনা হ'লাম। যদি কোনও সঙ্গীতানুরাগী ইন্দোরে যান, তবে যেন এই তিনজন বাইজীর গান শুনে আসেন।

উদয়পুর

উদয়পুর। প্রথমেই যেটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটা হচ্ছে—উদয়পুরের অধিবাসীদের বেশির ভাগ লোকেরই চেহারার মধ্যে কেমন যেন একটা উদিপুরী-উদিপুরী ভাব। বিজ্ঞজন হাস্‌বেন—বল্‌বেন, এ-কথাটাকে বলে প্ল্যাটিচিউড। কিন্তু বস্তুতঃ তা নয়। এমন লোক সংসারে প্রচুর দেখা যায়—বস্তুতঃ এই রকম লোকের সংখ্যাই সংসারে বেশি—যাদের চেহারার মধ্যে উদিপুরী-জয়পুরী আমেজ খুঁজে পাওয়া দূরে থাকুক কোন 'পুরী'রই উদ্দেশ পাওয়া যায় না।

তাহ'লে তর্ক ওঠে, উদয়পুরী বল্‌তে কি বোঝায়?—অর্থাৎ দার্শনিক ভাষায় এ-কথাটির সংজ্ঞা কি? সংজ্ঞা নির্ণয় করা এ মরজগতে বড় কঠিন কাজ, তবে গুটিকতক বৈশিষ্ট্য নির্দ্দেশ করা সহজ। 'বেশ, তাহ'লে উদিপুরী চেহারার বৈশিষ্ট্য কি?'—না, কৃষ্ণশ্মশ্রু, থিয়েটারের গালপাট্টা সামন্তবৃন্দের মতন সেই একমাটা কায়েমি চেহারা, মাথায় অর্থহীন ভাবে প্যাগড়ি বাঁধা এবং ভাষার সঙ্গে ভোজপুরী দুর্ব্বোধ্য ভাষার আশ্চর্য্য সাদৃশ্য। এতেও যদি পাঠক বুঝতে না পেরে থাকেন তবে কল্পনা করুন দাড়ি বস্তুটির মধ্যে সিঁথি কাটার এক বিচিত্র প্রয়াস।

উদয়পুর—সত্যিই অপূর্ব্ব সহর। সমতল ক্ষেত্রে (পাহাড়মালার বেষ্টনী রক্ষিত হ'লেও উদয়পুবকে ঠিক পাহাড়ে-জায়গা বলা চলে না) এমন পরীরাজ্য—অন্ততঃ ভারতবর্ষের যত স্থলে বেড়িয়েছি, তার মধ্যে ত কোথাও দেখি নি। রাজপুতানা যদি কেউ পরিভ্রমণ করতে চান, তাহ'লে যেন তিনি উদয়পুরটি আগে দেখে-ফেলার মতন ভুল না ক'রে বসেন। কারণ, আগে উদয়পুর দেখার মানে, আগে ভৈরবী রাগিণীটি শুনে ফেলা, যার পর

অন্য কোনও রাগিণী গেয়ে 'জমানো' কঠিন হ'য়ে না উঠেই পারে না। তার্কিক বল্‌বেন, "এ বাজে কথা, প্রতি রমণীয় সহরেরই একটা বিচিত্র, বিশিষ্ট আবেদন আছে, প্রতি নৈসর্গিক দৃশ্যেরই একটা একমেবাদ্বিতীয়ম্ গরিমা আছে, যেটা উপলব্ধি করার ফলে Corot প্রমুখ বিখ্যাত চিত্রকরগণ এঁদো পুকুর অঙ্কিত ক'রেও নাম কিনেছিলেন—ইত্যাদি ইত্যাদি।" সত্যি কথা। কিন্তু এসব কথা ততক্ষণ সত্যি থাকে, যতক্ষণ মানুষ উদয়পুর না দেখে বসে। পর্ব্বত-বিলাসীও বল্‌তে পারেন—যে আল্পস্, পাইরেনিজ্, স্নোডন, বিসুভিয়স প্রভৃতি প্রত্যেক্ পর্ব্বতমালারই একটা বিশেষত্ব আছে। সবই মানা চলে, কিন্তু তবু হিমালয় যে একবার দেখে ফেলেছে, পূর্ব্বোক্ত ধরণের কথার যৌক্তিকতায় তার মন সায় দিলেও প্রাণ দেবে না। কারণ তার প্রাণ আল্পস্ বিসুভিয়স প্রভৃতি দেখ্‌লে বলবেই বল্‌বে, "নহে, নহে, নহে।" আসল কথা, যতই কেন তর্কের ঊর্ণায় মনের অযৌক্তিক কথার কণ্ঠরোধ করি, গভীর পরিতৃপ্তি একটা যৌক্তিক বস্তু নয়। সমতল ক্ষেত্রের নানা মনোজ্ঞ সহরকে তার্কিক চক্ষু দিয়ে দেখ্‌তে পারি ও বল্‌তে পারি "অহো!" কিন্তু সৌন্দর্য্যের দিক দিয়ে সে "অহোর" আবেদন পাণ্ডুর হ'য়ে যাবেই যাবে—উদয়পুর একবার দেখ্‌লে। আবু পাহাড়, সাগর প্রভৃতি স্থলে দু'একটি সুন্দর নীলহ্রদ দেখ্‌বার সময় সুইজর্লণ্ডের সবুজের-আগুনলাগা পাহাড়ের পাদমূলে স্বচ্ছ নীল কিরণস্নাত বিশাল হ্রদের প্রশান্ত কম্পন মনে পড়্‌ত ও এইরকমই একটা কথা মনে হ'ত যে, "নহে, নহে, নহে।"

য়ুরোপে অল্প সময়ের মধ্যে যাঁরা যাবতীয় দ্রষ্টব্য স্থান দেখে গুম্ফদেশে চাড়াদানকরারূপ উচ্চাশায় শিহরিত হ'য়ে উঠে থাকেন, তাঁদের সঙ্গে অভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রায়ই সহানুভূতি প্রকাশ ক'রে থাকেন। কারণ, তিনি জানেন এরূপ এক নিশ্বাসে সাতকাণ্ড রামায়ণ পাঠের প্রচেষ্টা, নিয়তির

পরিহাসে কার্য্যকরী প্রায়ই হয় না। অন্ততঃ নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, হলাণ্ড, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতি স্থলে এইরূপ "প্রতিহিংসার" সহিত দ্রষ্টব্য স্থান দর্শন করার পর এ কথাটি আমি ত বিশেষ ক'রে উপলব্ধি করেছিলাম। কারণ, এ-সব ভীষণ-রেটে যাদুঘর, স্মৃতিস্তম্ভ প্রভৃতি দেখ্বার পর উপলব্ধি করা গিয়েছিল যে, "নহে, নহে, নহে"; অর্থাৎ দেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্য এ **sight seeing** নয়। শিক্ষালাভ করব ব'লে দেশ দেখায় এক তত্ত্বদর্শীরাই বিশ্বাস করতে পারেন। আসল দেশ দেখা হ'চ্ছে—আনন্দের প্রেরণায় দেশ দেখা। যে-সব দেশ দেখে আনন্দকে সম্বল ক'রে ফেরা হ'য়ে ওঠে নি, সে-সব দেশ-দেখাকে পণ্ডশ্রম বলাটা বোধ হয় অসমসাহসিক নয়। কারণ, শিক্ষার উদ্দেশ্যে দেশভ্রমণ করতে গেলে প্রায়ই শেষটায় আমেরিকান টুরিষ্ট-রূপ অপরূপ শিক্ষাজ্যোতিঃমণ্ডিত জীবটিতে পরিণত হ'তে হয়। আমাদের প্রকৃতির মানুষের পক্ষে কোনও স্থানে গিয়ে যা-যা দেখ্বার আছে, নক্ষত্রবেগে দেখে নেওয়ার জন্য সে কর্ত্তব্য প্রণোদিত রোমাঞ্চ আর হয় না। আমেরিকান টুরিষ্টরা বল্বেন "কুশিক্ষা **philistinism**," উত্তর মেনে নিয়ে বল্তে হয়, "দ্রষ্টব্য যা কিছু আছে গণ্ডুষে পান ক'রে তোমরাই জন্ম-জন্ম জহ্নুমুনির মতন জগতের ক্রমোন্নতিতে কোমর বেঁধে লেগে যাও। আমাদের পক্ষে অলস, উদাস চেয়ে-চেয়ে দেখা ও নিশ্চেষ্টভাবে সুন্দর দৃশ্য-উপভোগই যেন অক্ষয় হ'য়ে থাকে।" উদয়পুরের ও ভারতবর্ষের নানাস্থানের নানান্ তথাকথিত দ্রষ্টব্য বস্তুই আজকাল আর দেখা হ'য়ে ওঠে না—বোধ হয়, য়ুরোপে ভীষণ-রেটে **sight-seeing** রূপ অতিচারটির প্রতিক্রিয়ার ফলে। এখন ভাল লাগে উদয়পুরের গিরিচুম্বী অস্তগামী সূর্য্যের শেষ সোনালি রশ্মিটুকু পান করতে; এখন ভাল লাগে কোনও একটি উচ্চ শিলাখণ্ডের উপর থেকে উদয়পুরের নীলাভ হ্রদবক্ষে মৃদুমন্দ পবনহিল্লোলের ছোট ছোট ঢেউ খেলানোর শোভাটুকুর পানে চেয়ে

থাকৃতে ; এখন ভাল লাগে উদয়পুর উপত্যকায় একটি তুষারশুভ্র ময়ূরের অলস মন্থর-গতিচ্ছন্দের ভঙ্গীমাটুকু অলসভাবে পর্য্যবেক্ষণ করতে ; এখন ভাল লাগে দূর থেকে উদয়পুরের হ্রদের মধ্যে শুভ্রদ্বীপপ্রাসাদগুলির আত্ম-সমাহিত হাসিটুকু উপভোগ করতে ; এখন ভাল লাগে ছোট্ট একটি নৌকা ক'রে সে হ্রদবক্ষে নিতান্তই উদ্দেশ্যহীন ভাবে দাঁড় টেনে তীরের শুভ্র প্রাসাদগুলির সমন্বয়ের সুষমাটুকু সঞ্চয় করতে। উইলিয়ম আর্চার প্রমুখ সদাকর্ম্মশীল, সত্যানুসন্ধিৎসু, ব্রহ্মাণ্ডের হিতসাধনব্রত উন্নতিপন্থীদের চোখে অবশ্য এরূপ অর্থহীন অলস উপভোগ অতি হেয় মনে হবেই, কিন্তু তার ত আর চারা নেই, যখন আপ্তবচনই রয়েছে যে "স্বভাবো নাতিরিচ্যতে।"

উদয়পুরের ফতে সাগরটির ধারে ধারে মহারাণা ফতে সিং, একটি সুরম্য রাস্তা কেটে দিয়েছেন। হ্রদটির ধার দিয়ে ধার দিয়ে সাদা রেলিং রক্ষিত রাস্তাটি ভারি ভাল লাগে। সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করা যায়, সুন্দর সুন্দর নদীতীর, হ্রদতট, সাগরসৈকত এ ভাবে সাধারণের জন্য বাঁধিয়ে দেওয়াটা কত বাঞ্ছনীয়। য়ুরোপের সমুদ্র, হ্রদ, নদী, ফিওর্ড প্রভৃতির ধার দিয়ে মনোরম পথ, বৃক্ষবীথি প্রভৃতি রচনা করার প্রথাটা যে কত সুন্দর, সেটা এ-সবের আরাম একবার উপভোগ ক'রে না এলে বোধ হয় যথাযথভাবে বোঝা যায় না। উদয়পুরের ফতেসাগরের তটলগ্ন এই দূর-বিসর্পী শুভ্র রাজপথে মন্থরগতিতে বেড়াতে বেড়াতে যখন অপর পারে মালাকার পর্ব্বতশ্রেণীর পরপারে রক্তরবির শেষ লুকোচুরি খেলাটুকু উপভোগ করা যায়, তখন মনে হয় যে, এ হ্রদটির চারধারে রাজন্যবর্গের প্রাসাদ ও বসবাসের একচেটিয়া অধিকার থাকৃলে মাদৃশ "ইতরা জনাঃ"-দের কতখানি ক্ষতি হ'ত। ফতেসাগরের শোভা শুধু এই হরিৎ-নীল বিশাল হ্রদের তিন ধারে পাহাড়মালার গম্ভীর সমাহিত সৌন্দর্য্যেই পর্য্যবসিত নয়। চতুর্থ দিকে মহারাণার একটি সুন্দর বাগান বাড়ীর হরিৎ বনস্পতির

হাতছানি এ ছবিটির সম্পূর্ণতা বড় সুন্দরভাবে সাধিত ক'রেছে। এ বাগানটি ফতেসাগরের চেয়ে নিম্নতর স্তরে অবস্থিত। অর্থাৎ রাস্তাটির তিন দিকে পাহাড়ের শোভা উপভোগ করতে হ'লে যেমন মুখ উঁচু করতে হয়, চতুর্থ দিকে বাগানটি দেখতে হ'লে তেম্‌নি নীচুদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে হয়। তাই এরূপ ধরণের হ্রদের শোভার মধ্যে একটু বৈচিত্র্য আছে।

মহারাণার এ আরাম-বাগটির মধ্যেকার প্রাসাদটি সুন্দর, কিন্তু সব চেয়ে সুন্দর তার বাগানগুলি ও অজস্র ফোয়ারা। মালি যখন সব ফোয়ারাগুলি খুলে দিল, তখন সে গোধূলির পূত ম্লানিমায় ও চারি পাশে অজস্র নানা বর্ণের ফুলের লালিমায় এ ফোয়ারাগুলির প্রাণচঞ্চলতা যেন এক বিচিত্র মাদকতার রসে রঙিয়ে উঠেছিল মনে আছে। এক দিকে বাগানটির মধ্যে গোলাপ কুঞ্জটির রঙীন সুষমা ও অপর দিকে পাদমূলে কালো, মধ্যে ঘনশ্যাম ও শীর্ষে অস্তোন্মুখ রবিকরজালের হোলিখেলার ক্ষণস্থায়ী আলোক-সম্পাত! মনটা ব'লে উঠ্‌ল যে, এই চঞ্চল গভীর হ্রদবক্ষ ও পাহাড়মালার আবেষ্টনের মধ্যে শুধু ঝরণা-চুম্বিত গোলাপ বাগানটি দেখবার জন্যই উদয়পুর আসা সার্থক।

পিছোলা হ্রদটির শোভা অন্যরূপ। দুধারে পাহাড়, একধারে বিশাল প্রাচীর বেষ্টিত উন্নত প্রাসাদ ও একধারে সমতল ভূমি; হ্রদটির মধ্যে মধ্যে ছোট ছোট দ্বীপ ও প্রতি দ্বীপের উপরেই শুভ্র মন্দির ও হর্ম্ম্যরাজি। প্রাসাদের উপর থেকে দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর। যেন জল ও স্থল নানা ছলে নানা রূপরেখায় মিলেমিশে খেলা করছে। সুইডেনের বিখ্যাত ষ্টক্‌হল্‌ম সহরটির সৌন্দর্য্য মনে পড়ে—যাকে লোকে বলে Venice of Scandinavia. বস্তুতঃ অভিরাম পাহাড়ের ঢেউয়ের পায়ের কাছেই জল ও স্থলের পরস্পরকে এভাবে আদর করার দৃশ্যটির মধ্যে একটি বিচিত্রশ্রী আবেদনে মনটা ভরে উঠেছিল সেদিন।

পিছোলার মধ্যে জগনিবাসে নৌকা করে যাওয়া গেল। এটি একটি সুন্দর ছোটখাট প্রাসাদ। বর্ত্তমান রাজকুমার ভূপাল সিংএর বিরামকুঞ্জ। বিরামের উপযোগী কুঞ্জ বটে। জগনিবাসের মর্ম্মর গৃহগুলির মধ্য থেকে চারিদিকের প্রকৃতির হাস্যময়ী মূর্ত্তি বোধ হয় শ্রান্ততম চিত্তেরও শ্রান্তি হরণ করে। মনে হয়, এরূপ ভোগের মধ্যে একটা পরম সার্থকতা আছে বটে। কারণ অর্থ থাক্‌লেই ভোগ করা যায় না, ও বস্তুটি জানা চাই, এ কথা যে ভুক্তভোগীরই একবার লক্ষপতি মাড়োয়ারীর সঙ্গে পরিচয় করবার সৌভাগ্য হ'য়েছে তিনিই মর্ম্মে মর্ম্মে জেনেছেন।

একটি নতুন ও একটি পুরোণো প্রাসাদ শম্ভুনিবাস ও শিবনিবাস। নূতনটিতে সাহেব-সুবোদের সৎকার করা হয় ও পুরোণোটিতে মহারাণা অনেক সময়ে নিজে থাকেন। পুরোণোটি সনাতন ও নূতনটি আধুনিক। অনেকে পুরোণোকে বাঞ্ছনীয় ও গরীয়ান্ মনে করেন শুধু এই জন্য যে পুরোণো—পুরোণো, নতুন নয়। এরূপ মনোভাবে সাড়া দেওয়া বোধ হয় সব সময়ে খুব সহজসাধ্য হয় না। অন্ততঃ শিবনিবাস ও শম্ভুনিবাস পাশাপাশি দেখে আমাদের ত মনে হয়েছিল যে নূতন প্রাসাদ অর্থাৎ শম্ভুনিবাসটি ঢের বেশি সুন্দর। বিশেষতঃ শম্ভুনিবাসের নানান্ দেয়ালে নীল কাঁচের তৈরী হাতী ও পশুপক্ষীদের চিত্র শিবনিবাসের অনুরূপ নীল কাঁচের কাজের চেয়ে ঢের ভাল মনে হ'ল। তাছাড়া শিব-নিবাসের নানা ঘরের বিশ্রী রকম উজ্জ্বল রঙ আধুনিক রুচিকে বড়ই আঘাত করে। শিবনিবাসে কেবল একটি বস্তুর অভাব নেই—সেটি হচ্ছে ধর্ম্মপ্রণোদনা! মহারাণা এখনও যে ছোট্ট ঘরটিতে মাঝে মাঝে থাকেন, সে ঘরটির দেয়ালে কেবল নরকের ছবি। শুন্‌লাম বৃদ্ধ মহারাণা বড় ধার্ম্মিক। সেটা নিশ্চয়ই দিন রাত এই সব চিত্তোন্মাদী নরকের শিক্ষাপ্রদ ফল। তবু অবিশ্বাসী হিন্দু আজ কথায় কথায় অনন্ত নরকের ভয়প্রদর্শনে বিশ্বাস করতে চায় না!

শম্ভুনিবাসের ঘরগুলিতে পূর্ব্ব যুগের রাণাদের ছবি আছে। তার মধ্যে সব চেয়ে ভাল লাগলো, রাণা প্রতাপ সিংহের ছবি। কি তেজোব্যঞ্জক চেহারা, কি নির্ভীক দৃষ্টি! বর্ম্মচর্ম্ম-পরিহিত বর্ষা-হাতে রাণা প্রতাপ দাঁড়িয়ে সোজা সাম্‌নের দিকে তাকিয়ে আছেন। মাথা সম্ভ্রমে নত হ'য়ে আসে, হৃদয় ভরে আসে। ক্ষাত্র-বীর্য্যের মহত্তম বিকাশ যে কেমন ক'রে মানুষের প্রতি ভঙ্গীতে ফুটে ওঠে, তার এরকম সুন্দর নিদর্শন আজ অবধি কখনও দেখি নি। এমন কি নেপোলিয়নের চেহারাও মনে বীরত্বের প্রতি এ সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা জাগায় না। ঠিক রাণা প্রতাপের সাম্‌নের দেয়ালেই তাঁর কুলাঙ্গার পুত্র অমর সিংহের ছবি। অন্তরের গুণাগুণ যে মানুষের মুখে কি আশ্চর্য্যভাবে প্রতিফলিত হয়, তার এরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া শক্ত। অসিতকুমারের "ছন্দ ও দ্বন্দ্ব" শীর্ষক প্রবন্ধের একটি কথা মনে পড়্‌ল যে চিত্রকর ছন্দের মহত্ত্ব উজ্জ্বল ক'রে ধ'রে থাকেন দ্বন্দ্বের (contrast) সাহায্যে। প্রতাপ সিংহের অমর বীরত্ব, তেজোদৃপ্ত চাহনি ও সাহসবিচ্ছুরক ভাবভঙ্গীর পাশাপাশি তৎপুত্র অমর সিংহের গোলাপফুলের পানে নিবদ্ধ হীনপ্রভ দৃষ্টি, কুণ্ঠিত গতি ও বিলাসপ্রিয় ওষ্ঠাধর সেদিন মনে এক অপূর্ব্ব হর্ষ-বিষাদের আলো ছায়ার সৃষ্টি করেছিল।

উদয়পুরের মহারাণার একটি অদ্ভুত সখ আছে। সেটি—পিছোলো হ্রদের এক প্রান্তে একটি প্রাসাদের পাদমূলে বন্য শূকরদের প্রত্যহ বিকেলে খাওয়ানো। রাজরাজড়াদের সখ। আমেরিকান টুরিষ্টরা খাতাপত্র নিয়ে দেখতে যান। তাই সকলে বল্‌ল দেখা চাইই। যাহোক্, হ্রদটি ত দেখা হবে ভেবে যাওয়া গেল, কিন্তু গিয়ে দেখ্‌লাম, এসে মন্দ হয় নি। সে একটা দ্রষ্টব্য ব্যাপার বটে। সাম্‌নের পাহাড় থেকে নিমেষে ৪০০।৫০০ বন্য শূকর ও শূকরসন্তান "জি হিঁ হিঁ হিঁ" শব্দে এসে হাজির। তাদের সে

কি ধূলো উড়ানো, কি সশব্দে খাওয়া ও কি সবলের দুর্ব্বলকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেওয়ার উৎসাহ! মনে হ'ল আনাতোল ফ্রাঁন্সের বিখ্যাত দার্শনিক নায়ক Monsieur Bergeret ও তাঁর তত্ত্বোপদিষ্ট কুকুরের কাহিনী। মসিয়ে বের্জরে শূকরগণের এরূপ মারামারির দৃশ্য দেখ্‌লে, নিশ্চয়ই তাদের সমস্নেহভরেই তত্ত্বোপদেশ দিতেন। অর্থাৎ তিনি বল্‌তেন নিশ্চয়ই:—"ভো ভো বন্য বরাহাঃ! কলহে ফল কি? তোমাদের সকলকেই বাঁচতে হবে। অতএব দুঃসহযোগ ও অসহযোগ দুই-ই ছেড়ে আনন্দ-সহযোগ রূপ পরস্পর নির্ভরতা বা **mutual aid** এর মহিমা উপলব্ধি কর। কারণ, দুর্ব্বলকে দন্তাঘাত ক'রে স্থানচ্যুত ক'রে জীবনের সমস্যার কোনও সমাধানই মিল্‌বে না। তোমাদের জানা দরকার যে, ডারউইনের জীবন-সংগ্রাম বা **struggle for existence** নীতি আজ সুধীসমাজে স্বীকৃত নয়; তার স্থলে সস্নেহ সহযোগিতা বা **sympathetic co-operation**এর নীতিই আদৃত। অতএব শেষোক্ত নীতি অনুসারেই তোমরা সজ্জনানুমোদিত জীবননাত্রা নির্ব্বাহ কর, যেহেতু অন্যথা তোমাদের যে অচিরে শীঘ্রই শূকরলীলা সম্বরণ করতে হবে তা আমি দিব্য-চক্ষে দেখ্‌তে পাচ্ছি।"

উদয়সাগর উদয়পুরের আর একটি বিখ্যাত হ্রদ। কিন্তু সৌন্দর্য্যে উদয়সাগর পিছোলা বা ফতেসাগরের সঙ্গে তুলনীয় নয়। শুন্‌লাম উদয়সাগরে বর্ষার পর শোভা বাড়ে। আমি যে সময়ে গিয়েছিলাম, সে সময়ে উদয়সাগর বড়ই শীর্ণকায়।

উদয়পুর থেকে ত্রিশ মাইল দূরে বিখ্যাত জয়সমুদ্র। এত বড় হ্রদ সমগ্র ভারতবর্ষে আর নাই। হ্রদটির ধার দিয়ে ধার দিয়ে বেড়ালে ত্রিশ মাইল হাঁট্‌তে হয়। এ থেকেই পাঠক অনুমান ক'রে নিন, হ্রদটি কি বিশাল।

কিন্তু বিশালত্ব এ হ্রদটির রমণীয়ত্বের পরিপন্থী হ'য়ে ওঠে নি—যেমন

অনেক ক্ষেত্রে হ'য়ে থাকে। হ্রদটি বাস্তবিকই ছবির মতন। মাঝের একটি পাহাড়ের শীর্ষে একটি ছোট বিশ্রামাগারের মতন আছে। সেখান থেকে যে চারপাশের দৃশ্যশোভা ভোগ করা যায়, তার তৃপ্তি অবর্ণনীয়। পাদদেশে হ্রদটির মধ্যে মধ্যে নানা রকম স্থল সন্নিবেশ ও পাথরের দৃশ্য; মাঝে মাঝে পাহাড়; যে ধারে দুচোখ যায়, সেই ধারেই দূরবিসর্পী নীল-জলের আবেষ্টনী; এ আবেষ্টনীর পরই সমতল ক্ষেত্রের শেষে পাহাড়মালা—সবেরই শোভা অপরূপ। তার উপর বিশ্রাম আগারে মৃদুমন্দ মারুতহিল্লোলে সে দিন মনের মধ্যে এক অপূর্ব্ব ইন্দ্রধনুর উদয় হ'য়েছিল মনে আছে। তার উপর আশে পাশে সবুজ-গাছের মাথা নেড়ে সে কলহাস্য নীচের হ্রদের হাতছানির সহযোগে যে কি এক বিচিত্র শ্রীর সৃষ্টি ক'রেছিল, সে আর কি বলব? তার ওপর সে অরুণোজ্জ্বল প্রভাতে সবুজ পাতার মধ্যে মধ্যে আলোর সে সোহাগ দেখে মনে হচ্ছিল শেলির অনুপম বর্ণনা, "The emerald green of leafentangled beams." সঙ্গে সঙ্গে উদয়পুরের স্বচ্ছ হাওয়ার লঘুতার দানে আলোর রঙ যে অপূর্ব্ব ভাবে স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল, তাতে মনে দুঃখও হচ্ছিল এই ভেবে যে, সহুরে লোক এ বায়বীয় লঘুতার কতটুকু পরশই বা পায়!

উদয়পুরে দুজন সভাগায়ক আছেন। একদিন তাঁদের গান শোনা গেল। একজনের নাম জিয়াউদ্দিন ও অপর জনের নাম কি একটা খাঁ। "কি একটা খাঁর" গলাটা জিয়াউদ্দিনের চেয়ে ভাল হ'লেও জিয়াউদ্দিন সে বেচারীকে হাঁ করতে দিলেন না বললেও হয়। প্রতি গান দুজনেই একত্রে পর পর তানালাপ ক'রে গাইছিলেন বটে, কিন্তু জিয়াউদ্দিন বিখ্যাত জাকরুদ্দিন খাঁর পুত্র ব'লেই বোধ হয় গানের কৃতিত্বের "সিংহের অংশ" তাঁর একচেটে হ'য়ে পড়েছিল। ফলে, সে কৃতিত্বকে ন্যায়সঙ্গত ভাবে দাবী করার জন্য, তিনি প্রতিবারেই তাঁর সহগায়কের মুখ থেকে তানগুলি

বেমালুম লুপে নিয়েই তাঁকে থামিয়ে দিচ্ছিলেন। ফলে সে বেচারী এমনই কাতর মুখে আমাদের দিকে চাইছিল যে, আমাদের মনে হচ্ছিল, যেন তার দৃষ্টি অনুযোগ করছে, "দেখুন ত! কি অন্যায়! আমি কি ঘেসেড়া, না গায়ক?"

জিয়াউদ্দিনের কণ্ঠস্বর একদম ভাঙা—কিন্তু তবু তিনি এক একটা তানকে সমের গুদামে মহা আস্ফালনে গুদামজাত করতে ছাড়ছিলেন না। এক একবার মনে হচ্ছিল, এ অসাধ্যসাধনে বুঝি তাঁর গলার মাংসপেশীগুলি ফুল্‌তে ফুল্‌তে ইস্তফা দেবে—কিন্তু আশ্চর্য্য তাদের জীবনীশক্তি। মনে হচ্ছিল কৈ-মাছের উপমা।

উদয়পুরে এক শ্রেণীর গায়িকা আছে, তাদের বলে ঢুলুনি। এই জাতীয় গায়িকারা গান ক'রে অর্থোপার্জ্জন করলেও গানই তাদের জীবিকার্জ্জনের একমাত্র পন্থা নয়। সেই জন্য হোক্ বা না হোক্ তারা গান করবার সময় ঘোমটা খোলে না। সেদিন দুজন ঢুলুনি গাইতে লাগ্‌ল ও তাদের মধ্যেই একজন বাজাতে লাগ্‌ল। কিন্তু তারা কেউই ঘোমটা খুল্‌লে না। সকলের সাম্‌নে কোন মেয়েকে ঘোম্‌টার আড়ালে গাইতে দেখা যে একটা অভিনব অভিজ্ঞতা, এ-কথা সত্যনিষ্ঠ পাঠক স্বীকার করবেন নিশ্চয়ই।

সে যাই হোক্, ঢুলুনি দুজনের কণ্ঠস্বর কিন্তু বেশ মিষ্ট দেখা গেল। শুধু তাই নয় তাদের কণ্ঠস্বর যে কি অসম্ভব রকমের জোরালো সেটা না শুন্‌লে সম্যক্ ধারণা করা কঠিন। তাদের গলার প্রবলতা উপভোগ করলে যে সংশয়টা খুব বেশি ক'রে মনে হয়, সেটা হচ্ছে এই যে, অবলা নামটি এঁদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য কি না। কারণ, তাদের গলার বলের কাছে যে অনেক সবল মিঞাকেই হার মানতে হবে, একথা বেশ জোর ক'রেই বলা যায়। কিন্তু বোধ হয় সর্ব্বদা এত জোরে গাওয়ার

দরুণই, তাদের গলার মধ্যে একটা নিটোল পূর্ণতার ভাব নষ্ট হ'য়ে গেছে। কেমন যেন একটা ভাঙা ভাঙা ভাব—যদিও সেজন্য স্বর তাদের বিশেষ অমিষ্ট হ'য়ে ওঠে না।

গান অবশ্য তাদের সাধারণ, যদিও তার মধ্যে একটু তাল-মানও আছে ও অল্প-স্বল্প সুরের ফেরটেরও আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মোটের উপর একঘেয়ে। কারণ, যদিও তাদের গানকে ঠিক্ লোকসঙ্গীতের পর্য্যায়ে ফেলা যায় না, তবু লোকসঙ্গীতের চেয়ে বিশেষ উচ্চাঙ্গেরও নয়। কাজেই একঘেয়ে না হয়েই পারে না।

এ-কথায় এক দল লোক হয়ত একটু আপত্তি ক'রে উঠ্‌বেন যে, লোকসঙ্গীতকে আমি ঠেস্ দিয়ে কথা বল্‌ছি। এ রকম আপত্তি ওঠবার আশঙ্কা করার কারণ আছে। বাংলাদেশের একজন গুণী ও জ্ঞানী শিল্পী আমাকে একদিন অম্লান বদনে বলেছিলেন যে, folk-musicকে classical musicএর চেয়ে কোনও অংশেই হীন বলা যেতে পারে না। এ রকম কথা বস্তুতঃ এতই অসার যে, এরূপ কথার প্রতিবাদ করাও সময়ের অপব্যয় মনে হয়। তবু লোকসঙ্গীতপন্থিগণের সবেমাত্র-খোলা-সোডার মতনই ক্ষণস্থায়ী উৎসাহ-ফস্‌ফস্ আজকাল মাঝে মাঝেই কাণে একটু বেশি রকম প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে। তাই এ প্রসঙ্গে দুএকটা মাত্র কথা সঙ্ক্ষেপে বলি।

আসল কথা folk-art ব'লে আর্ট হয়ত থাক্‌তে পারে, কিন্তু সে আর্ট বড় আর্ট হ'তে পারে না। কারণ খুবই সহজ—এমন কি স্বতঃসিদ্ধ বল্‌লেও চলে। কারণ এই যে, মানব-সভ্যতা শিল্প-জগতে বড় যা-কিছু সৃষ্টি ক'রেছে, তা ক'রেছে বহুদিনের সাধনার ফলে—এক দিনের সহজ উৎসাহে নয়। শিল্পসৃষ্টিতে উৎসাহ আবশ্যক হ'লেও উৎসাহ ছাড়াও তার মধ্যে দু'চারটি আরও নিতান্ত আবশ্যক উপাদান থাকা চাই। একটি অপরিহার্য্য

উপাদান হচ্ছে—সাধনা। অনেক দিনের সাধনার ফলে মানুষ সঙ্গীতে মেলডি ও হার্মনি সৃষ্টি ক'রেছে; অনেক দিনের সাধনার ফলে মানুষ চিত্র-কলার perspective ও বর্ণসম্পাতের তত্ত্বগুলি আবিষ্কার ক'রেছে। অনেক দিনের সাধনার ফলে মানুষ সাহিত্যে উচ্চকাব্য সৃষ্টি ক'রেছে; অনেক দিনের সাধনার ফলে মানুষ ভাস্কর্য্যে সারল্যের সঙ্গে অলঙ্কারের সহজ সামঞ্জস্যের গুহ্য কথাটি উপলব্ধি ক'রেছে; এক কথায়, প্রকৃতি দেবী তাঁর নিহিত সৌন্দর্য্যটি মানুষের অন্তরে স্ফুট ক'রে তোলেন—মানুষের যুগসঞ্চারী অন্বেষণের সাধনার পুরস্কার স্বরূপ। পুরাতন-যুগপন্থী বা বাড়াবাড়ি সারল্যপন্থীরা যাই বলুন না কেন, আর্টে মানুষ সেই নিরাভরণ রিক্ততাকে কখনই আর বড় ক'রে দেখ্‌তে পারবে না। আর্টকে বড় হ'তে হ'লে, যুগসঞ্চিত অভিজ্ঞতার আলোর সাহায্য গ্রহণ ক'রেই তার খচিত সৌন্দর্য্যের বিকাশ সাধন করতে হ'বে। লোকসঙ্গীত হ'তে খানিকটা নতুন আলো পেতে পারি মাত্র, কিন্তু লোকসঙ্গীতের যুগে আবার ফিরে গিয়ে আর্টকে পুনরায় বড় করার কল্পনাকে আকাশকুসুম ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না।

আজমীঢ়। পাহাড়ের আবেষ্টনী সহরটিকে বড় রমণীয় ক'রেছে। রাজপুতানায় এমন সুন্দর সহর অতি বিরল—বোধ হয় নেই বল্‌লেও হয়। ভোরবেলা যখন আজমীঢ়ে পৌঁছুলাম, তখন অদূরে পাহাড়ের হাতছানির মধ্যে টঙ্গা ক'রে বেড়াতে ভারি ভাল লাগ্‌ছিল।

এখানে এক পীরের কবর আছে, সেখানে নাকি খুব উৎসব হয় প্রতি বৎসরে। সকলে বল্‌ল, দেখা উচিত। কিন্তু সে পীরের কবর দেখার মধ্যে য কি চিত্তাকর্ষী আবেদন থাক্‌তে পারে, তা ভেবে না পেয়ে গেলাম না। সহরে অনুরূপ নীরস অবশ্য-দ্রষ্টব্য স্থান আরও দু-একটি আছে, যেগুলি দেখ্‌তে যাওয়া হ'য়ে ওঠে নি। কারণ সৌভাগ্যবশতঃ হাতে সময় কম ছিল।

একটি প্রকাণ্ড হ্রদ আছে, যার ধারে নাকি সাজাহান এক সময়ে বস্‌তেন। হ্রদতীরে শ্বেত মর্ম্মরের একটি বেদী আছে, মোগল স্থাপত্যের ঢঙে রচিত। বড় সুন্দর স্থান। নাম দৌলতবাগ—না অমনি একটা কি। বাগানটির মধ্যে হ্রদ ও হ্রদের অপর পারে পাহাড়। সূর্য্যাস্তের সময় পাহাড়টির শীর্ষে ক্লান্ত সূর্য্যদেবের নানাবর্ণের স্বর্ণরক্ত গোলাপী-আভা প্রায়ই এক মনোমদ বর্ণের জাল বুনে দেয়। পাদমূলে হ্রদ ও হ্রদে বিস্তর হংস-বলাকা। ভারি ভাল লাগ্‌ল। ঐতিহাসিক স্থান ব'লে নয়, রমণীয় স্থান ব'লে। A thing of beanty is ajoy for ever.

আজমীঢ়ে এলে পুষ্করতীর্থে যাওয়া হচ্ছে প্রতি পর্য্যটকের একান্ত কর্ত্তব্য। শুন্‌লাম রাস্তাটি নাকি ভারি সুন্দর। একটা টঙ্গা ক'রে যাত্রা করলাম। সাত মাইল পথ। পথটি শেষের দিকে একটি পাহাড়কে অতিক্রম ক'রে নেমে গিয়ে পুষ্করে মিলেছে। শেষের দিক্‌টির শোভা অপরূপ। পার্ব্বত্য শোভা অবশ্য, কিন্তু পার্ব্বত্য পথ রেল মোটরে যাওয়ায় একরকম তৃপ্তি মেলে ও টঙ্গা ক'রে যাওয়ায় অন্য একরকম তৃপ্তি মেলে। টঙ্গা যায় আস্তে আস্তে। মাঝে মাঝে নেমে পদব্রজে যাওয়া—ভারি উপভোগ্য। পার্ব্বত্য বালুময় পথ। পায়ে লাগে না—এমন কি খালি পায়ে হাঁটলে আরামই বোধ হয়। তাছাড়া নগ্নপদে ধীর মন্থরগতিতে চল্‌তে চল্‌তে দুধারে পাহাড়ের রুক্ষ সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে করতে মনে হচ্ছিল

যে এ রকম ভাবে পদব্রজে যাওয়ার মধ্যে এমন একটা নিকট-উপভোগের সুখ আছে যেটা রেল-মোটরে ভ্রমণে তেমন ভাবে পাওয়া যায় না।

পুষ্কর তীর্থটির মধ্যে সবুজ-রঙের হ্রদটি বেশ লাগ্‌ল ! বিশেষতঃ হ্রদটির অপর পাশে পাহাড় বিরাজ করার জন্যে। হ্রদটির জল কিন্তু বড় মলিন—অগণ্য তীর্থযাত্রীর স্নান করার জন্যই বোধ হয়। তীর্থটিতে মাছিরও অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। কারণ বোধ হয় এই যে, এরূপ নোংরা তীর্থ জগতে দুর্লভ। পুণ্য-স্থানগুলির পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে শুচিতাপ্রিয় হিন্দু এত উদাসীন কেন, ঠাহর করা যায় না।

আজমীঢ়ে রাজন্যবর্গের একটি কলেজ আছে। ইংরাজরাজ যে কত যত্নে আমাদের নাবালক রাজন্যদের শিক্ষা দেন, সেটা স্বচক্ষে না দেখলে বোঝা যায় না। কি রকম ক'রে সাহেবদের ডিনার দিতে হয়, কিরকম ক'রে মধুর হেসে সভ্যা মানবীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে হয়, কি রকম ক'রে ইংরাজ রাজপুরুষদের সম্মান প্রদর্শন করতে হয়, কি রকম ক'রে পোলো খেলে বীরত্বগৌরবের শিখরে অধিরূঢ় হ'তে হয়, ইত্যাদি অত্যাবশ্যক শিক্ষা ইংরাজরাজ আমাদের 'নেটিভ চীফ' ও সরদার-সম্প্রদায়ের পুত্র ও উত্তরাধিকারিগণকে অতি রোমাঞ্চকর অধ্যবসায়ের সঙ্গে দিয়ে থাকেন। এজন্য তাঁরা ইন্দোর, লক্ষ্ণৌ, আজমীঢ় প্রভৃতি সহরে, চার পাঁচটি কেন্দ্র স্থাপন করেছেন ও এসব কেন্দ্রে ভারতবর্ষের ভবিষ্য মুখোজ্জ্বলকারী রাজন্য-কুলতিলকগণ ইতিমধ্যে আশাতীত সাফল্য দর্শিয়েছেন। স্বচক্ষে না দেখ্‌লে বোঝা যায় না যে, ইংরাজরাজ এসব বিষয়ে কতটা যত্নশীল, অধ্যবসায়ী ও উদ্ভাবনী শক্তিতে ওতপ্রোত। এক একটি রাজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজ প্রাসাদ বাগান প্রভৃতি নির্ম্মাণার্থে তাঁরা রাজন্যদের অর্থের অতি চমৎকার সদ্ব্যবহার ক'রে থাকেন। মুষ্টিমেয় কয়েকটি অভিজাত পুঙ্গবকে মানুষ করার জন্যে এসব বিদ্যাপীঠে যে পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়িত হয়, তা বস্তুতঃই

লোমহর্ষক। আজমীঢ়ের প্রস্তর নির্ম্মিত Mayo Collegeটির মতন সুন্দর কলেজ বোধ হয় ভারতবর্ষে নেই, এমন সুন্দর তার স্থাপত্য! তবু আমরা বলি যে, বিদেশী শাসনে আমাদের শিক্ষালাভ যথোচিত হয় নি। যে-সব ধনুর্দ্ধরগণ অর্দ্ধেক ভারতের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, তাঁরাই যখন বাল্যকাল হ'তে এই আদর্শ শিক্ষা পাচ্ছেন, তখন অন্যে পরে কা কথা!

ভূপাল। সহরটি মনোরম। অন্ততঃ যেদিকে রাজপুরুষ ও অতিথিগণ থাকেন সেদিকের রাস্তাঘাট বেশ মসৃণ, রক্তিম ও মাঝে মাঝে রমণীয়ভাবে উঁচু নীচু, যদিও পাহাড়ে-রাস্তার মতন অতটা নয়। হর্ম্ম্যরাজিও সুদৃশ্য। বোধ হয় সহরের এ অঞ্চলটা বেগম সাহেবের নির্ম্মিত—সভ্য লোকদের থাক্‌বার জন্যে। অবশ্য একথা বলাই বেশি যে, সহরের আদিম অসভ্য অধিবাসীদের বাসস্থান-অঞ্চল অতি নোংরা, রাস্তাঘাট সঙ্কীর্ণ, রাত্রে অন্ধকার, এককথায় মিউনিসিপ্যালিটির সম্পর্কবর্জ্জিত। ভারতবর্ষের প্রায় সব Native State গুলির সম্বন্ধেই একথা খাটে। অর্থাৎ ধনী ও দরিদ্রের বাসস্থানের পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তফাৎ—আকাশ পাতাল। সহরের সব সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য কেবল অভিজাত-কোয়ার্টারের জন্য রিজার্ভ। বাকী বাসিন্দারা চ'রে খাক্—এইভাব আর কি, যেমন আগে ছিল। সভ্যতার বিস্তারে যে সাধারণ মানুষেরও একটু মানুষের মতন বাস করার অধিকার অন্যান্য সভ্যজগতে ক্রমশঃ স্বীকৃত হ'য়ে আসছে—এ সত্যটি সম্বন্ধে আর যিনিই সচেতন হোন না কেন, আমাদের নেটিভ ষ্টেটগুলির রামচন্দ্রনিচয় যে সচেতন নন, এটা ধ্রুব। ইংরাজ শাসিত ভারতবর্ষে এ পার্থক্য এতটা পীড়াদায়ক নয়। রবীন্দ্রনাথ সত্যই ব'লেছেন, "সর্ব্বসাধারণকে আমরা মনে অশ্রদ্ধা করি বলেই, রসের নিমন্ত্রণ সভায় আমরা বাইরের আঙিনায় তাদের জন্যে চিঁড়ে দইয়ের ব্যবস্থা করি—সন্দেশগুলো বাঁচিয়ে রাখি, যাদের বড়লোক বলি তাদের জন্যেই।"

ভূপালে একটি সুন্দর হ্রদ আছে। হ্রদটির ধার দিয়ে বেড়াতে বেশ লাগল। জলস্থলের সংমিশ্রণের মধ্যে একটা সৌন্দর্য্য থাকেই থাকে—অবশ্য যদি জলটি নিতান্তই পানা পুকুরের পর্য্যায়ে না প'ড়ে যায়। ভূপালের মনোরম হ্রদটির ওপাশে একটি ছোট পাহাড়শ্রেণী নিজেকে যে ভাবে এলিয়ে দিয়ে শুয়ে থাকেন, তাতে মনে হয়, যেন তিনিও অলস নয়নে চেয়ে থাকার আরামটা শিখে নিয়েছেন। বোধহয় তাই ফাল্গুনের অরুণোজ্জ্বল প্রভাতের শীকর-সম্পক্ত বায়ুও তাঁকে বিচলিত করতে পারে নি।

ভূপালে গিয়েছিলাম—মহম্মদ খাঁর গান শুন্‌তে। ইনি নামী গায়ক—যাকে ওস্তাদেরা বলেন খাঁনদানী। যেহেতু ইনি হর্দ্দু খাঁ নথু খাঁর ঘরোয়ানা। এ কেমন? না, যেমন কুলীন ব্রাহ্মণ; ভাণ্ডে সাক্ষাৎ মাতা ভবানীর প্রাদুর্ভাব হ'লেও তাঁর কৌলীন্য মারে কে? মহম্মদ খাঁ-ও বোধহয় গাইতে গাইতে মাঝে মাঝেই তাঁর নিরীহ তবলচি বন্ধুটির নাকের ডগা ও পদাঙ্গুষ্ঠের প্রতি লক্ষ্য করে উন্মত্তবৎ অঙ্গুলিনির্দ্দেশ সহকারে তান দিচ্ছিলেন—শুধু নিজের এই অবিনশ্বর খাঁনদানিত্বটিকেই চোকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার জন্যে। তাছাড়া গাইতে গাইতে প্রায়ই তিনি নিজের তানের বাহবাতে নিজেই ভরপূর হ'য়ে উঠে সোৎসাহে সে সব তানের অকাট্য মৌলিকতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কর্ত্তব্য মনে করছিলেন (খাঁনদানী কিনা!)। তাঁর এই শিক্ষাপ্রদ ব্যাখ্যাতৎপরতায় আমার মনে হচ্ছিল বার্লিনে আমার সেই অভিজাতবংশোদ্ভবা গৃহকর্ত্রীর কথা—যিনি আমাকে প্রত্যহ তাঁর রান্না কেমন হয়েছে জিজ্ঞাসা করেই উত্তরের অপেক্ষা না রেখে আগেই নিজের মশলা-নৈপুণ্যের গুণগ্রাহিতায় মশগুল হয়ে যেতেন। (এ সত্য কথা, অতিরঞ্জিত নয়)।

মহম্মদ খাঁর মিড় ভাল, সুরদোলানোর ভঙ্গীও সুষ্ঠু, তানও মাঝে মাঝে উপভোগ্য। গলাও মন্দ নয়;—অন্ততঃ এককালে যে ভাল ছিল, সেটা

বেশ বোঝা যায়। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, কাজেই কণ্ঠস্বর তাঁর এখনও নষ্ট হওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু কণ্ঠস্বরের মাধুর্য্যটিকে বাড়নোর চেষ্টা করা দূরে থাকুক—বিধাতা যেটুকু মাধুর্য্য দিয়েছিলেন সেটুকুও তিনি বজায় রাখতে পারেন নি। কারণ তিনি গানে কণ্ঠস্বরের মূল্য সম্বন্ধে সাধারণ ওস্তাদদেরই মতাবলম্বী। অর্থাৎ তাঁর মত এই যে গানে দরকার—মূলতঃ গলাবাজি ও অত্যধিক উচ্চস্বরে আর্ত্তনাদ করা। ফলে তাঁর গলাটি বেশ জখম হয়ে এসেছে। ওস্তাদদের এই আক্ষেপজনক প্রবণতাটি সম্বন্ধে আমি একাধিকবার লিখেছি। কণ্ঠস্বর হচ্ছে গানের নিহিত ভাবটি ফুটিয়ে তোলার একটা শ্রেষ্ঠ উপাদান। যেমন তোত্‌লার পক্ষে ভাব-গভীরতা সত্ত্বেও অভিনয়-কলায় সাফল্যলাভ করা মুস্কিল, তেমনি কর্কশকণ্ঠ গায়কের পক্ষে শিক্ষা ও শুদ্ধ-তান-লয় সত্ত্বেও গানের আর্টে সফলকাম হওয়া কঠিন। অথচ আমাদের দেশে ওস্তাদ ও ওস্তাদিপন্থীদের গান সম্বন্ধে outlook আজ এতই অদ্ভুত হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, এই সাদা কথাটিও তাঁদের বার বার বলবার দরকার হয়। মহম্মদ খাঁর এই আক্ষেপ-জনক প্রবণতাটি সম্বন্ধে আরও প্রমাণ পাওয়া গেল, যখন তিনি তাঁর একটি তের চৌদ্দবৎসরের ছাত্রীকে দিয়ে একটি জৌনপুরী ও একটি ভৈরবী গাওয়ালেন। মেয়েটির গলাটি মন্দ ছিল না। তাছাড়া নারী বলে নারীসুলভ কমনীয়তাও তার গানের মধ্যে তার অজ্ঞাতসারেই ফুটে উঠেছিল। কিন্তু মহম্মদ খাঁ কোথায় তাঁর ছাত্রীর এই নারীসুলভ কমনীয়তাটি তাঁর শিক্ষাগুণে আরও ফুটিয়ে তুল্‌বেন, না, তা না করে তিনি তাকে কুশ্রী তান, অসম্ভব চড়া পর্দ্দায় গাওয়া ও গানের মধ্যে বার বার নিষ্ঠিবন ত্যাগ করতেই শিখিয়েছেন। কিন্তু বোধহয় আমাদের ওস্তাদদের গানের এসব কদশ্রী আনুষঙ্গিকের জন্য আক্ষেপ করা নিষ্ফল ও বাহুল্য। অন্ততঃ তাতে তাঁদের সংশোধন করা যাবে না। কারণ সৌকুমার্য্য যে

সম্প্রদায়ের মনে কখনও তার অপরূপ সুষমার স্নিগ্ধ বর্ণপাত করে নি, তাদের সৃষ্টিতে কেমন করে সে বস্তুটির ছায়াপাতও আমরা আশা কর্‌তে পারি? যে দু চার জনের গুণপনায় আমরা হঠাৎ এ সৌকুমার্য্যের আমেজ একটু পেয়ে যাই তাঁদের কাছে থেকে বরং এ অপ্রত্যাশিত দানের জন্য আমাদের বেশি করেই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। তাঁদের বরং আমাদের ব্যতিক্রমের কোঠায়ই ফেলা উচিত। অধিকাংশ ওস্তাদদের স্থূল ও অসুন্দর গানের আবহাওয়ার জন্য তাঁদের নিন্দা করায় বস্তুতঃ তাঁদের প্রতি অবিচারই করা হয়—যদি এ নিন্দার অন্য কোনও উদ্দেশ্য না থাকে। এককথায় ওস্তাদসম্প্রদায়ের কাছ থেকে আমাদের সঙ্গীতের নবজন্ম আশা করা, আর বালিকা বধূর কাছ থেকে উচ্চাঙ্গের আদর্শবাদে পূর্ণ সহানুভূতি লাভের কামনা করা—এ দুইই একশ্রেণীর আকাশকুসুম।

সাঁচি। কতবার মনে করা গিয়েছিল ভূপালের পথে একবার ঝপ করে নেমে সাঁচির বিখ্যাত বৌদ্ধ স্তূপ, মন্দির, মঠ প্রভৃতি দেখে চোখদুটো সার্থক করে নেব। বুদ্ধগয়া ও সারনাথ দেখলে বোধ হয় ভারতবর্ষের এই তৃতীয় বৌদ্ধ তীর্থটির কথা বেশি ক'রে মনে না হয়েই পারে না। তাই যখন হঠাৎ সাঁচিতে নেমে পাহাড়ের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম, তখন মনটা যে এক বিচিত্র সার্থকতা রসে ভরে উঠেছিল, একথা সহজেই অনুমেয়।

সব কীর্ত্তিমন্দির স্তম্ভাদিরই একটা তীর্থমাহাত্ম্য আছে। অবশ্য প্র্যাকৃটিক্যাল লোকেরা এ কথাটিতে হেসে উঠবেন জানি—বিশেষতঃ যখন তীর্থ কথাটি নিতান্তই সেকেলে মনোভাবের পরিচায়ক। কাজেই সেটা যে কুসংস্কারের একটা মস্ত প্রতীক, সে বিষয়ে তিলার্দ্ধ সংশয় প্রকাশ করার পথ ত থাক্‌তেই পারে না! কিন্তু তবু—অর্থাৎ সুধীজনের এ ভুবিদীর্ণকারী অবজ্ঞার হাসি সত্ত্বেও—অন্‌ প্র্যাকৃটিক্যালের চোখে প্রতি

পূত স্থানের গৌরবসম্পদ আজও কথার কথা হয়ে ওঠে নি। অথচ মুস্কিল এই যে অবজ্ঞাত অন্‌-প্র্যাক্‌টিক্যালদের মনের এ অকেজো অনুরাগ যে একটা সৌখীন ভঙ্গুর ভাববিলাসিতা মাত্র নয়, সেটা পূর্ব্বোক্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি কাজের লোকদের বোঝাবার কোনও অস্ত্রই বিধাতা আমাদের দেন নি। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পঞ্চভূতে একটা বড় খাঁটি কথা বলেছেন :—"একটা তর্কের কথায় সহসা বিরুদ্ধ মত শুনিলে মানুষ তেমন অসহায় হইয়া পড়ে না, কিন্তু ভাবের কথায় কেহ মাঝখানে ব্যাঘাত করিলে বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে হয়। কারণ, ভাবের কথায় শ্রোতার সহানুভূতির প্রতিই একমাত্র নির্ভর। শ্রোতা যদি বলিয়া উঠে, কি পাগলামি করিতেছ, তবে কোনো যুক্তিশাস্ত্রে তাহার কোনো উত্তর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।" তবু আমরা বলি, বিধাতা প্রতি জীবকেই আত্মরক্ষার একটা অস্ত্র দিয়েছেন। ইংরাজীতে একটা কথা আছে : To live is to learn.

যাক্। যে কথা বল্‌ছিলাম। আমেরিকান টুরিষ্টদের মতন খাতা হাতে করে "প্রতিহিংসার সহিত দৃশ্যাদি দর্শন" করার মোক্ষফলদাতার সম্বন্ধে অলস মন্থরপন্থী প্রাচ্যজাতি বোধ হয় সহজে তেমন মনে-প্রাণে সাড়া দিতে পারে না। তাই সাঁচি পৌঁছিয়ে তাড়াতাড়ি সেখানকার স্তূপ, মন্দির, চৈত্যকক্ষ, যাদুঘর, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি দেখবার আগেই মনটা বেশ ভরপুর হয়ে উঠ্‌ল। কর্ত্তব্যদর্শনকার্য্যটা যেন তেন প্রকারেণ সেরে নিতে মনটা মোটেই ব্যগ্র হয়ে উঠল বলে মনে হল না। প্র্যাক্‌টিক্যাল মার্কিন-আত্মীয় বল্‌বেন :— "বেশ, তাহলে তোমরা ভরপূর হয়ে স্বপ্নই দেখ, আমরা ততক্ষণ দ্রষ্টব্য জিনিষগুলি দেখে নিই। যেহেতু জীবন অল্পপরিসর। তাছাড়া দিবাস্বপ্নই যদি দেখ্‌তে হয়, তবে সেজন্য সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে সাঁচি আস্‌বার কি দরকার ছিল?" হায়, এ দরকার জিজ্ঞাসার কি উত্তর দেব তাঁদের? বলেছিই ত যে প্র্যাক্‌টিক্যাল জাতীয় মানবহিতৈষীদের কাছে আমাদের

জাতীয় লোক নিতান্তই নাচার ও বেচারী গোছের জীব হয়ে পড়ে। আমাদের অমোঘ যুক্তিবাণও তাঁদের প্র্যাক্‌টিক্যালিটিরূপ দুর্ভেদ্য বর্ম্মে প্রতিহত হ'তে না হ'তে নম্রশীর্ষ হয়ে মাটিতে লোটায়—তাঁদের অঙ্গস্পর্শও কর্‌তে পারে না, মর্ম্মভেদ করা ত দূরের কথা। সুতরাং তাঁদের বল্‌তে ইচ্ছা হলেও বলা নিষ্ফল যে মানুষের সত্য শিক্ষার একটা মস্ত স্বীকৃত পন্থা হচ্ছে—তার কল্পনার পরিধিকে উত্তরোত্তর বিস্তৃত করা, যেহেতু নইলে মানুষ আজও সেই আদিম গুহাবাসী জড়ের অবস্থাতেই থাক্‌ত যখন প্রকৃতির মধ্যে সে কোনও বিরাট প্রাণস্পন্দনই কল্পনা কর্‌তে পারত না। তাঁদের বলা মূঢ়তা মাত্র যে কালিদাসের কবিত্বের বিকাশও সম্ভবপর হয়েছিল তাঁর কল্পনার সেই বিস্তারে যার ফলে পূর্ব্বমেঘ ও উত্তরমেঘ তাঁর চোখে ধূমজ্যোতিঃসলিল মরুতের সন্নিপাতে সৃষ্ট জড়পদার্থমাত্র না হ'য়ে প্রেমাস্পদের দূতী বলেই প্রতীয়মান হয়েছিল। এক কথায়, তাঁদের বলা বিড়ম্বনা যে বিধাতার বিচিত্র সৃষ্টির সৌন্দর্য্যের অসীমতার গৌরব সেই পরিমাণে আমাদের অন্তর-লোকে শিহরণ জাগাতে পারে, আমরা যে পরিমাণে সে শিহরণ লাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করতে শিখি। কাজেই হে প্র্যাকটি-ক্যাল নরশ্রেষ্ঠগণ, তীর্থ-মাহাত্ম্য ও স্থানবৈশিষ্ট্যে অন্‌-প্রাক্‌টিক্যাল লোকে বিশ্বাস করবেই—তার মধ্যে দ্রষ্টব্য বস্তুর বিস্ময় শিহরণের উপাদান অকাট্য রূপে না থাক্‌লেও। কারণ তারা যে তোমাদের পরামর্শ নেবার আগেই জীবনযাত্রার অনাবশ্যক এই কল্পনাবিলাসে বিশ্বাস করে ফেলে তাকে একটু বেশি প্রশ্রয় দিয়ে মাথায় চড়িয়ে বসেছে!

বস্তুতঃ সেই সব স্থান দেখেই মানুষ যথার্থ লাভ করতে পারে যে-সব স্থানের মাহাত্ম্যে সে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে। নইলে জীবনের খাতায় কেবল লাভ হতে পারে সংখ্যাতীত রোমাঞ্চ-করা-উচিত-এমন দ্রষ্টব্য বস্তুর তালিকা সন্নিবেশ, কিন্তু তাতে করে জীবনের রস-স্ফূর্ত্তির কোনও সহায়তা হয় না।

এই ভেবে য়ুরোপে বা অন্য অনেক স্থানে অনেক সমতুল্য লোমহর্ষক স্মৃতিস্তম্ভই দেখতে যেতে মনকে রাজি করাতে পারিনি। কেননা বন্ধুবান্ধবকে 'দেখেছি' বলবার প্রলোভনটা দুর্জ্জেয় থাকে বোধ হয় কেবল মনের বাল্যাবস্থায়ই। অন্ততঃ প্রাচ্য মনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে প্রলোভনের অধ্রুব কার্য্যকারিতা যে ক্রমশঃ মন্থরগমনের ধ্রুব বিলাসের প্রলোভনকে জয় করতে অক্ষম হয়ে ওঠে একথা ত অস্বীকার করা চলেই না।

পাঠক হয়ত অধীর হয়ে বল্‌বেন, "আচ্ছা, আচ্ছা, বুঝলাম বাপু বুঝলাম। কিন্তু এইবার বলত শুনি কি দেখলে? ভণিতাটা এখন ছাড়োই না একবার।" কিন্তু এইখানেই ত যত গোল! আমি যে শুধু বৌদ্ধস্তূপের গঠনপ্রকৃতি বা শিলালিপির ইতিবৃত্তের খবর নিতেই সাঁচি যাই নি। সে কাজ প্রত্নতাত্ত্বিকেরই একচেটে থাকুক। তাঁর সঙ্গে আমার বিবাদ নেই—যেহেতু ভিন্নরুচির্হি লোকঃ আমি সাঁচি গিয়েছিলাম—সেখানকার বৌদ্ধমঠের পূত উদাসকরা সৌরভের একটুখানি মাত্র সে ধ্বংসাবশেষের মধ্যে খুঁজে পেতে। সেখানে দ্রষ্টব্য যা যা আছে তা দেখে যে তৃপ্তি পাই নি এমন কথা বল্‌লে অবশ্য সত্যের অপলাপ হবে। কিন্তু একথা বল্‌লে একটুও বেশি বলা হবে না যে, তার চেয়ে ঢের বেশি তৃপ্তি পেয়েছিলাম—সাঁচির ছোট্ট পাহাড়ে অস্তগামী সূর্য্যালোকে স্তূপমন্দিরের আশেপাশে নিতান্ত অকেজোর মতনই ঘুরে বেড়াতে। ঢের বেশি ভাল লাগছিল সাঁচির পূত ধ্বংসাবশেষের আবহাওয়ার মধ্যে তার লুপ্ত গৌরবের কথা ভাবতে। মনে হচ্ছিল—এইখানেই না এক সময়ে কত শত বৌদ্ধ ভিক্ষু দেশদেশান্তর থেকে এসে তাদের আরাধ্যকে নৈবেদ্য দিতে একত্র হ'ত! মনে হচ্ছিল—হয়ত এইসব মন্দির মঠ প্রভৃতির চারদিকে তারা একদিন এমনি অস্তস্বর্ণাভ রবিকরে স্তোত্রপাঠ কর্‌তে কর্‌তে পরিক্রমণ করত।...কি কোথায় সেযুগের বাঞ্ছিতের জন্য সে প্রাণশক্তিকেও ত্যাগ করার নিষ্ঠ

আর কোথায় বর্ত্তমান যুগের প্রাণচঞ্চলতার অফুরন্ত কর্ম্মিষ্ঠতার বাণী! মনে হচ্ছিল—এইসব জাতকচিত্র, বৌদ্ধভাস্কর্য্যগাথা হ'তে তারা একদিন না জানি কি অপূর্ব্ব রসেরই অফুরন্ত খোরাক সংগ্রহ করত, যাতে আমরা আজ শত চেষ্টায়ও ঠিক তেমনভাবে সাড়া দিতে পারি না।...সঙ্গে সঙ্গে মন আকুল হ'য়ে উঠ্‌ল সেই উদাত্ত শঙ্খঘণ্টাধ্বনির একটি রেশও কাণ পেতে শোন্‌বার জন্যে; হৃদয় চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌ল চৈত্যকক্ষে তাদের ধূপদীপের সেই অর্থপূর্ণ সৌরভের একটুখানি পরশও বাতাসের মধ্যে পাবার জন্যে; প্রাণ কালের ব্যবধানের দুস্তর সেতু অতিক্রম করে উধাও হয়ে ভেসে যেতে চাইল—সেই বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের শান্তোজ্জ্বল কমনীয় মুখচ্ছবির একটি মাত্রও পলাতক আভাষচ্ছটা পাবার জন্যে।...কিন্তু হায়, সংসারে যত বিয়োগগাথা আছে তার মধ্যে মহিমোজ্জ্বল অতীতের লুপ্তবৈভবের চিরকালই অস্তমিত থেকে যাওয়ার অবশ্যম্ভাবিত্ব বোধহয় কারুণ্যে কোনও বিষাদ কাহিনীর চেয়েই কম নয়।

কিন্তু...না না...তবু অতীত ত সম্পূর্ণ অস্তগতও নয়। অতীত যে বর্ত্তমানের প্রতিমুহূর্ত্তে তার বিগত গৌরবকে জাগিয়ে তোলে—এক অভিনব উপায়ে! এইখানে বিধাতার বিধানের একটা পরম মঙ্গলস্পর্শ মেলেনা কি? কারণ ভূত গরিমাকে কি আমরা কল্পনার স্ফটিকচ্ছটায় এমন এক ঔজ্জ্বল্য ও রক্তিমায় স্নাত ক'রে দেখ্‌বার ক্ষমতা ধরি না—ঠিক্ যেমনতর লালিমা হয়ত বস্তুতঃ অতীতের ছিল না? হয়ত কেন—নিশ্চয়ই ছিল না। সাজাহান মনেপ্রাণে যত বড় বড় কবিই হোন না কেন ও মমতাজমহলকে যে ভাবেই গরীয়সী ক'রে তুল্‌বার চেষ্টা পেয়ে থাকুন না কেন, কোন্ কবি জোর ক'রে বল্‌তে পারেন যে তিনি তাঁর মনের সে অরুণিমার যথার্থ রঙটি ধরতে পেরেছেন? কোনও কবিই তাজমহলের মধ্যে সাজাহানের সে হৃদয়টির চির প্রতিচ্ছবি দেখ্‌তে পেতেই

পারেন না—তা তিনি যতই কেন না কল্পনাকুশল হোন্;—তিনি তাজমহলকে নিজের বিশিষ্ট কল্পনার দ্যোতনায়ই বিশেষভাবে রঞ্জিত ক'রে দেখ্‌বেন।

কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। কেন না শিল্পী ঠিক কি ভেবে তাঁর সৃষ্টিকাজে রত হ'য়েছিলেন, সেটা নির্ণয় করতে পারা-না-পারার উপর তার রসগ্রহণ করা-না-করা নির্ভর করে না। কারণ সৌন্দর্য্য যে তার স্রষ্টার চেয়ে অনেক বড়। অনেক সময়ে শিল্পী যে নিজেই খবর রাখেন না তিনি অজ্ঞাতসারে তাঁর সৃজিত কলাকারুর মধ্য দিয়ে কি এক বিশ্বজনীন তারে চিরন্তন অনুরণন তুলে থাকেন। অথচ এ অনুরণনের শ্রেষ্ঠ গরিমাই এই যে তা যুগে যুগে শিল্পের পূজারীর হৃদয়ের নব নব রুদ্ধ সৌন্দর্য্যানুভূতির দুয়ার উদ্‌ঘাটিত ক'রে দেয়। দরিদ্র অশ্বরক্ষক শেক্ষপীয়র যখন গ্রাসাচ্ছাদন সংস্থানের জন্য নাটক লিখ্‌তেন, তখন কি তিনি সম্যক্ উপলব্ধি করেছিলেন যে তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে সাক্ষাৎ বাণীদেবী কি এক সমাপ্তিহীন সঙ্গীতকে মূর্ত্ত ক'রে তুলে ধ'রেছিলেন? প্রতি অবিনশ্বর শিল্পপ্রতিমা যুগে যুগে নব নব অনুভূতির আলোকসম্পাতে নব নব দীপ্তি, রঙিমা ও ভঙ্গীতে গরীয়সী হয়ে ওঠে। তার মধ্যে কোন্ ভঙ্গিমাটি যে তার নির্ম্মাতার উদ্দিষ্ট ছিল কেই বা তা বল্‌বে আর তার আবশ্যকতাই বা কি? অতীতের যে-গৌরব দৃশ্যতঃ অতীত, মানুষের অভিজ্ঞতা-জগৎ হ'তে তার নিষ্ক্রামণের ক্ষতিপূরণস্বরূপই কি বিধাতা ক্ষণবিধ্বংসী মানুষকে মৃত্যুহীন নবনবোন্মেষিণী কল্পনা দেন নি?